সাহিত্য-বিতান

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সাহিতি ক ও সাহিত্য-প্রেমিক

স্বর্গত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে—

সূচী

মুখবন্ধ

যে প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে একত্র করিয়া 'সাহিত্য-বিতান' নাম দিয়াছি, তাহাদের পরিচয় ঐ নামটির মধ্যেই আছে, সাহিত্যের 'মণ্ডপ' বা 'আসর' বলিতে যাহা বুঝায় এই গ্রন্থে তাহারই ভাব রক্ষা করিয়াছি। পাঠকগণ ইহাতে সাহিত্যবিষয়ক, বিশেষতঃ বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে, নানাবিধ আলোচনা—বৈঠকী আলাপও পাইবেন। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-কথা'-নামক গ্রন্থে আমি মুখ্যতঃ সাহিত্যের তত্ত্বঘটিত আলোচনা করিয়াছিলাম—সেখানে বিশেষ অপেক্ষা নির্ব্বিশেষের দিকেই দৃষ্টি ছিল ; এই গ্রন্থে আমি—সাহিত্যের শুধুই তত্ত্ব নয়—নানাবিধ সৃষ্টিকর্ম্মের সাক্ষাৎ রস-সন্ধান এবং কবি ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয়ও করিয়াছি। ইংরাজীতে এইরূপ বহু প্রবন্ধপুস্তক আছে—Appreciations, Discoveries, Countries of the Mind প্রভৃতি নাম অনেকে স্মরণ করিবেন। এই হিসাবে 'সাহিত্য-বিতান'কে 'সাহিত্য-কথা'রই উত্তরভাগ বলা যাইতে পারে। সেই যোগ রক্ষা হইয়াছে ইহার প্রথম প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধে আমি সাহিত্যবিচারের মূলতত্ত্ব আর একবার সংক্ষেপে ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার উদ্যম করিয়াছি—ইহাই পরবর্ত্তী আলাপ-আলোচনার মানদণ্ড।

এই প্রথম প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলিবার আছে। আধুনিক কালে, য়ুরোপীয় মনীষীসমাজে—অপর সকল বিদ্যার মত, এই সাহিত্য-বিদ্যাও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে ; সাহিত্য-সমালোচনা একটি বড় জিজ্ঞাসার বিষয় হইয়াছে। আমাদের দেশেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা যখন জাতীয়-জীবনের মতই শক্তি ও স্বাস্থ্যযুক্ত ছিল, তখন এই বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সুদীর্ঘ ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু প্রাচীনের দৃষ্টি ও আধুনিকের দৃষ্টিতে প্রভেদ আছে, ও তাহা অবশ্যম্ভাবী ; এজন্য ইংরাজীতে যাহাকে—'Modern Study of Literature' বলা হয় তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ জীবনের আর সকল ব্যাপারের মত সাহিত্যের সৃষ্টি ও তাহার রসাস্বাদেও নূতনতর আদর্শ ও নূতনতর রুচির উদ্ভব হইয়াছে—মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই কারণেই, সেই এক প্রাকৃতিক শোভা ও এক মনুষ্য-সমাজ যেমন আজিকার কবি-শিল্পীর প্রাণ-মনকে ভিন্নভাবে স্পর্শ করে, তেমনই কাব্যেরও রসাস্বাদনে অভিনব পিপাসা ও অভিনব বোধ-বৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে, সেজন্য সেই পুরাতন প্রণালীতে কাব্য-বিচার আর যথোপযুক্ত হইতেছে না। আমাদের দেশে এই নূতন বা আধুনিক বিচার-পদ্ধতি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; অথচ, আধুনিক কবি-প্রবৃত্তি বলিতে যাহা বুঝায়, যুগধর্ম্মের বশে ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে, তাহা এক্ষণে প্রায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা রক্ষণশীল তাঁহারা 'চিত্রকলা'র 'ইণ্ডিয়ান আর্টে'র মত, কাব্যকলাতেও সেই প্রাচীন আদর্শ রক্ষা করিতে না পারিলেও—কাব্যসমালোচনায় ভারতীয় রস-সংস্কার ও তদনুযায়ী বিচার-পদ্ধতির পক্ষপাতী। এই অসঙ্গতির ফলেই আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার কোন আদর্শ বা পদ্ধতি এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। এক্ষণে এমন একটি তত্ত্বকে ও এমন একটি আদর্শকে দৃঢ়রূপে স্থাপনা করিতে হইবে যাহার সাহায্যে সর্ব্বকালের সকল কাব্য ও সর্ব্ববিধ কবি-মানসকে একই প্রমাণে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশের দুই একজন আধুনিক কাব্যসমালোচক এরূপ নূতন মাপকাঠির আবশ্যকতা স্বীকার করেন না—সেই প্রাচীন

অলঙ্কার শাস্ত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সংশয়মাত্র নাই; অথচ, সে বিচার মুখ্যতঃ রস-বিচার—কাব্যের রূপ-বিচার নয়। এখানে এবিষয়ে আর কিছু বলিব না, যথাস্থানে আমি সে আলোচনা করিয়াছি। য়ুরোপীয় কাব্যবিচারে এই রূপের তত্ত্ব বড় হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষের সেই যে রূপ-ভঙ্গি তাহাই আধুনিক সাহিত্যবিচারের 'ষ্টাইল-তত্ত্ব'। আমি এ বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি একটি নূতন তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার দুঃসাহস করিয়াছি; আমি খাঁটি আর্ট ও খাঁটি কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি—এ দুঃসাহস এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। তত্ত্বহিসাবে ইহাতে যে দোষই থাকুক—আমার বিশ্বাস, নিছক আর্টকর্ম্মকে কবিকর্ম্ম হইতে পৃথক না রাখিলে কাব্যবিচার সমস্যাজটিল হইয়া পড়ে; যে রূপ-কর্ম্মকে আমরা বাণীরচনা বলি, এবং যাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলিতে জীবন ও জগতের বিশিষ্ট রূপকেই রসোজ্জ্বল হইতে দেখি—তাহার মূল্য ও কাব্যের সেই বিশেষ অধিকারটিকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। এ সম্বন্ধে এখানে ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, আমি কেবল এই প্রথম প্রবন্ধের প্রতি সকল সাহিত্যজ্ঞানী পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

'সাহিত্যের আসর' নামক প্রবন্ধটিতে সাহিত্য-বিচারের কয়েকটি মূলতত্ত্ব একটু সরল ও সহজ ভঙ্গিতে আর একদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি; অতএব এই প্রবন্ধটিও প্রথম প্রবন্ধের সহিত পড়িতে বলি। বাকি প্রবন্ধগুলিতে আমি অধিকাংশস্থলে তত্ত্ব-বিচার নয়—রস-নির্ণয় করিয়াছি; ইহাই এ গ্রন্থের মুখ্য অভিপ্রায়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এতদুদ্দেশ্যে কোথাও কবি-মানস বা কবিচরিত্র—কোথাও বা কাব্যরচনার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছি; কোন কোন রচনায় (যেমন 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' ও 'দুঃখের স্বরূপ') আমি কবি ও কাব্যকে মুখ্য না করিয়া আমার নিজেরই চিন্তা ও ভাবকল্পনাকে সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করিয়াছি, তাহাও সাহিত্যবিচারের বহির্ভূত নয়।

সর্ব্বশেষে, এই 'সাহিত্য বিতান' সম্বন্ধে আমার একটা কৈফিয়ৎও আছে। ইহার কয়েকটি প্রবন্ধে যে ধরণের আলোচনা আছে—তাহা সাহিত্যের আসরে সমবেত শ্রোতৃবর্গের তাদৃশ শ্রুতিরোচক হইবে না, বরং কিঞ্চিৎ কটু বলিয়াই মনে হইতে পারে। তথাপি, আমি এইরূপ বিপরীত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি এইজন্য যে, রসের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বিরূপের পরিচয়ও প্রয়োজন—বরং যে বস্তুকে সহজে যুক্তি বা বাক্যার্থের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না—তাহাকে নেতি-মুখে প্রমাণ করার যে রীতি আছে তাহা নিন্দনীয় নয়। আমি কোন্ প্রবন্ধগুলির কথা বলিতেছি তাহা এই গ্রন্থপাঠকালে সকলেই বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু পাঠকালে তাঁহারা যেন ইহাও লক্ষ্য করেন যে, সেগুলিতে আমি ব্যক্তিকে আক্রমণ করি নাই—তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রবৃত্তি বা রুচিরই দোষ দর্শন করিয়াছি। এ দোষ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হইয়াছে—তাহাতে প্রমাণ হয়, যুগ-প্রভাব হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণুরও নিস্তার নাই। এইজন্য সাহিত্যের রস-সন্ধান এ গ্রন্থের মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, আমি ইহাতে এ যুগের বাংলাসাহিত্যের দুরবস্থা ও তাহার কারণ আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি; এবং জাতির সহিত জাতীয়-সাহিত্য ও জাতির ভাষার সম্পর্কসম্বন্ধেও কয়েকটি আলোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি; 'সাহিত্য বিতান' বা সাহিত্যের আসরে সাহিত্যবিষয়ক কোন আলাপই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এই দারুণ দুর্দ্দিনে এ ধরণের পুস্তক প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়' যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলাসাহিত্যের পক্ষে আশাপ্রদ। সাহিত্যের ব্যবসায়ী

যাঁহারা তাঁহাদের নিকটে ইহা সৎ-সাহস নয়—দুঃসাহস ; বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় ত দূরের কথা—অন্য সময়েও গল্প-উপন্যাস এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুতে মূলধন নিয়োগ করা আমাদের দেশের পুস্তকব্যবসায়ীগণের কার্য্য নহে। সাহিত্যের প্রকাশ বা প্রচার নয়—পুস্তক বিক্রয়ই যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ গ্রন্থপ্রকাশের আগ্রহ না হওয়াই সম্ভব। সাহিত্যের সেবা ও ব্যবসায় সম্বন্ধে এই গ্রন্থেরই একস্থানে আমি যাহা লিখিয়াছি—'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ে'র এই উদ্যম যদি তাহারই সূচনা হয়, তবে, আশা করি বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে এই 'গ্রন্থালয়' সাহিত্যের ব্যবসায়কে সৎ-সাহিত্যের প্রচারমূলক সেবার সহিত যুক্ত করিয়া বাংলাসাহিত্যের একটা বড় কল্যাণ সাধন করিবেন—জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ে'র সেই ব্রতধারী তরুণ ব্যবসায়ীকে আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

নীলক্ষেত, রমনা,
আশ্বিন, ১৩৪৯ } গ্রন্থকার

সাহিত্য-বিচার

১

যাঁহারা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁহাদের কাজ ঐ সৃষ্টিকার্য্যেই সমাপ্ত হয়, প্রতিভার কোন জবাবদিহি নাই। সকল সৃষ্টির আদিস্রষ্টা ভগবানেরও—সৃষ্টিই একমাত্র সাক্ষ্য, তাহার অতিরিক্ত কিছু তিনিও বলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু সেই সৃষ্টির অর্থ, মানুষকে আপনার জ্ঞানে বুঝিয়া লইতে হয়। কবি ও ঋষি, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, কতরূপে তাহার কত ব্যাখ্যাই করিতেছেন; কিন্তু এই সকলের মধ্যে কবিই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার, কারণ তিনি সৃষ্টির ব্যাখ্যা আর এক সৃষ্টির দ্বারাই করেন—ভাগবতী প্রেরণাকে অনুসরণ করিয়া সেই সৃষ্টির রসরূপ আমাদের চিত্তগোচর করেন। অতএব কবি ভগবানের পরেই দ্বিতীয় স্রষ্টা। তাঁহার সৃষ্টিরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তাহারই নাম সাহিত্যসমালোচনা। কারণ, যাহাকে সমালোচনা বলা হয়, তাহা আসলে ব্যাখ্যা মাত্র, কবির সৃষ্টিকে ভাল করিয়া আমাদের চিত্তে ধরাইয়া দেওয়াই তাহার অভিপ্রায়। আমি এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহাই একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ আকারে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব; সাহিত্য-বিচারের কয়েকটি মূল তত্ত্ব যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ও সুনিরূপিত করাই আমার অভিপ্রায়।

প্রথমেই, সাহিত্য কি—অন্তত আমার আলোচনার বিষয়ীভূত যে সাহিত্য, তাহার একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। যদি বলা যায়, মানুষ তাহার ভাষায় যাহা কিছু রচনা করে তাহাই সাহিত্য, তবে সাহিত্য-বস্তুটির কোন বিশেষ ধারণাই হইল না; কারণ, ভাষা মানেই সাহিত্যের ভাষা নয়, এবং রচনা-

শব্দটিও অতি ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব এই সংজ্ঞাই মানিয়া লইতে হইলে, ভাষা ও রচনা—এই দুইটি শব্দের উপরে জোর দিতে হইবে। রচনা মুখে মুখেও করা যায়, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা যেমন কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যাবলীই নয় তেমনই, তাহার রচনাও কথোপকথন মাত্র—এমন কি, বক্তৃতাও নয়। যে রচনায় কেবল মস্তিষ্কজাত বিদ্যার অনুশীলন বা বুদ্ধিপ্রণোদিত তত্ত্বের বিচারণা আছে, যাহাতে সৃষ্টির বস্তুঘটিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আছে, তাহা খাঁটি সাহিত্য বা কাব্য-সৃষ্টি নহে; তাহা জিজ্ঞাসা, মীমাংসা ও আলোচনা মাত্র। সাহিত্যের রচনা বলিতে একরূপ সৃষ্টিই বুঝায়; বাক্য যদিও এইরূপ সৃষ্টির উপাদান, তথাপি এখানে তাহা কিছুকে নির্দ্দেশ বা জ্ঞাপন করে না; একটা রূপকে প্রকাশ করে—মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। ভাস্কর ও চিত্রকর ভিন্ন উপাদানে যেমন একটা কিছু গড়িয়া তোলে—আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করে, সাহিত্যস্রষ্টা কবিও তেমনই এক আশ্চর্য্য উপায়ে, বাক্যেরই সাহায্যে, একটা কিছুকে আমাদের অন্তশ্চক্ষুর গোচর করেন, বাহিরের রূপকে অন্তরে রূপময় করিয়া তোলেন। এই যে বাঙ্ময়ী রচনা—ইহা কোন তথ্য, ভাব বা চিন্তার ব্যাখ্যা, বিবৃতি বা নির্দ্দেশ নয়; ইহাতে বক্তৃতা নাই, তর্ক নাই, যুক্তিপ্রয়োগ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অনির্ব্বচনীয় কোন অনুভূতির আধারও নহে। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহাকে রস বলে, সেই 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' একটি চেতনার উদ্রেকই ইহার সার-মর্ম্ম নয়; একটা অতিশয় অপার্থিব, অতীন্দ্রিয় নিরুপাধি কিছুর ইঙ্গিত বা উদ্বোধন সাহিত্যের অভিপ্রায় নয়। ভগবানের সৃষ্টি এই বিশ্ব যেমন বস্তুতেই প্রকাশমান, ভাব যেমন সর্ব্বত্র রূপ পাইয়াছে, এবং এই রূপকেই আমরা সৃষ্টি বলিয়া থাকি, তেমনই সাহিত্যের সৃষ্টিও রূপময়; বাক্যে এই রূপ দেওয়াকেই আমরা রচনা বলিব। বাক্যে রচিত আর যাহা কিছু—তাহাতে রূপ নাই, কেবল কথা আছে, এবং কথারও অর্থ আছে; সেখানে সকলই পরোক্ষ—চিন্তার ব্যবধান থাকায় কিছুই রূপে প্রকাশ পায় না। অতএব সাহিত্য বলিতে যদি কেবল ভাষাগত রচনা বুঝিতে হয়, তবে রচনা-কথাটির এই বিশেষ অর্থ করিতে হইবে। আমি এখানে সাহিত্য অর্থে সেই রচনার কথাই বলিতেছি।

কথাটা আর একবার বুঝিয়া লওয়া যাক—সেই সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কে ভাষা কি বস্তু, তাহার ধারণাও স্পষ্ট করিয়া লই। ভগবানের সৃষ্টি—যেমন,

কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য—কথা বলে না, রূপে প্রকাশ হয় মাত্র; তাহার ভাষা সেই রূপই; যাঁহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনি সেই রূপকেই দেখেন, আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, আমাদের চিত্তে প্রকাশ হইতে পারাই তাহার সার্থকতা। সাহিত্যও এই প্রকার রূপ-সৃষ্টি; ওখানে যেমন রঙ, রেখা ও আকার প্রভৃতির সাহায্যে একটা কিছু প্রকাশ পাইয়া থাকে, এখানেও তেমনই বাক্যই সেই রূপসৃষ্টির নিদান; বাক্য কিছু বলে না, সেই রূপকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করে। অতএব, বাক্য এখানে একটা অসাধারণ কার্য্য করিয়া থাকে; ভাব ও অর্থের নির্দ্দেশই যাহার উৎপত্তির মূলে—ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও সংবাদ-জ্ঞাপনই যাহার সাধারণ কর্ম্ম, তাহার দ্বারা বস্তুকে একবারে সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর করাইতে হয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাষার এই প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যাইবে। সভামধ্যে সহসা কোনও মহিমময় পুরুষমূর্ত্তির আবির্ভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্য কবি লিখিলেন—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"; ইহাতে প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফল হইল। অবশ্য ঐরূপ পর্ব্বতচূড়া-দর্শনের ঘটনা যাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে, অথবা যিনি কল্পনায় সেই অবস্থা অনুভব করিতে পারেন, তিনিই এই ভাষাকে দৃশ্যরূপে উপলব্ধি করিবেন। এ ভাষা বিবরণ বা বিজ্ঞাপনমূলক নয়, ইহা প্রদর্শনমূলক। এখানে একটি উপমায় যাহা সাধিত হইয়াছে, তাহাই নানা স্থানে, নানা উপায়ে সাধিত হয়; এবং বাক্যের কি বিচিত্র ও অসীম শক্তি, কবিদিগের ভাষায় তাহার অফুরন্ত নিদর্শন আমরা পাইয়া থাকি।

অতএব এই যে ভাষার সাহায্যে রূপসৃষ্টি—এই তত্ত্ব সাহিত্যপরিচয়ের একটা বড় তত্ত্ব। বাংলা 'রূপ' কথাটির প্রচলিত অর্থ যাহা, তাহা হইতে এই অর্থ যে ভিন্ন, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত, ভাবের যাহা বিপরীত তাহাই রূপ; ভাব একটা মানস-বস্তু বা মানস-ক্রিয়ার ফল; একটা আইডিয়া, ধারণা বা ক্রিয়াকেও ভাব বলিব; ইহা মনেই উৎপন্ন হইয়া বাহিরের জগতে আরোপিত,—অথবা বাহিরের জগতের সংস্পর্শে মনের মধ্যে উদ্রিক্ত হয়; ইহার কোন রূপ নাই। আর একজাতীয় ভাব আছে, তাহা মানুষের আর এক প্রকার অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তির ফল; সে একটি পৃথক প্রবৃত্তি, তাহাকে রস-প্রবৃত্তি বা আনন্দ-পিপাসা বলা যাইতে পারে। ইহাও দুইমুখী—অন্তর্মুখী, বা নিছক ভাবমার্গী; এবং

বহির্মুখী, বা জগৎ ও জীবনের বস্তুগত অস্তিত্বের আশ্রয়কামী। এই শেষোক্ত প্রবৃত্তি কখনও abstract বা সম্পূর্ণ মনোগত বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে না, ইহা নিরন্তর বস্তু-রূপের কামনা করে। এই প্রবৃত্তির বশেই মানুষের চিত্তে সৃষ্টি-প্রেরণা জাগে, বাহিরের সৃষ্টিকে—বিধাতার বস্তুময়, ঘটনাময়, দৃশ্যময় রচনাকে—তাহারই স্বকীয় ছন্দ, রঙ ও রেখায়, একটা অপূর্ব্ব অর্থসমন্বিতরূপে আবিষ্কার করে। এই যে আবিষ্কার, ইহাই গভীরতর অর্থে রূপসৃষ্টি; এখানে রূপকথাটির অর্থ আরও সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল। কবি-বিধাতার হস্তলিপি-রচিত যে কাব্য প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে সম্মুখে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তাহারই অক্ষরে অক্ষরে দাগা বুলাইয়া, তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে—ভাবনা করিয়া নয়, মনুষ্যচেতনার অধিগম্য তাহার যে রূপ, তাহাই দৃষ্টিগোচর করিয়া—বাক্যের পটবস্ত্রে তাহাকে দৃশ্যরূপে স্থাপন করাই উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তি; তাহাকেই আমি খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে, ভাব ও রূপের পার্থক্য-বিচারে, আমি উপরে অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তির যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা মনে রাখিতে হইবে; ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মনোবৃত্তি ও রস-প্রবৃত্তি দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্তি হইলেও, সাহিত্যসৃষ্টিতে এই দুই বৃত্তির মিশ্রণ বা বৃত্তিসঙ্কর এমনভাবে হইয়া থাকে—অনেক সময়ে তাহা এত গূঢ় ও প্রচ্ছন্ন থাকে যে, সাহিত্যবিচারে ভ্রম-প্রমাদ প্রায়ই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তথাপি আশা করি, সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইবে না।

২

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি, তাহার পর, খাঁটি সাহিত্যরচনা কি, সে বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট ধারণা করিবার সুবিধা হইবে। পূর্ব্বে আমি এক স্থানে বলিয়াছি, সাহিত্যসৃষ্টি চিত্র বা ভাস্কর্য্যের মতই একটা রচনাকার্য্য। গদ্যেই হউক আর পদ্যেই হউক, এইরূপ রচনাকে সাধারণভাবে কাব্য বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা—সকল সৃষ্টিধর্ম্মী রচনাকেই কাব্যজাতীয় সাহিত্য বলিতে হইবে। যেহেতু এ সকলই এক অর্থে রূপ-সৃষ্টি, অতএব ইহাও অন্যান্য শিল্পকলার মত একটা শিল্পকর্ম্ম বলিয়াই সহসা মনে হইবে। কিন্তু খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষণ বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইহা ঠিক আর্ট বা কলাকীর্ত্তি নহে; তাহা হইতে ভিন্ন, অথবা শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীতও একটি কলা, সুর-রচনার

সাহায্যে ভাবোদ্রেক করাই তাহার অভিপ্রায় ; কিন্তু সে ভাব যতই গভীর বা মর্ম্মান্তস্পর্শী, কিংবা চিদ্‌ঘন আনন্দের উদ্রেককারী হউক, তাহা রূপাশ্রয়ী নয় ; জগৎ ও জীবনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তাহাতে নাই। চিত্র ও ভাস্কর্য্যও দুই বিভিন্ন কলা ; ইহাদেরও আদি-আদর্শ সঙ্গীত ; অর্থাৎ ইহারা বস্তুর রূপ বা রঙ-রেখা ও আকার প্রভৃতির সাহায্যে অভিব্যক্ত হইলেও, রূপ-কে রূপকে পৌছাইতে না পারিলে—বিশেষের সাহায্যে নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনা, সকল উপাদানের সাহায্যে একটা সঙ্গীত-সঙ্গতির রসাবেশ উদ্রেক করিতে না পারিলে—তাহা উচ্চাঙ্গের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিতে এইরূপ ভাবাবস্থা মাত্র উদ্রেক করিবার নৈপুণ্য থাকিলেই চলিবে না, তাহাতে জীবন ও জগৎঘটিত একটা সাক্ষাৎ উপলব্ধি —ভাবে নয়, রূপসমন্বিত হইয়া বিদ্যমান থাকা চাই ; অর্থাৎ, জীবন ও জগতের একটা সাক্ষাৎ পরিচয় সেই ভাবাবস্থাতেও আমাদের চৈতন্যগোচর হওয়া চাই। ইহাতে আর্টের নৈপুণ্য যতই থাকুক, বাস্তবসৃষ্টির রহস্যবোধ—প্রত্যক্ষ প্রকাশমান রূপেরই একটা নিবিড় চেতনা যদি লুপ্ত হয়, তবে তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। যে রচনায় ভাব বহির্মুখী না হইয়া একেবারে অন্তর্মুখী হইতে চায়, যাহাতে জীবন ও জগৎ কোন এক দিক দিয়া খণ্ড-ভাবে একটা বিচিত্র অন্তর-অনুভূতির symbol বা প্রতীক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা আর্ট মাত্র—বা ছোট আর্ট ; সাহিত্য যে আর্ট, তাহা আরও উচ্চ, আরও বড়। সেই সকল অপর আর্ট আত্মসর্ব্বস্ব ; তাহা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধ্যান-কল্পনাকে প্রকাশ করে, সার্ব্বজনীন চেতনা, বা জীবনের বস্তুগত সমগ্ররূপ তাহার লক্ষ্য নয়। যাহা আর্ট মাত্র, তাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে একটা মানস-সুষমা দান করে ; বস্তু বা ইন্দ্রিয়ার্থের সম্পর্কশূন্য হওয়ায় তাহা আর সৃষ্টি-রহস্যে অনুপ্রাণিত হয় না ; সাক্ষাৎ দেহ-চেতনা হইতে মুক্ত হয় বলিয়াই তাহা সৃষ্টিকে অস্বীকার করে। একটা ছবি, একটা প্রস্তরমূর্ত্তি, একটা শাল বা কার্পেটের নক্সা—এমন কি, একটা সুরসমষ্টির ঐক্যতান, এই জন্যই আর্ট বা শিল্পরচনা হিসাবে সার্থক হয় যে, তাহাতে জীবনের কোন ব্যাখ্যা বা রূপ-প্রদর্শন নাই ; বরং জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া 'রস' নামক একটি বস্তুর সাধনাই তাহার লক্ষ্য। কিন্তু সাহিত্য এইরূপ আর্টসাধনা নয়, তাহা খাঁটি সৃষ্টিকর্ম্ম। এই সৃষ্টিকার্য্যের বিষয় ও প্রেরণা কি, এক্ষণে তাহাই বলিব।

এ পর্য্যন্ত ইহাই বলিয়াছি যে, সাহিত্য-রচনার উপাদান যেমন ভাষা—সাহিত্য বাঙ্ময় বিগ্রহ, তেমনই, সেই বিগ্রহ জীবনেরই একটি সুপ্রকাশিত রূপ। এখন এই জীবন কথাটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে—সাহিত্যের সম্পর্কে ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। সমস্ত বহির্জগতের পরিবেশ—সেই পরিবেশের যতখানি মানুষের চেতনায় বিরাজ করে তাহারই আশ্রয়ে, এবং মানুষের দেহ-মন-প্রাণের সহিত অখণ্ডনীয় নিয়তিসূত্রে সংযুক্ত হইয়া, পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতির পরিবেষ্টনীতে মানুষকে প্রধান নায়ক করিয়া, যে বিরাট নাট্যলীলার অভিনয় হইতেছে, তাহাই জীবন—তাহাই সাহিত্যের বিষয়। জীবন বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। তথাপি এই ব্যাপক অর্থ বুঝাইবার জন্য আমি প্রায় সর্ব্বত্র 'জীবন ও জগৎ' এই যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। সাহিত্যের বিষয়ীভূত জীবনকে নাট্যলীলা বলিবার কারণ আছে। জীবনের এই বহিঃপ্রকাশ যে আর এক ভঙ্গিতে মানুষের জ্ঞানগোচর হয়, তাহাতে জীবনধারণের সমস্যাই প্রবল; তাহাতে কোন রূপ নাই, অর্থাৎ সমগ্রতার উপলব্ধি নাই; তাহা খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে, প্রয়োজনের তাড়নাসম্ভূত চিন্তা-সমষ্টিরূপে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। এজন্য তাহা একটা রূপ-পরিণামী আদি-অন্তযুক্ত দৃশ্যপরম্পরার মত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না—কেবল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও ঘটনাপরম্পরায় প্রতিভাত হয়। তাই জীবনের যে রূপকে আমি সাহিত্যের সাধন বলিয়াছি, তাহাকে নাট্যলীলার সহিত তুলনা করাই সঙ্গত। জীবনের অপর অভিজ্ঞতাকে বাস্তব নাম দেওয়া হইয়া থাকে, এবং ইহা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুর্দ্ধর্ষ প্রমাণরাশির বলে একটা তত্ত্বরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবনের এই মূর্ত্তির সঙ্গে সাহিত্যের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই—মানুষ যেখানে এই বাস্তবের উপাসনা করে, সেখানে সে সাহিত্য সৃষ্টি করে না। সাহিত্যের বিষয় যে জীবন, তাহাও বাস্তব—কেবল তাহা জড়-বাস্তব নহে, চিন্ময় বাস্তব। মানুষের দেহ অ্যানাটমি-বিদ্যার নিকটে যাহা, ভাস্কর বা চিত্রকরের নিকট নিশ্চয় তাহা নহে; সেই দেহের নানা অঙ্গসংস্থান, অস্থি ও স্নায়ুশিরার সংখ্যা, ও তাহাদের বিন্যাসপদ্ধতির জ্ঞানই মনুষ্যমূর্ত্তির পরিচয় নহে। সেই মূর্ত্তির আপাদমস্তক সর্ব্ব অঙ্গের যে ছন্দ, তাহার লীলায়িত গতিভঙ্গি, তাহার স্বাস্থ্যের লাবণ্য, তাহার মুখের হাসি ও চোখের কটাক্ষ যে

রূপের সাক্ষ্য দেয়—পেশী মাংস অস্থি ও স্নায়ুশিরার সমষ্টি যে দেহ, সে দেহে তাহা থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানীর নিকটে দেহ একটা বহু অঙ্গ-বিশিষ্ট যন্ত্রমাত্র, তাহার প্রাণ সেই যন্ত্রের একটা ক্রিয়া; এবং সেই প্রাণ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ ছাড়া তাহার কোন অর্থ বা অভিপ্রায় নাই। ইহার পর, এই যন্ত্রের বিকল হওয়ার যত কারণ, এবং তাহা নিবারণ করার যত কৌশল—তাহাই যন্ত্রবিদ্‌কে অনন্যমনা করিয়া রাখে। প্রাণধারণের পক্ষে ইহার প্রয়োজন আছে; কিন্তু সৃষ্টির রহস্যবোধের পক্ষে ইহা নিতান্তই খণ্ড বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র। ইহা সেই অন্তশ্চক্ষুর গভীরতর দৃষ্টিকে রোধ করিয়া দাঁড়ায়, যাহা পদক্ষেপ হইতে কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত সর্ব্ব অঙ্গের মিলিত সুষমায়—কণ্ঠের আর্ত্তচীৎকার ও কলধ্বনি, দেহের স্বেদ-কম্প-পুলক-শিহরণ—এই সকলের মধ্যে, একটি অখণ্ড চিৎ-সত্তার অপরূপ প্রকাশ আবিষ্কার করে। এই যে সৃষ্টি, ইহার মূলে কেবল জড়ের জড়ধর্ম্মের উত্তেজনাই নাই, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ একটি সম্বোধি জাগ্রৎ হইয়া থাকে। আমি বিজ্ঞানের জড়বাদ ও সাহিত্যের এই জীবনবাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটি সাধারণ উপমা ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে আমার বক্তব্য কিছু বিশদ করিবার সুবিধা হইয়াছে—উপমা যেমন সাহিত্যের ভাষা, তেমনই সাহিত্য-বিচারেও উপমার উপযোগিতা অল্প নহে।

সাহিত্যে আমরা এই জীবনকেই—আকারে-ইঙ্গিতে, রূপকে-প্রতীকে, ভাবে ও ভাবনায়—কখনও সুরের অনির্ব্বচনীয়তায়, কখনও বাক্যের অপরূপ ব্যঞ্জনায়, কখনও বা অর্থে, কখনও অর্থহীনতায়, কখনও স্থিরচিত্রে, কখনও ঘটনার গতিচ্ছন্দে, কখনও রূপবিবর্জ্জিত অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে, কখনও মানস-কণ্ডুয়নজাত নানা মতবাদের ভূমিকায়—এবং প্রায় এই সকলের একাধিক ভঙ্গির মিশ্রণে, প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি। কিন্তু আসলে জীবনকে সাহিত্যে রূপ দিবার ভঙ্গি এক বই দুই নহে—অন্তত যাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে একই। সেই রূপ কি, আর একবার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কবিও রূপকার—কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করের মত রূপকার নহেন; সাহিত্যের আর্ট—সঙ্গীত চিত্র বা তক্ষণকলার আর্ট নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেন, তাহা আবার বলি। সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম্ম হয় বাক্যে—বাণীতে; ইহাতে সেই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। বাক্যে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা

অর্থবান্ অথচ অর্থাতীত; তাহা ভাবময় অথচ রূপাশ্রিত; তাহা চিত্র ও মূর্ত্তি-কলার অনুকারী, অথচ দেশে ও কালে তাহাদের মত সীমাবদ্ধ নয়; তাহা সঙ্গীতযুক্ত অথচ নির্ব্বিশেষ নয়—সবিশেষ। এই জন্যই বাণী ভিন্ন অপর কিছুতেই এ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সৃষ্টিতে যাহা খণ্ডরূপে, ব্রহ্মের জড়মূর্ত্তিরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাই কবির অখণ্ড অনুভূতিতে—যেন একপ্রকার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-চেতনায়—সমগ্ররূপে চিন্ময় হইয়া উঠে; কোনও একটা ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রধান হইয়া মনকে অধিকার করে না, হৃদয়ের একটা বিশেষ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া সূক্ষ্মভাব ও শেষে সূক্ষ্মতর রসাবেশে লয়প্রাপ্ত হয় না। এই সর্ব্বানুভূতির ঐক্যবোধযুক্ত যে রূপ, তাহাকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনের রূপ বলিয়াছি; এবং দেশ ও কালের ভূমিকায় এই রূপ নিরন্তর উদ্বর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া আমি নাট্যলীলাকেই সাহিত্যের আদর্শ বলিয়াছি; সঙ্গীত যদি অন্যান্য শিল্পের আদর্শ হয়, তবে সাহিত্যকে—তাহার সৃষ্টিনিহিত রূপকে—নাট্যরূপ বলিতে হইবে। যাহা দেশে ও কালে—যুক্ত নয়—খণ্ডিত, যাহা ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তের একটা অসংলগ্ন সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই একটা প্রাণবন্ত গতিধারায় আদি মধ্য ও অন্ত যুক্ত করিয়া দেখানোই সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম্ম। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যে—মহাকাব্য, কাহিনী, উপন্যাস, এমন কি, উৎকৃষ্ট খণ্ডকবিতায়, জীবনের এই নাট্যলীলাত্মক রূপ আছে। এই জন্যই বোধ হয় জীবনকে প্রতিবিম্বিত করিবার উৎকৃষ্ট বাণী-মুকুর নাটক; আর কোথাও জীবনের রূপ-সমগ্রতা আমাদের চিত্তে এমন অবাধে সংক্রামিত হয় না। যখন কোন রচনার এইরূপ লক্ষণ আমরা বিচার করি, তখন দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে একটা কিছুর সমগ্র প্রকাশ আছে কি না—জীবনকে যেখানে যেদিক দিয়াই দেখি, তাহাতে একটা পূর্ণ পরিধি কেন্দ্র-যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে কি না; কাব্য বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক—রচনার বিষয়বস্তু যেমনই হউক—সিন্ধুর বিশাল বক্ষে যেমন, তেমনই পুষ্করিণী ও গোষ্পদে সেই এক চন্দ্রবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে কি না। এই যে সমগ্রতার রূপ-সংবেদনা, ইহাতেই জীবনের সকল অনর্থ অর্থবান হইয়া উঠে, সকল দুঃস্বপ্ন দূর হইয়া অন্তর যেন অরুণালোকে উদ্ভাসিত হয়। এখানেও দেহের সেই উপমাটা আর একবার কাজে লাগিবে, জীবনের রূপ বুঝিতে দেহের রূপই ধরা যাক। জড়বাদী দেহকে যে ভাবে দেখে, তাহাতে

যেমন রূপ নাই, আছে গ্রন্থিবদ্ধ কয়েকটা খণ্ডের সমষ্টি—তেমনই, দেহকে দেখিবার কালে যাহার দৃষ্টি দেহকে অতিক্রম করিয়া তাহার পশ্চাতে একটা ভাবময় সত্তাকে আবিষ্কার করে, অথবা দেহকে সেইরূপ একটা মানস-সংস্কারের প্রতীকরূপেই গ্রহণ করে—সেও এই রূপের কারবারী নহে। একটা উদাহরণ দিব। যে কবি বিশ্বমানবের ধ্যান করেন, তিনি মানুষের দিকে না তাকাইয়া—তাহাকে অতিক্রম করিয়া—মানব-নামে একটা পরম সত্তার পূজা করেন, তিনি মানুষের দেহদশার সকল দুঃখ, তাহার জীবনযাত্রার নিয়তি-নির্দ্ধারিত পাপ-তাপের মধ্যে, অর্থাৎ তাহার বাস্তব প্রকৃতির মধ্যেই, জীবনের রহস্য সন্ধান করেন না; মানুষকে ভাল না বাসিয়া, মানবতার একটা ভাববিগ্রহ গড়িয়া তাহারই পূজা করেন। তাঁহার রচনায় জীবনেরই রহস্য রূপময় হইয়া উঠে না। আবার, যে রচনায়, দেহের কোন একটি অঙ্গের—যেমন ভ্রূলতা, নয়ন-ইন্দীবর, বা ভুজবল্লরীর—রমণীয়তাকেই প্রেক্ষণীয় করিয়া তোলা হয়, সে রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম্ম নয়, এক প্রকার শিল্পকলা মাত্র।

আমি যে রূপসৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম্ম বলিয়াছি, তাহা ঐ দেহের মতই জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সুষমার অভিব্যক্তি; সে রূপ—ঐ দেহেরই মত—জীবনেরও যেন কান্তি; তাহাতে জীবনের সকল বিষমতা ও বিরোধ, সকল খণ্ডতা ও অসংলগ্নতা, একটি সমগ্ররূপে সমাহিত হইয়া প্রকাশ পায়। দেহের রূপ যেমন কোন একটা অঙ্গবিশেষের রূপ নয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এবং অখণ্ড হইলেও তাহা দেহময়—এজন্য তাহা একই কালে বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ; জীবনের রূপও, তেমনই, সাহিত্যে আমাদের চিত্তগোচর হয়। যেখানে জীবনের এই রূপ আমাদের চেতনায় একটি অপরূপ অর্থ-সঙ্গতি লাভ না করে—সেখানে সাহিত্যের প্রেরণা বিফল হইয়া থাকে। দেহ ও দেহের কান্তির যে উপমা দিয়াছি, জীবন জীবনের রূপ তাহা হইতেই বুঝিয়া লইতে হইবে; কায়া হইতে কান্তি যেমন পৃথক করা যায় না, সাহিত্যেও তেমনই, জীবন হইতে জীবনের রূপকে পৃথক করা যায় না। অতএব তত্ত্ববিচারে দেহাত্মবাদ নামে যে একটি সিদ্ধান্ত আছে, সাহিত্যবিচারেও এইরূপ সিদ্ধান্তকে কায়া-কান্তিবাদ নাম দেওয়া যাইতে পারে। পরিশেষে, সাহিত্যসৃষ্টির সম্পর্কে জীবনের যে ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি, তাহাতে আর একটি কথা যোগ দিলেই

আমার বক্তব্য শেষ হয়। তাহা এই যে, সাহিত্যে জীবন ও জীবনের রূপ বলিতে যাহা এবং যতখানিই বুঝি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা নর-লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগৎ-নাট্যলীলার নায়ক মানুষ; জীবনে যাহা কিছু দেখি তাহা মানুষেরই দেহ-নিয়তির সঙ্গে মিলাইয়া দেখি; যেখানে সেই দেখা নাই, সেখানেই সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই। সাহিত্যে আমরা জীবনের যে চিন্ময় প্রকাশ দেখি, তাহা মনুষ্যজীবনের জবানিতেই ঘটিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সে রচনা আর্ট-জাতীয় বস্তু হইবে, খাঁটি সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্য হইবে না।

৩

এতক্ষণ সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করিয়াছি, এবং সে বিচারে সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ—যাহাকে আমি স্বরূপ লক্ষণ বলি—তাহার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু শুধু সেই দিক দিয়াই বিচার করিলে চলিবে না, আরও একদিক আছে, সেই দিক দিয়াও দেখিতে হইবে, নতুবা এ বিচার অসম্পূর্ণ থাকিবে। সাহিত্যের প্রকৃতি-বিচারে তাহার বাহিরের রূপ যেমন একটা বড় কথা তেমনই সেই রূপসৃষ্টির প্রেরণাও অনুধাবনযোগ্য। এই প্রেরণার জন্ম হয় কবিচিত্তে। অতএব কবিচিত্ত বলিতে কি বুঝি, তাহাই এক্ষণে বলিব।

সাধারণ মানুষের চিত্ত ও কবিচিত্তে প্রভেদ এই যে, সাধারণ মানুষের চেতনায় অনুভূতির ক্ষেত্র অতিশয় সঙ্কীর্ণ—যতই গভীর হউক, তাহার প্রসার অল্প। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব বড়ই সীমাবদ্ধ। অনুভূতির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ বলিয়াছি এই অর্থে যে, তাহা এক হইতে অপর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে পারে না, খণ্ডের গণ্ডি পার হইয়া সমগ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। আমরা যাহাকে কবি-কল্পনা বলি—উৎকৃষ্ট অর্থে, তাহা এই প্রসারশীল অনুভূতির ফল; ইহা হইতেই কবিচিত্তে জীবনের রূপদর্শন ঘটে। দ্বিতীয় যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহা আরও গভীর, তাই ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। কবির ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষের মত সীমাবদ্ধ নয়, অর্থাৎ কবির মধ্যে একজন ব্যক্তিরই কামনা-ভাবনা নাই, তিনি যেন সকল মানুষের প্রতিনিধি। ইংরেজীতে ইহাকে rich ও composite personality বলা যাইতে পারে। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি

শেক্‌স্পীয়ারকে এক মনীষী যে বলিয়াছিলেন—'genius of humanity', ইহা যথার্থ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ইংরেজীতে individuality বলে, ইংরেজীতে আর একটি শব্দ আছে—personality; এই দুইটি শব্দের অর্থগত প্রভেদ এখানে কাজে লাগিবে। প্রত্যেক মানুষের বাহির ও অন্তরের গঠনে অপরের সঙ্গে যে বৈলক্ষণ্য আছে—যাহা তাহারই, যাহা দ্বারা আর সকল হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া যায়, তাহাই তাহার individuality। কিন্তু personality বলিতে এই ব্যক্তিত্ব নয়—সাধারণ মানব-চরিত্রেরই এক ঘনীভূত বা প্রবলতর প্রকাশ বুঝায়। কবির personality ইহা হইতেও বড়; তাহা ঘনীভূত বা প্রবল নয়, তাহাতে কোন বিশেষ পুরুষ-মহিমা নাই, তাই তাহা ব্যক্তিত্বেরই একটা বিশেষণ নয়—ব্যক্তিজীবনেরই একটা পৌরুষময় মূর্ত্তি নয়। সে যেন এক পুরুষচিত্তের আধারে সকল পুরুষচিত্তের সমান স্ফূর্ত্তি—ইহাই Genius of Humanity; এবং ইহাই genius, বা কবি-প্রতিভা। ইহারই কারণে কবির অনুভূতি সর্ব্বমানবীয় অনুভূতি হইয়া দাঁড়ায়; তাঁহার সৃষ্টি যতই অপূর্ব্ব হউক, তাহা সকলের অনুভূতিগোচর হয়,—কারণ, তাহা ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি বা উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি নহে। অতএব কবিচিত্তের যে আর এক লক্ষণ—যে প্রসারশীল অনুভূতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাও এই লক্ষণের সহিত যুক্ত হওয়া চাই, তবেই উৎকৃষ্ট প্রতিভার জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কবিচিত্ত সর্ব্বমানবচিত্তের প্রতিনিধি বলিয়াই তাহা অতিশয় normal বা সুস্থ; individuality বা ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের দিক দিয়া দেখিলে কেহই normal নয়। তাই উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা এত দুর্ল্লভ।

কবিচিত্তের এই লক্ষণ—এই সর্ব্বময় personality-র প্রসঙ্গে, আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবিচিত্তে এই যে বহুমুখিতার লক্ষণ আছে, তাহা সত্ত্বেও সে চিত্ত বহুর নয়—একেরই চিত্ত; অর্থাৎ তাহা খণ্ডিত বা অসংলগ্ন নয়, তাহা হইলে কবির সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র দৃষ্টির মূলগত ঐক্য থাকিত না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে একই ব্যক্তির মধ্যে যে multiple personality-র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—কবির এই personality বা চিৎ-সত্তা সেইরূপ বহুত্বসম্পন্ন নয়; তেমন প্রকৃতি normal বা সুস্থ প্রকৃতি নয়। কবির চিত্ত বহুল নয়, তাহা বিরাট; সংখ্যাধিক্য নয়—প্রসার ও প্রশস্ততাই সেই সার্ব্বজনীনতার কারণ; সে

বহুত্বে গণিতের নিয়ম নাই ; এক প্রকার প্রেমেরই যাদুশক্তি আছে। সেখানে একটা 'আমি'র মধ্যেই সকল 'আমি' স্পন্দিত হইতেছে—সর্ব্বমানবচিত্ত একমুখী হইয়া একই শক্তির পুরুষসত্তাকে বিরাট-পুরুষ করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য কবির মধ্যে ব্যক্তি যিনি, তিনিও নৈর্ব্যক্তিক হইয়া আছেন। কবিচিত্তে ব্যক্তি ও নির্ব্যক্তির এই লুকোচুরি কবিপ্রতিভার আর এক রহস্য, ব্যক্তিত্বই যেন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে নৈর্ব্যক্তিক করিয়াছে। তাই যে-জগৎ তাঁহারই জগৎ—তিনি ভিন্ন আর কেহ যাহা রচনা করিতে পারিতেন না—সেই জগৎ তথাপি একার জগৎ নহে, সকলের জগৎ—উৎকৃষ্ট কাব্যপাঠকালে এই উপলব্ধিই আমাদিগকে সমধিক বিস্মিত ও পুলকিত করে। এই জন্যই বলিতে হইবে, কবি নিজচিত্তে সকল চিত্তকে ধারণ করেন—ব্যক্তিই বিরাট হইয়া উঠে।

আধুনিক কালে কবিচিত্তের এই লক্ষণ স্বীকৃত হয় না, এখন এইরূপ personality অপেক্ষা individualityর উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু individuality বা কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই উৎকৃষ্ট কবিকর্ম্মের পরিপন্থী। যে কবির চিত্তে স্বাতন্ত্র্য যত অধিক, তিনিই সেই পরিমাণে জগৎ ও জীবনের সহিত যোগযুক্ত নহেন, তিনি সার্ব্বজনীন মানব চিত্তের অধিকারী নহেন, তাঁহার রচনা আত্মভাবস্পর্দ্ধী ; তিনি নিজেরই idiosyncrasy বা ব্যক্তি-স্বভাবের বশে নিজের বিচিত্র-গঠন মানসদর্পণে জগতের যে প্রতিবিম্ব রচনা করেন, তাহা যেমন সৃষ্টির সত্যে অনুপ্রাণিত নয়, তেমনই তাহা সর্ব্বমানবচিত্তের দৃষ্টিগোচর নহে। যাহাদের সহিত সেইরূপ মানসধর্ম্মের মিল আছে, কেবল তাহারাই, অনুরূপ আত্মাভিমান তৃপ্ত হয় বলিয়া, সে রচনার পক্ষপাতী হয়। আধুনিক সাহিত্যসমাজে এই ধরণের রসিকেরাই সম্মান পাইয়া থাকেন ; এবং ইংরেজীতে ইঁহারা যে intellectuals নামে অভিহিত হন, তাহাও সঙ্গত ; কারণ, ইঁহারা সাহিত্যবিচারে প্রকৃতই মনোবিলাসী ; ইঁহারাও আত্মভাবপন্থী। সাহিত্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি আধুনিক কালে অত্যধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে—ইহাতে সাহিত্যের স্বকীয় আদর্শ নষ্ট হইতেছে, জীবনের দেহচেতনাগত রূপমাধুরী, এবং কায়ার সহিত অভিন্ন যে কান্তি, সাহিত্যে তাহা আর ফুটিতে পারিতেছে না।

কবিচিত্তের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে এই ভাবতন্ত্রের মতই,

সাহিত্যের Realism বা বস্তুতন্ত্রের কথাও প্রাসঙ্গিক বটে। ভাবতান্ত্রিক যেমন আত্মভাবের আদর্শে আপনার জগৎ পৃথক গড়িয়া থাকেন, এবং তাহার মূলে আছে স্বাতন্ত্র্যের অভিমান, বস্তুতান্ত্রিকের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। এই সকল লেখক যেমন কোন স্বকীয় স্বতন্ত্র অনুভূতি দাবি করেন না, তেমনই, কোনপ্রকার অনুভূতি-কল্পনাও তাঁহাদের নাই। বস্তুতান্ত্রিকের বুদ্ধি জগৎকে বস্তুসমষ্টিরূপেই দেখে—সে যেন কতকগুলা বক্র ভগ্ন অসম্পূর্ণ অর্থহীন রেখার সমাবেশ। ইহার কারণ, পুরুষের যে সম্বিৎ কোন কিছুকেই অসম্পূর্ণ দেখিতে চায় না—হয় কল্পনা, নয় বিশ্বাস, অথবা প্রেমের দ্বারা জগতের সব কিছুর একটা সঙ্গতিবোধ করে—ইহারা তাহাকে প্রশ্রয় দেয় না; ইহাদের প্রেম নাই, ইহারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক। আমি পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের কথা বলিয়াছি, ইহারা সাহিত্যেও তাহারই আরাধনা করে। ইহাদের মতে মানুষের দেহও তড়িৎ-তাড়নার মত কতকগুলা সুখদুঃখ-অনুভূতির আধার। সেই অনুভূতি যেন মুহূর্ত্তের অনুভূতি মাত্র, যদি তাহার পরম্পরাও থাকে, তবে তাহার কোন পরিণাম নাই। এরূপ রচনায় রূপসৃষ্টি তো পরের কথা, একটা সঙ্গতি-সুষমাও লক্ষিত হয় না; ইহা শিল্পকলারও অন্তর্ভুক্ত নহে; কারণ, সেখানেও অর্থহীন রং রেখা প্রভৃতিকে একটা সুবলয়িত সুষমা দান করার প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু রহস্যের কথা এই যে, এই সকল বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকেরা বস্তুর নিছক বাস্তবতাকেও আয়ত্ত করিতে পারেন না। ইহার কারণ, বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে আত্ম-সংস্কার বর্জ্জন করা যতই সম্ভব হউক, যে-রচনা আদৌ অনুভূতিমূলক—সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-পরিচয়ের উপরেই যাহার নির্ভর, তাহাতে বস্তুর মধ্যে লেখকের আত্ম-প্রবেশ থাকিবেই। সেই আত্ম-সংস্কারকে দমন করা অসম্ভব বলিয়াই বাস্তব-চিত্রের মধ্যেও আত্মভাবেরই একটা অতিশয় বিকৃত ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ রূপ ফুটিয়া উঠে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, Realism বা বস্তুতন্ত্র সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

অতঃপর, সাক্ষাৎ সাহিত্যসৃষ্টিতে কবিচিত্তের প্রেরণা কি, তাহাই বলিব। সাহিত্যসৃষ্টিতে কবির মূল প্রেরণা ভাবও নয়, চিন্তাও নয়—বাহিরের সহিত অন্তরের একাত্মতা; এই জগৎ ও জীবন যেন তাঁহার চেতনাকে অধিকার করিয়া রূপের ভাষায় আপন কথা বলে; অর্থাৎ তাহার কোন অংশই দেশ কাল হইতে

বিচ্ছিন্ন না হইয়া—যেমন আছে, হয়, ও ঘটে—তাহারই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। এখানে এই যে রূপের কথা বলিলাম, ইহা ভাবের বিপরীত মাত্র। জীবনের কোন একটা অভিজ্ঞতা হইতে, অথবা আমারই অন্তরের কামনা হইতে, ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে; এই ভাব অতিসূক্ষ্ম অনুভূতি-রসে পরিণত হইয়া এক প্রকার কাব্যের প্রেরণা হয়। কিন্তু এই ভাবমূলক রচনার রূপ নাই, ইহার ভাষা ভাবেরই ভাষা—আমারই হৃদয়োত্থিত এক অশরীরী বিগ্রহ, ইহা আমার সম্মুখে জগতেরই একটা ঘটনা বা দৃশ্যরূপে উদয় হইতেছে না। তাই ইহা জীবন-দর্শন নয়, এক প্রকার আত্মদর্শন মাত্র। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে—জীবনের রূপও নয়, ভাবের রসসৃষ্টিই কাব্যের মূলীভূত অভিপ্রায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভাব বরং বস্তুমুখী; রস ভাবেরও সূক্ষ্মতর পরিণাম, একেবারে বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য! কিন্তু আমি যে রূপের কথা বলিয়াছি, তাহা বস্তুর সহিত অভিন্ন; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা বস্তুতন্ত্রের বাস্তব নহে। এখানে কায়া ও কান্তির উপমা স্মরণ করিতে হইবে। অতএব কবিত্বের মূল প্রেরণা—বাহিরের সহিত অন্তরের একাত্মতা। ইহাকে যদি আত্মার সহিত দেহের মিলন, জড়ের সহিত চিৎ-এর পরিণয় বলি, তবে কথাটা বড়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিবে। যদি বলি—ইহাই প্রেম, তাহা হইলে কথাটা কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইহারও পরে, যদি বলি, এই প্রেম আত্মমুখী নয়, বহির্মুখী—ইহা আত্মরতি নয়, জগৎ-রতি, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। জগৎ ও জীবনের প্রতি এই আসক্তি যখন ভাবের আকারেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা নয়, সেও নিজেরই সুখদুঃখের গীতময় উচ্ছ্বাস; তাহার যে কবিতা, সেও রূপাত্মক নয় ভাবাত্মক; এ জন্য তাহা উৎকৃষ্ট গান হইলেও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নহে—উৎকৃষ্ট আর্ট হইলেও, উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে। তথাপি সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কবির সেই আসক্তি আছে—ইহারই বশে কবিচিত্ত এক আশ্চর্য্য উপায়ে জগতের বিক্ষিপ্ত বস্তুরাশির মধ্যে অনুস্যূত হইয়া নটলীলায় প্রবৃত্ত হয়; তখন কিছুই আর ভাব নয়, 'ভব', বা—ঘটনায়, দৃশ্যে, আকারে, অবস্থানে শরীরী—হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কবি যখন বলেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই;"

—তখন তাহাতে খাঁটি জগৎ-প্রীতির প্রেরণাই আমরা লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু এখানে তাহা ভাবের আকারেই আছে—'ভব' হইয়া উঠে নাই; অর্থাৎ, একটি ভাবরূপেই তাহা আমাদের চিত্তে সংক্রামিত হয়—জীবনের কাহিনীতে রূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ হইয়া উঠে না। ভাব ও রূপের এই প্রভেদ অল্প নহে। ভাবের আদিও নাই, অন্তও নাই—উহা একটা চিত্ত-চমক মাত্র; কিন্তু রূপে, অর্থাৎ জীবনের ঘটনায়, যখন তাহা নাট্যীকৃত হয়, তখন তাহা আদি-অন্ত-যুক্ত হইয়া জীবনের গভীরতম রহস্যকে অপরোক্ষ করিয়া তোলে। উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে যে কামনা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কামনা মাত্র; তাহাতে রূপসৃষ্টির সম্পূর্ণতা নাই, ভাব হইতে ভাবেই তাহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু রূপসৃষ্টিমূলক সাহিত্যে আমাদের অনুভূতি এইরূপ ভাবমূলক অসম্পূর্ণ অনুভূতি হইবে না। সেখানে ভাবিবার কিছুই নাই, সকলই দেখিবার; তাই কামনাও একটা ঘটনার রূপে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে কবি যাহা কামনা করিতেছেন, তাহা নিশ্চয় অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না; বরং মৃত্যুর নিয়তিকে লঙ্ঘন করার যে সম্ভাবনা, তাহাই এই কামনাকে বৃহৎ ও কবিত্বময় করিয়াছে। কিন্তু এই কামনা যদি রূপে প্রকাশ পাইত, তবে দেখা যাইত 'আমি' মরে নাই, 'আমি' মানুষের মাঝে বাঁচিয়া আছে। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিত, ঐ 'আমি'টাকে তখন দেখিতে পাওয়া যাইত বলিয়া 'আমি' আর ব্যক্তি-আমি থাকিত না, সাধারণ আমি হইয়া যাইত—ভাবে যাহা ব্যক্তি-'আমি', রূপে তাহা সকলের 'আমি' হইয়া উঠে। এই জন্যই কাব্যসৃষ্টিতে Subjectivity বা মন্ময়তা অপেক্ষা Objectivity বা তন্ময়তাই কবিকল্পনার উৎকর্ষ প্রমাণ করে।

অতএব, এই যে রূপসৃষ্টি, ইহার মূলে আছে প্রেম—কারণ এমন করিয়া দেখিতে বা দেখাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'টাকে উৎসর্গ করিতে হয়। যিনি এই বিশ্বের আদি স্রষ্টা, তিনিও এই প্রেমের প্রেরণায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াই, জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছেন—নির্ব্বিকল্প কৈবল্যের অবস্থা ভাল লাগে না বলিয়াই, রসব্রহ্ম জগৎ-ব্রহ্মের রূপ ধারণ করিয়াছেন; এবং "ভাব হইতে রূপে যাওয়া আসা" নয়, নিত্য রূপের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন। কবির চিত্তেও সেই প্রেম জাগে—ভাগবতী সৃষ্টির সেই মূলকল্পনাকে মানবীয় সৃষ্টিতে, মানবদেহানুভূতির ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়; তাই

সাহিত্যে জগৎরূপী ব্রহ্মের দর্শন ঘটিয়া থাকে। রূপ—রূপ—রূপ! তত্ত্ব নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়; দেশ ও কালের দ্বিগুণিত সূত্রে বয়ন-করা, সর্ব্বেন্দ্রিয়-মনোহর সেই কাব্য—দেহকে দেহ দিয়া অনুভব করার মতই, প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠে। সকল রূপ-পিপাসার মূলে এই দেহ-প্রেমই আছে; এই রূপ-পিপাসা দেহপ্রেমই কবির প্রতিভায় দিব্যদৃষ্টিতে পরিণত হয়; তখন কিছুই আর ক্ষুদ্র, খণ্ড, কুৎসিত অপ্রীতিকর থাকিতে পারে না। ভাবের আত্মপরায়ণতায় যাহা তুরীয়ধর্ম্মী—অর্থাৎ অরূপের অসীমায় যাহা অর্থাতীত ও আদি-অন্তহীন তাহাই দেহের প্রেম-পিপাসায়—সমগ্র, সুষীম, রূপময় ও অর্থপূর্ণ। কিন্তু কেবল-মাত্র রূপ-পিপাসাই এই প্রেম নয়; রূপ-পিপাসায় কিছুই সৃষ্টি হয় না, তাহাতে ইন্দ্রিয়বিলাসের উপকরণ রচনা হয় মাত্র, তাহাকেই আর্ট বলে। তাহাতে জীবনের সমগ্রতাবোধ নাই, কারণ তাহাতে পিপাসাই আছে, প্রেম নাই। সেখানেও দেহের খণ্ডরূপেরই আরাধনা হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে এই রূপ-পিপাসার একটি চমৎকার অভিব্যক্তি আছে—

Mamua, when our laughter ends
And hearts and bodies, brown as white,
Are dust about the doors of friends,
Or scent ablowing down the night,
Then, Oh ! then, the wise agree
Comes our immortality :
Mamua, there waits a land
Hard for us to understand,
Out of time, beyond the Sun...
There the Eternals are, and there
The Good, the Lovely, and the True
And Types, whose earthly copies were
The foolish broken things we knew...
Never a tear, but only Grief ;
Dance, but not the limbs that move ;
Instead of lovers, Love shall be,
And there, on the Ideal Reef,
Thunders the Everlasting sea.

—এখানে রূপবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ যে অস্তিত্ব, তাহার বিরুদ্ধে বিশেষের অনুরাগী, দেহপিপাসাতুর প্রাণের যে দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাই, তাহা প্রেম নয়—পিপাসারই ভাবোচ্ছ্বাস। কবিচিত্তের প্রেম জগৎ ও জীবনকে "foolish broken things" বলিবে কেন? সকলকেই সুসম্পূর্ণ ও সুসম্বদ্ধ দেখিবে, এবং সেই দেখাতেই হৃদয়ে আর কোন আক্ষেপ থাকিবে না—আপন সৃষ্টির মধ্যেই একটা শাশ্বত ও চিরন্তনী সত্তা উপলব্ধি করিবে। সাহিত্যেই আমরা এই অপূর্ব্ব আশ্বাস লাভ করি; আর সকল পথে প্রশ্নকে এড়াইয়া চলিতে হয়, অথবা প্রশ্ন বাড়িয়াই চলে, সমাধান আর হয় না। এই জন্য সাহিত্যকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বা প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞান-পন্থা বলা যাইতে পারে।

৪

যাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টি, তাহাতে Idealও নাই, Realও নাই, কিন্তু রোমান্স আছে—থাকিবেই। রোমান্স অর্থে অতিচারী কল্পনা নয়, সত্যকার কবিকল্পনা। যে কল্পনা জড়কে চিন্ময় দেখে, খণ্ড ও বিচ্ছিন্নকে সমগ্র ও অর্থপূর্ণ করিয়া লয়—যাহা ভগ্নকে যুক্ত করে, অসংলগ্নকে সুসম্বদ্ধ করিয়া তোলে, তাহাই সাহিত্যকে রোমান্স-গুণযুক্ত করে—অর্থাৎ, জীবনের খণ্ডরেখায় যে মণ্ডলাভাস আছে, তাহার পূর্ণমণ্ডল আবিষ্কার করে। এই কল্পনার মূলে আছে প্রেম, ইহাই সুস্থ। কল্পনা যেখানে আত্মপরায়ণ বা আত্মদ্রোহী, সেখানে রূপসৃষ্টির রোমান্স নাই; অবাস্তব ভাববিলাস, অথবা বাস্তবের বস্তু-বিশ্লেষণ আছে। যাহা নাই, তাহার মনোহর মায়ারূপ-রচনা সত্যকার কাব্যসৃষ্টি নয়—যাহারা এই প্রকার রচনাকেই কাব্য বলে, তাহারাই উৎকৃষ্ট উপন্যাসকেও রোমান্স বলিয়া নাসাকুঞ্চিত করে; এবং জীবনের কাহিনীতে কল্পনাহীন বাস্তবের আধিপত্য থাকিলেই তাহাকে আদর্শ উপন্যাস বা সাহিত্যসৃষ্টির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য করে। এজন্য যে রচনায় প্লট বা সুসম্পূর্ণ কাহিনী নাই—ঘটনা সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ কার্য্যকারণের সম্বন্ধ মাত্র আছে, কিন্তু কোনও একমুখী পরিণামের মিলিত অভিপ্রায় নাই, তাহাই ইহাদের মতে জীবনের উৎকৃষ্ট চিত্র; কারণ তাহা বাস্তব, তাহা রোমান্স নয়। কিন্তু এইরূপ রচনাই সাহিত্যপদবাচ্য নয়, কারণ ইহাতে কবিদৃষ্টির লক্ষণ নাই। কাব্য-সৃষ্টিতে কবির দৃষ্টি স্থির, একাগ্র ও পূর্ণতার অভি-

মুখী ; তাহাতে অসম্বদ্ধ বাস্তবের বিবৃতি নাই বলিয়াই তাহা অবাস্তব বা মিথ্যা নয়। রোমান্স-বিরোধী যে বাস্তব, তাহাতে যাহা কিছু 'হয়', তাহার শেষ সেইখানেই ; সেই 'হওয়া'র কোন পরোক্ষ পরিণতি নাই, তাই সেইরূপ রচনায় কোন কাহিনী বা সুসঙ্গত প্লট থাকে না। কিন্তু উৎকৃষ্ট কবিকল্পনা সকল 'হওয়া'কেই একটি সম্পূর্ণ 'হওয়া'র রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে—'হওয়া'র এই সম্পূর্ণতাই রোমান্স, ইহাতে বাস্তবই পূর্ণ আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল রচনায় বাস্তবই নাই—অসংলগ্ন স্বপ্নখণ্ডকে, রূপে নয়, ভাবে অপরূপ করিয়া তোলা হয়—তাহাকে আমি রোমান্স বলিতেছি না, তাহাকে সাহিত্যিক সৃষ্টি বলিব না ; তাহাও আর্টের অন্তর্গত। আবার যেখানে 'হওয়া-উচিত'কেই জবরদস্তি করিয়া 'হয়'-এর উপরে চাপানো হয়, অর্থাৎ 'হওয়া'কে তাহার আপন নিয়মেই সম্পূর্ণ 'হইতে' দেখার দৃষ্টি নাই—ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আদর্শে জীবনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটা ছাঁচে ঢালিয়া দেখানো হয়, সেখানেও রোমান্সের চিত্ত-চমৎকার নাই, একটা সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধন বা সংস্কারবদ্ধ চিত্তের উল্লাসই আছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জীবন যাহার বিষয়, সেই সাহিত্য আর্টের মত নীতিহীন হইতে পারে না—যদি তাহা হইত, তবে সাহিত্যে জীবনের রূপসমগ্রতা প্রকাশ পাইত না ; কারণ, কোন একটি বৃন্তে সংহত ও মণ্ডলায়িত না হইলে রূপের রূপত্ব থাকে না—সেই রূপকে ধারণ করিবার কিছুই থাকে না, তাহার কোন significanco বা অর্থই থাকে না। এই গভীরতর নীতি কেমন করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই বলিব। প্রথমত, জীবনের আলেখ্য-রচনায়, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত মানবাত্মার কল্পনাই মিথ্যা ; কারণ, তাহা আর দেহ-দশাধীন থাকিবে না বলিয়াই তাহা অবাস্তব। সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির সংস্কার কোন-না-কোনরূপে মানুষের চেতনায় বদ্ধমূল থাকিবেই, কারণ, মূলে উহা প্রকৃতিগত। উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে জীবনের যে অংশ বাকি থাকে, তাহা কবিচিত্তের ধ্যানযোগ্যই নহে—রূপসৃষ্টির উপকরণই শূন্য হইয়া যায়। এই সকল নীতির তাড়নায় এবং তাহাদেরই সংঘর্ষে, জীবনের গভীরতর নীতি—সৃষ্টির নিয়তি-নিয়মের গূঢ় রহস্য—মানুষের কাহিনীতেই ধরা পড়ে ; এবং তাহারই আলোকে কবির সৃষ্টি সমগ্রতার অর্থে অর্থবান হইয়া উঠে। অতএব সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির আদর্শে যেমন জীবনের সত্যকার রূপসৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তেমনই,

ঐরূপ সংস্কার-বন্ধন স্বীকার না করিলে বাস্তব দেহমনকেই অস্বীকার করিতে হয়; এবং এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই যে দ্বন্দ্বাতীত পরমবস্তুর উপলব্ধি হয়, জীবনের সেই রহস্যময় নিয়তির রসরূপকে আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই জন্য আর্ট যে অর্থে নীতিহীন, সাহিত্য সে অর্থে নীতিহীন নয়। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে আর এক নীতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহা নীতিহীনতার নীতি—নীতির পরিবর্ত্তে দুর্নীতিরই একটা প্রবল সংস্কার। বাস্তবতা বা সম্ভাব্যতার দিক দিয়া ইহাই নাকি আরও সত্য। কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে এই দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই নীতিই ইহার তুলনায় আরও সত্য, আরও বাস্তব। এই দুর্নীতিও মনেরই একটা সংস্কার, এবং ইহা বিকৃত ও অস্বাভাবিক বলিয়া জীবনকে শুধুই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, কুৎসিত করিয়া দেখে। সম্ভাব্যতা বা probability-র যে অজুহাত ইহারা দেয়, সত্যকার কবিদৃষ্টির পক্ষে সে প্রশ্ন গুরুতর নয়; কারণ কবিচিত্তে এইরূপ কোন সংস্কার না থাকায়, তাহা জীবনের নিম্নতম ও ঊর্দ্ধতম সীমায় অবাধে গতায়াত করিতে পারে, এবং সেই পূর্ণদৃষ্টিতে সম্ভব-অসম্ভববোধের বাধা আর থাকে না; যাহা এমন করিয়া দেখিতে পাইতেছি, তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে কেন? সেই দৃষ্টি ইহাদের নাই বলিয়া ইহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহাদের রচনাও সাহিত্য নয়। ✓

আর একটি কথা বলিয়া আমি কবি-প্রেরণার পরিচয় শেষ করিব। আমরা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-রচনার কথা জানি, এই ট্র্যাজেডিতে জীবনকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেখা হয়—তাহাতে একটা নিদারুণ নিষ্ফলতার চিত্র ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কোন উৎকৃষ্ট কাব্যে জীবনকে একটা অভিশাপ রূপে প্রকটিত করা সম্ভব নয়—বৈরাগ্য বিরক্তি বা বিদ্বেষ কবিচিত্তের প্রেরণা হইতে পারে না, জীবনকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করাই কবি-কল্পনার সুস্থ প্রবৃত্তি। কোথাও বা, পরম জ্ঞানের যে পরম অনুভূতি, তাহারই এক স্নিগ্ধ-করুণ হাস্যজ্যোতি জীবনের উপরে বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়; এই humour বা উৎকৃষ্ট হাস্যরস কবিচিত্তের স্বাস্থ্য ও সুস্থিরতার প্রমাণ। কোথাও বা, বাহ্যত কবিচিত্তের এই স্থৈর্য্যলক্ষণ নাই—জীবনের অতল অকূলকে মন্থন করিয়া তাহার তলদেশে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা—অথবা সেই ঘূর্ণ্যমান প্রবাহের মধ্যবিন্দুকে ঘূর্ণাসমেত লক্ষ্য করার বাসনাই প্রবল বলিয়া বোধ হয়; তখন কাব্যে জীবনের অপর রস-রূপ—ট্র্যাজেডির উদ্ভব

হয়। কিন্তু উভয়ত্র সেই একই সমান, সুস্থ, normal কবিচিত্তের ক্রিয়াই আছে। সাহিত্যে আর এক প্রকার ট্র্যাজেডিও আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে জীবনের রস-রূপের পরিবর্ত্তে, মৃত্যুর অন্ধকারই ঘনাইয়া উঠে; আমাদের জীবাত্মার আর্ত্ত ক্রন্দনে আর সকল সুর ডুবিয়া যায়—নরনারীর অতিশয় একক পৃথক ব্যক্তি-চেতনা অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ট্র্যাজেডি নয়। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বতন্ত্র অনুভূতিই জীবনের বাস্তবকে আশ্রয় করিয়াছে—অনুভূতির প্রখরতা আছে, কল্পনার প্রসার নাই; ভাবাতিরেকের বিদ্রোহ আছে, প্রেমের প্রশান্তি নাই। ইহাতে সর্ব্বমানবহৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব নাই বলিয়া, বরং ব্যক্তির idiosyncrasy-ই অতিমাত্রায় প্রকট বলিয়া, এ কাব্য সর্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন চেতনার অনুমোদন লাভ করিবে না। Sentiment বা ভাবাতিরেক যতই বাস্তবানুগ, এবং কল্পনা যতই সংযত হউক, এ ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি একদেশদর্শী বলিয়া জীবনের সমগ্র রূপ তাঁহার আয়ত্ত নহে। মানবজীবনের উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছিলেন যে কবি, সেই শেক্‌স্পীয়ার সম্বন্ধে এক মনীষী লেখকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বড়ই সত্য—"He was the most living and least sentimental of authors"।

অতএব জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যাহা আবহমানকাল মানুষের অন্তর তৃপ্ত করিয়াছে—তাহার দিকে চাহিলে সাহিত্যের এই স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না। হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, শেক্‌স্পীয়ার হইতে আমাদের বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, বড় বড় কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে এই লক্ষণ যেখানে যতখানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার দ্বারাই ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কার কতখানি, তাহা নিরূপণ করা যাইবে। যাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, তাহাতে মানুষ শুধুই মনোবিলাসের আনন্দ পায় নাই, মানুষের চিত্ত গভীরভাবে আশ্বস্ত হইয়াছে। সেই আশ্বাস উদ্রেকের পন্থা বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ সাহিত্যে জগৎ ও জীবন এমন সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার উপকরণে রূপময় হইয়া উঠিয়াছে যে, সৃষ্টির রহস্যভার—বাস্তবের সকল সংশয়—বাস্তবের মধ্যেই সমাহিত হইয়া একটি অপরূপ অর্থের ব্যঞ্জনায় মানুষকে আশ্বস্ত করিয়াছে। এই আশ্বাস ও আনন্দের কারণ, মানুষ এই সাহিত্যের মধ্যে আপনাকেই সমস্ত মানবের সহিত একাত্মভাবে দেখিবার

শক্তি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই সকল কাব্যগ্রন্থে জীবনের রূপ এমন একটি সমগ্রতায় ফুটিয়া উঠে, যাহা বুদ্ধির আয়ত্ত নয়, কেবল অনুভবযোগ্য। বুদ্ধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষের গভীরতর চেতনায়, জীবনের এই রূপদর্শনে যে সংশয়মুক্তি ঘটে, তাহাতেই প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়; তাই অতিশয় মর্ম্মান্তিক কাহিনীও মধুর হইয়া উঠে; এবং সত্য ও ন্যায়ের যে আধ্যাত্মিক সংস্কার মানুষের জন্মগত—কিন্তু যাহা জীবনের বাস্তব খণ্ড অভিজ্ঞতায় বার বার পীড়িত হয়, তাহা এই সাহিত্যের মধ্যেই চরিতার্থ হইয়া থাকে। এই আশ্বাস যেখানে নাই, দেহ-আত্মার দ্বন্দ্ব যেখানে মিটে নাই, সেখানে কবিকল্পনাই অসম্পূর্ণ—কেবলমাত্র আর্টের দোহাই দিয়া সে রচনা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। সৃষ্টিরও যেমন শেষ নাই, তেমনই কবিচিত্ত ও মানবহৃদয় তাহার সমকালব্যাপী,—এই তিনকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্য। যুগবিশেষের ভাবধারায়, ব্যক্তিত্বের অভিমানে, বা সঙ্কীর্ণ রসিকমণ্ডলীর রুচি ও রসবোধের আদর্শে, সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয়। অতএব সাহিত্যের প্রকৃত বিচার সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের চিত্তে হইয়া থাকে; সেই বিচারের উপর বুদ্ধিপ্রয়োগ করাই পণ্ডিতের কাজ, এবং পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যে পরিমাণে সেই বিচারের অনুসরণ করিতে পারে, সেই পরিমাণেই তাহা যথার্থ, নতুবা তাহার কোন মূল্য নাই। এখানে কোন মতবাদ, কোন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অভিমানের স্থান নাই। কবিচিত্ত যেমন সর্ব্বমানবচিত্তের প্রতিনিধি, সাহিত্য-বিচারেও তেমনই সর্ব্বমানবচিত্তের প্রতিনিধিত্ব চাই। এজন্য কাল ও নিরন্তর-প্রবাহিত মানবচিত্তই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারালয় হইয়া আছে। এ দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্যের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে; কারণ এই সজ্ঞান ধারণার পূর্ব্বেই পাঠকের চিত্তে সে বিচার শেষ হইয়া যায়, জ্ঞানবিচারের পরোক্ষ প্রমাণের জন্য হৃদয়ের অপরোক্ষ অনুভূতি অপেক্ষা করিয়া থাকে না। "আগে দর্শনধারী, তারপর গুণ বিচারি"—এ বাক্য সাহিত্যের পক্ষেও অধিকতর সত্য। দর্শনে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সংবেদনায়, যাহা মুগ্ধ করে না, তাহার গুণবিচার অনাবশ্যক। এজন্য সাহিত্যের সমালোচনা অনেক স্থলেই "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং", অথবা অরসিকেরই রসোদ্গার। তথাপি কাব্যজিজ্ঞাসা ক্রমেই একটা বড় জিজ্ঞাসা হইয়া উঠিয়াছে—কবিকর্ম্মের বৈচিত্র্য ও কবিপ্রেরণার পরিধি যত বাড়িয়াছে, ততই এক দিকে যেমন রুচিভেদ, অপর

দিকে তেমনই আদর্শ-নির্ণয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল প্রাদুর্ভাবে, এমনই অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে যে, কাব্যের আদি প্রবৃত্তি ও আদর্শকে সকল অসাহিত্যিক মতবাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য একালে সৃষ্টি অপেক্ষা সমালোচনার প্রয়োজন বাড়িয়াছে। কিন্তু এ জিজ্ঞাসার শেষ নাই, যেটুকু নির্দ্দেশযোগ্য তাহারই বিচারণা আছে—মীমাংসার সঙ্কেত আছে, সিদ্ধান্ত নাই; তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইত। এতকাল ধরিয়া ইহার যে চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহাতে যে কয়টি পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে, আমি এক্ষণে তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

৫

সাহিত্যবিচারের জন্য বহুপূর্ব্বে যে শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আমাদের দেশে ও য়ুরোপে, উভয়ত্র—কতকগুলি সূত্র বা বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং সকলের মধ্য দিয়াই একটি তত্ত্ব ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন যুগে, য়ুরোপীয় ও ভারতীয় উভয় কাব্যশাস্ত্রে, কবিকর্ম্ম-সম্বন্ধে যে ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কাব্যের সহিত প্রাকৃত সৃষ্টির—কবিকল্পনার সহিত জীবনের—যেটুকু যোগ স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা হইতে আধুনিক কালের ধারণা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবির রচনা বাস্তবের প্রতিলিপি বা অনুকৃতি হিসাবেই একটি আর্ট, এবং সেই আর্টের সাফল্য নির্ভর করে কতকগুলি সুপরীক্ষিত রচনাপদ্ধতির উপরে—ইহাই যেমন অবশেষে য়ুরোপীয় কাব্য-বিচারের প্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই আমাদের দেশে কাব্যসাধনাকে জীবনের বা জগতের বাস্তব হইতে অনেক পরিমাণে মুক্তি দিলেও, রচনার বহিরঙ্গ-বিষয়ে আরও সূক্ষ্ম কলাকৌশলবিধির সৃষ্টি হইয়াছিল; শব্দার্থের প্রকৃতি ও সম্বন্ধ লইয়া দর্শন ও ব্যাকরণের মীমাংসা; শব্দযোজনা-রীতির দোষ-গুণ, সুন্দর রচনভঙ্গিমা, বা নানা শব্দালঙ্কারসৃষ্টির নিগূঢ় কৌশল—কাব্যের আত্মা, দেহ, অলঙ্কার প্রভৃতির সূক্ষ্ম ভেদনির্দ্দেশ—এ সকলই কাব্য-বিচারের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। ইহার ফলে আমাদের কাব্যশাস্ত্রে কল্পনা বা কবিদৃষ্টি এবং তাহারই বিষয়ীভূত যে জগৎ ও জীবন, তাহা গৌণ হইয়া উঠিল; এবং শেষে কাব্য

জীবনেরই রূপসৃষ্টি না হইয়া রসাত্মক বাক্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই শাস্ত্র অনুসারে সাহিত্য কোন অর্থে জীবনের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ নয়—জীবনেরই গভীরতর রূপের প্রতিচ্ছায়া নয়। কাব্যকে বাস্তব জীবনানুভূতির ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া, কতকগুলি conventions বা কৃত্রিম বিধি-বিধানের সংস্কার অনুসারে তাহার রচনা ও সম্ভোগ—একরূপ চিত্তচমৎকারের মানস-উত্থান সৃষ্টিই হইল কাব্যের আদর্শ। ইহাও সাহিত্যের আর্টবাদ; তাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র আর এক দিক দিয়া যে গভীর তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল, তাহা সাহিত্য-বিচারের অনুকূল নয়—তাহা নির্ব্বিশেষ রসতত্ত্ব, বা Aesthetics-এরই সগোত্র। এই রসতত্ত্ব যে সময় হইতে সাহিত্যের বিচারাসন অধিকার করিয়াছে, তখন হইতে সাহিত্যেরও অবনতি ঘটিয়াছে; সাহিত্যকে জীবন হইতে কৃত্রিম রসবিলাসের ক্ষেত্রে তুলিয়া ধরায় তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে; কবিচিত্তের তেমন স্ফূর্ত্তি আর নাই। সাহিত্যকে এক অতি অসাহিত্যিক শাসনের অধীন করিয়া তাহার আদর্শ বিচার করিবার চেষ্টা, আমাদের দেশে, এখনও বিংশ শতাব্দীতে বন্ধ হয় নাই; এখনও, যাহারা পণ্ডিতমাত্র, অর্থাৎ পুথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র সম্বল—যাহাদের কোন প্রতিভাই নাই, তাহারাই শাস্ত্রের চর্ব্বিতচর্ব্বণকে পুনরপি চর্ব্বণ করিয়া, সাহিত্যবিচারের নামে নিজেদেরই পাণ্ডিত্য-অভিমান চরিতার্থ করিতেছে।

কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যবিচারের ধারা একই খাতে বহিয়া শেষে রুদ্ধ হইয়া গেলেও, য়ুরোপের জীবন্ত সমাজে তাহা নব নব সৃষ্টির অনুসরণ করিয়া নানা স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। সেখানে প্রথম হইতেই জীবনের সহিত—বহিঃপ্রকৃতি ও প্রত্যক্ষ বাস্তবের সহিত—সাহিত্যের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল; সাহিত্যের সৃষ্টিতেও যেমন, সমালোচনাতেও তেমনই, সাহিত্যের আর্ট রসতত্ত্বের এমন শূন্যবাদে পৌঁছিতে পারে নাই। তারপর, একদা যখন সেই সমাজে জীবন ও জগতের রহস্য আরও বড় হইয়া দেখা দিল, এবং সাহিত্যে সেই রহস্য-বিকাশের অন্ত রহিল না, তখন কিছুকাল সাহিত্যবিচারের চেষ্টাও স্থগিত ছিল, কোন নব্য পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সাহিত্য যখন কোন জাতির জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠে, তখন পণ্ডিতী-বিচারের অবকাশ থাকে না; আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের প্রথম ও প্রকৃত বিচার মানুষের চিত্তেই হইয়া থাকে—কেতাবে পুথিতে নয়। মধ্যে আবার এই সৃষ্টি-প্রেরণা

মন্দীভূত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ও যুক্তিবাদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে, কবিকল্পনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়ঘোষণা হইল, এবং কবির দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া জীবনকে এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত করিল। এইকালেই কবিমানসের এই নূতন প্রবৃত্তি যে সকল প্রশ্নের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে নূতন করিয়া কবিপ্রতিভা ও বহিঃসৃষ্টি, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষ-তত্ত্ব—ভাবুকের ভাবনা অধিকার করিল; এ বিষয়ে কবিদের সাক্ষ্যও অল্প সহায়তা করিল না। কিন্তু এই সকল আলোচনায় কবিপ্রতিভার মাহাত্ম্য ও কাব্যসৃষ্টির রহস্যই সুগভীর হইয়া উঠিল, এবং কাব্যবিচার—মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-দর্শনের সীমান্তবর্ত্তী হইয়া উঠিল। অতঃপর এই শতাব্দীর শেষভাগে সৃষ্টির নিয়তিনিয়মের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই এক নূতন দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইল, এবং মানব-চেতনার সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকে একই তত্ত্বের অধীন করিয়া, Aesthetics বা রসতত্ত্বের নূতন ভিত্তি-স্থাপনা হইল। শোপেন্‌হাওয়ার হইতেই এই নূতন রসতত্ত্বের সূচনা হয়, এবং বেনেদেত্তো ক্রোচের মনীষায় ইহা স্ফুটতর ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধেও এই নূতন দার্শনিক চিন্তা এমন এক বিচারপদ্ধতির সন্ধান দিয়াছে—রূপ ও ভাবের এমন অভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, সাহিত্যের আর্টবাদই সৃষ্টিবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সৃষ্টি ভাগবতী সৃষ্টির মতই বিশেষের সৃষ্টি, প্রত্যেক রচনাই আপন বিশিষ্ট রূপে উজ্জ্বল। কবির অনুভূতি একটা প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলিয়াই রূপাত্মক; এবং সকল রূপই বিশেষের রূপ, রূপ কখনও নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। কবির নিজ চিত্তের প্রকৃতি অনুসারে এই বিশেষের বিশেষত্ব ঘটে; তাহাতে কাব্যসৃষ্টির তারতম্য হয় না; কারণ সকলই রূপ,—কাব্যে সেই রূপের যথাযথ প্রকাশই নিখুঁত সৃষ্টি। ইহাই সাহিত্যবিচারের আধুনিক ষ্টাইল-তত্ত্ব। ইহার অনুসরণে সাহিত্যের এই সৃষ্টিধর্ম্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে—এক দিকে যেমন ভাব ও রূপের অভেদ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং তাহাতে কবিদৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ জগৎ-চেতনাকে যুক্ত করা হইয়াছে, তেমনই, কবিকল্পনাকে স্বাতন্ত্র্যগৌরবও দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের কৃত্রিম বিধিবন্ধন যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ-প্রণালীও বর্জ্জিত হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক কবিকর্ম্মই স্বতন্ত্র বা অনন্যসদৃশ; এজন্য তুলনা দ্বারা, সাধারণ লক্ষণ

ধরিয়া, খাঁটি সাহিত্যিক সৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ চলে না। রচনাবিশেষের প্রেরণা সত্য ও সম্পূর্ণ কি না—রচনাগত রূপের মধ্যে তাহার প্রমাণ আছে; যদি রচনার সর্ব্ব অঙ্গে একটা বিশিষ্ট রূপ-সামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলেই সে রচনার প্রেরণা মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ নয়, রচনা সার্থক হইয়াছে। সাহিত্যসৃষ্টির এই ষ্টাইল-তত্ত্বও সাহিত্যের আর্টকে স্বীকার করে; কিন্তু good art ও great art-এর প্রভেদও স্বীকার করে; যাহা great art-এর পর্য্যায়ভুক্ত, সেই সাহিত্যে ষ্টাইলের রহস্য আরও গভীর; কারণ, তাহাতে জীবনের বিরাট ও বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে; তাহাতে কেবল অনবদ্য প্রকাশ-কৌশল নয়—যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারও বিশিষ্ট গৌরব চাই। আমিও সাহিত্যকে সাধারণ অর্থে আর্ট বলিতে কেন কুণ্ঠিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কোন একটা বিশেষের রূপ-সামঞ্জস্য হইলেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হইবে না, জীবনের একটা সমগ্র রূপের ছায়া—অঙ্গবিশেষের নয়, সমগ্র দেহের কান্তির মত—তাহাতে ফুটিয়া উঠা চাই, নতুবা তাহা আর্ট মাত্র, উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়। এই সৃষ্টিতত্ত্বকে আমি যে কায়া-কান্তিবাদ নাম দিয়াছি, তাহারও এই অর্থ করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে সাহিত্য-বিচারের আর এক পদ্ধতির কথা বলিব। এই পদ্ধতি অনুসারে সাহিত্যকে রচনার দিক হইতে বিচার করা হয় না; অর্থাৎ, রূপসৃষ্টি হিসাবে তাহা কতখানি সার্থক হইয়াছে—নিখিল কাব্যকলার আদর্শ তাহাতে কতখানি পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং জগৎ ও জীবনের কতখানি সুবলয়িত ও সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহী রূপে চিত্রিত হইয়াছে—সে বিচার করা হয় না; লেখকের দিক হইতে, তাঁহারই ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়া, রচনাবলীর মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা হয়। ইহাও সাহিত্যের সাহিত্যিক বিচার নয়, কারণ ইহাতে সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা কবিমানসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়,—কাব্যবিচারে জগৎ ও জীবনের রূপ বড় না হইয়া কবির মনোজগতই বড় হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যে ষ্টাইল-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, ইহা তাহারই আতিশয্যঘটিত পরিণাম। একালে এইরূপ পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এক্ষণে কবিকল্পনা অতিশয় অন্তর্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ হইয়াছে, এজন্য কবিচিত্ত এখন আর সর্ব্বমানব-চিত্তের প্রতিনিধি নহে; অতএব সার্ব্বজনীন জীবনানুভূতিই এখন আর কাব্যের আদর্শ নহে। এই ভাবতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা পূর্ব্বেও সবিস্তারে বলিয়াছি।

৬

সাহিত্য-বিচারের কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলিলাম। তথাপি বার বার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যের প্রকৃত বিচার এইরূপ কোন পদ্ধতিতেই চূড়ান্ত হইতে পারে না। যুগ পার হইয়া যুগান্তরে যে সাহিত্য বাঁচিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহা কালের ও চিরন্তন মানবচিত্তের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সকল পদ্ধতি তাহার সাক্ষ্য মান্য করিয়াই আপনার মান রক্ষা করিতে পারে। এই কষ্টিপাথরে কষিত হইয়া কত এককালের উৎকৃষ্ট রচনা দীপ্তি হারাইয়াছে; এবং, এত পদ্ধতি সত্ত্বেও একালের পণ্ডিতেরা কোনও আধুনিক শ্রেষ্ঠ কাব্যের অমরতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু তথাপি সাহিত্যের বিচার কোন কালে বন্ধ হইয়া থাকে না—বিচার চলিতেছে, কষ্টিপাথরে দাগ পড়িতেছে, সেই দাগই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে কালান্তরে। আস্তিক্য-বুদ্ধি, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, মানব-প্রীতি—ও সেই সঙ্গে ভাষার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একটি সহজাত সংস্কার, যে ব্যক্তি বা জাতি বা সমাজের মধ্যে দেখা দেয়, সেইখানেই যেমন সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা ঘটে, তেমনই সেই সৃষ্টির স্বাদ বুঝিবার মত লোকেরও অভাব হয় না। বিচার করিবার পূর্ব্বেই সাহিত্য বুঝিতে পারা চাই; যেখানে বিচার আগে—পরে সাহিত্যের রসাস্বাদন, সেখানে বিচারই নিষ্প্রয়োজন, অথবা তাহা সম্ভব নহে। এইজন্য আমি এইরূপ বিচারপদ্ধতিকে আমার এই আলোচনায় সর্ব্বাগ্রে স্থান দিই নাই। আমি, মুখ্যত, সাহিত্যের আদর্শ ও তাহার মূল প্রবৃত্তির কথাই বলিয়াছি; তাহাতে এইটুকুমাত্র ফললাভের আশা করি যে, আজিকার এই আদর্শবিপর্য্যয়ের দিনে যাঁহাদের সহজ সাহিত্যবোধ আছে, তাঁহাদেরও দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন না হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে। আমি সাহিত্যের যে খাঁটি আদর্শ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই আদর্শের উৎকৃষ্ট সাহিত্য এক একটা যুগেও অতি অল্পই সৃষ্টি হইয়া থাকে—শতাব্দীকালেও একাধিক মহাকবির উদয় হয় না। ইহা ভাবিয়া দেখিলে, আমাদের সাহিত্যের এই বর্ত্তমান অজস্রতার মূল্য কি, তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। সাহিত্যের নামে অক্ষমতার এই উন্মাদ-সুলভ অনাসৃষ্টি জাতির দুর্ব্বলতাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির যে লক্ষণ ও কবিচিত্তের যে পরিচয় বিস্তারিতভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি, ততদূর চিন্তা

না করিয়া অতি সহজেই এই সকল রচনার ব্যর্থতা প্রমাণ করা যায়। প্রথমত, এইজাতীয় সাহিত্যে জীবনের যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহা বাস্তবও নয়, আদর্শও নয়; তাহার বিরূপতাই সকল সুস্থ চিত্তকে আঘাত করে। এ যেন চিরপরিচিত বস্তুকে আরও পরিচিত না করিয়া অপরিচিত করিয়া তোলা—একের দুঃস্বপ্ন অপরের মস্তিষ্ক পীড়িত করিয়া তোলে। এই অতিশয় মিথ্যাকেও স্বীকার করিয়া লওয়াইবার জন্য, বিকৃত দৃষ্টিকে প্রতিভার লক্ষণ এবং বিসদৃশকে অনন্যসাধারণ বলিয়া দাবি করা হয়। আসলে, ইহা normal বা সুস্থ নয়, অতএব প্রতিভার প্রধান লক্ষণ ইহাতে নাই। আরও প্রমাণ—এই সকল রচনার ষ্টাইল নাই। অতএব রচনাহিসাবেই এগুলি বিকলাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ; ভাষাও যেমন অপরিচ্ছন্ন, ভাব তেমনই অপরিপুষ্ট—কল্পনার কোন কেন্দ্রগত ঐক্য নাই। ইংরেজীতে যাহাকে authentic বলে, ইহাদের অনুভূতি সেইরূপ authentic বা সমূলক নয়। বেশ বুঝিতে পারা যায়, যাহা বর্ণিত হইতেছে, তাহাতে প্রচুর ভান বা ফাঁকি আছে, প্রত্যক্ষ দর্শনের উপলব্ধি তাহাতে নাই; এজন্য ভাষার সকল প্রসাধনই কৃত্রিম। এই কৃত্রিমতার জন্যই এই সকল রচনার কোন ষ্টাইল নাই। যাহা দেখি নাই, অর্থাৎ যাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ অন্তরে হয় নাই, বাহিরেও তাহার প্রকাশ অসম্পূর্ণ হইবেই। দৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না; আবার সৃষ্টি যে নাই, তাহার প্রমাণ এই ষ্টাইলের অভাব। এজন্য পূর্ব্বে যে ষ্টাইল-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, তাহাকে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ বলা যাইতে পারে, এবং সাহিত্য-বিচারে এই তত্ত্বের বিশেষ উপযোগিতাও স্বীকার করিতে হয়। এই দৃষ্টিই কবিদৃষ্টি, এই শক্তিই প্রতিভা; যেখানে সেই দৃষ্টি ঘটিয়াছে, সেইখানেই রচনায় সৃষ্টির সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বস্তু—এই সকল রচনার দূষিত ভাষা; অথচ ভাষাই রচনার সর্ব্বস্ব। যিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেন, তাঁহার সবচেয়ে বড় সাধনা বা তপস্যা ভাষাকে লইয়া; সাহিত্য যদি একটা আর্ট হয়, তবে শুধু এই অর্থেই। তাই ভাষার বিষয়ে সাহিত্যশিল্পীর যত্ন ও ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু আধুনিক লেখকগণের ভাষা সম্বন্ধেই ভাবনা সব চেয়ে কম; তাহার কারণ, যে দৃষ্টির বলে সৃষ্টির প্রেরণা জাগে, সে দৃষ্টি ইহাদের নাই, এবং সেইজন্য কোন-কিছুকে সম্পূর্ণ রূপ দিবার প্রয়োজনই হয় না; যদি সে প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ভাষার

দুয়ারে সাধ্য-সাধনা করিতেই হইত। অতএব, সাধারণ পাঠকের পক্ষে সাহিত্য-বিচারের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়—রচনার ভাষাটিকে মাত্র পরীক্ষা করা, এবং সে বিষয়ে ইহাই মনে রাখা যে, mannerism বা কৃত্রিম ভঙ্গিমা—অথবা ব্যাকরণ, অভিধান ও ইডিয়মের বিরুদ্ধাচরণ—ইচ্ছাকৃত হইলেও, স্বতন্ত্র ষ্টাইলের লক্ষণ নয়; তাহা লেখকেরই অক্ষমতা ও অযোগ্যতার নিঃসংশয় প্রমাণ। মনে রাখিতে হইবে যে, যে-রচনাকে আমরা সাহিত্যিক সৃষ্টি বলি, তাহা কোন মত, তথ্য বা তত্ত্ব-প্রচারের বাহন নয়, তাহা তর্কবিতর্ক নয়—কাহিনী; তাই পরিস্ফুট, পরিচ্ছন্ন ও সুডৌল ভাষাই তাহার সর্ব্বস্ব। এই ভাষার দোষ থাকিলে বুঝিতে হইবে, লেখকের লেখক-জন্মই সত্য নহে, এবং রচনাও সাহিত্যপদবাচ্য নয়।

তথাপি, এই কালের এই কৃত্রিম রচনারাশির মধ্যে এমন রচনাও বিরল নয়, যাহাতে লেখকের শক্তির নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। যদিও ইহাদের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, অনুভূতি সংশয়ক্লিষ্ট, ও কল্পনা সঙ্কীর্ণ, তথাপি ইহারাই সাহিত্যসাধনার ধারাটিকে এখনও রক্ষা করিতেছেন। খাঁটি সৃষ্টিশক্তির পরিচয় না দিলেও, ইহারা জগৎ ও জীবনের অনেক অনাবিষ্কৃত তীর্থ এবং মানব-মনের অনেক নূতন ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সন্ধান দিয়াছেন। আমাদের দেশে এ যুগেও এমন যে দুই চারিজন লেখকের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি, তাঁহাদের রচনাতেই কবিচিত্ত ও সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া থাকি।

সর্ব্বশেষে আমি দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা শেষ করিব। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ ও মূল্য সম্বন্ধে এক বিখ্যাত ইংরেজ লেখিকার উক্তি এইরূপ—

"It seems that it would be wise for the writers of the present to renounce the hope of creating masterpieces. Their poems, plays, biographies, novels are not books but note-books, and time like a good schoolmaster, will take them in his hands, point to their blots and scrawls and erasions, and tear them across ; but he will not throw them into the waste-paper basket. He will keep them because other students will find them very useful. It is from the note-books of the present that the masterpieces of the future are made."

অপরটি আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের উক্তি, তিনিও বলেন—"কিন্তু সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড় নয়, সকল সমাজও বড় নয়, এবং এক একটা সময় আসে, যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোট করিয়া দেয়, তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে ছোট বড় হইয়া দেখা দেয়, এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটকেই বড় করিয়া তোলে—আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্দ্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব্ব, এবং টেনিসনের আসনে কিপ্লিঙের আবির্ভাব হয়।

"কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি ত সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোট তাহা গলিয়া ধূলায় পড়িয়া ধূলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিসই টেঁকে—যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ধন।

"এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের, একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যের হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি, তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।"

বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য

আজ আপনারা আমাকে যে সাহিত্যের প্রতিনিধিরূপে এই সভায় আহ্বান করিয়াছেন, সেই বাংলা-সাহিত্যের নামেই, আমি আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি; অতএব আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না। ব্যক্তিগতভাবে এই সম্মানের প্রতি আমার লোভ নাই, কারণ আমি ছোট হইলেও আমার আদর্শ বড়, আপনাদের এই মহতী সভায় সেই আদর্শই আমাকে উতলা করিয়াছে। আজ আমার বিশেষ করিয়া যে দুই মহাপুরুষকে মনে পড়িতেছে সেই দুইজন—বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর। বাংলা-সাহিত্যের সাধনমঞ্চে কত বড় প্রতিভা ও প্রেম, এবং কতখানি ভক্তি ও নিষ্ঠা একদিন বিরাজ করিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া আজ এই সাহিত্য-সভার নেতৃত্ব করিতে আমি লজ্জায় অবসন্ন হইতেছি। তাই অপরাধ-ভঞ্জনের জন্য আমি প্রথমেই সেই দুই মহাপুরুষের নাম কীর্তন করিব। বাংলা-সাহিত্যকে উজ্জীবিত করিতে ও বাঙালীকে প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ বীর্য্যবান সাহিত্যিক বাংলা দেশে আজিও জন্মগ্রহণ করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমাদের যে জাতীয় জাগরণ ঘটিয়াছিল—সেই সাহিত্যের জনক, ও সেই জাগরণী-মন্ত্রের উদ্গাতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সে প্রতিভার মূলে ছিল প্রেম—শুধুই কাব্যপ্রেরণা বা আত্মভাবসাধনা নয়; সে প্রেমও যত বড়, প্রতিভাও তত বড়—এমন আর হয় নাই। তাহার ফলে সেদিন যাহা হইয়াছিল, আর এখন যাহা হইতেছে—তুলনা করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্যেও কবি অপেক্ষা মানুষ বড়; প্রতিভার সঙ্গে প্রেম না থাকিলে সকল কীর্ত্তিই নিষ্ফল। অতি-বড় প্রতিভাও যদি প্রেমহীন হয়, তবে তাহা জাতি, তথা জাতীয় সাহিত্যের প্রাণধারা পুষ্ট করিতে পারে না। আজিকার এই সাহিত্য-সভায় আপনারা সেই জাতিগত-প্রাণ মহাকবি ও মহামনীষীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া এই অনুষ্ঠানকে কল্যাণ ও জয়যুক্ত করুন।

অপর যে মহাপুরুষকে আমি এইক্ষণে স্মরণ করিতেছি, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা বিরাট নহে, কিন্তু জ্ঞানের সহিত যে প্রেম ও শ্রদ্ধা তাঁহার সাহিত্য-

সেবাকে মহিমান্বিত করিয়াছিল তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। জাতির যাহা শ্রেষ্ঠ সাধনা ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক সম্পদ তাহাকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া প্রবর্ত্তিত ও সংবর্দ্ধিত দেখিবার কি আকুল আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল! জ্ঞান-সমুদ্রকে গণ্ডূষে শুষিয়া লইবার পিপাসা যেমন তাঁহার আয়ুক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল, তেমনই সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আত্মা মুহূর্ত্তের জন্যও আপন স্বাজাত্যবোধ ত্যাগ করে নাই—মাতৃভাষার প্রতি প্রেম যেন তাঁহার আত্মার আত্মমর্য্যাদার সহিত জড়িত হইয়া ছিল। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ—বাংলা-সাহিত্যের এই দুই মেরুচূড়াকে তিনি তাঁহার অন্তরের ঊষালোকে উদ্ভাসিত করিয়া স্তুতি-নিবেদন করিতেন; তিনি অতীত ভারতীয় সভ্যতাকেই বাঙালীর প্রতিভায় প্রতিভাত করিয়াছিলেন; পরা ও অপরা বিদ্যাকে, দর্শন ও বিজ্ঞানকে, বেদমাতা গায়ত্রী ও আধুনিক গীতিচ্ছন্দকে—তিনি এক ভাবের সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন, এবং বাংলা ভাষার ভাগীরথীকূলে সেই ভাবকল্পতরুটিকে রোপণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তিও এই দেশভক্তির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল—মাতৃভাষার অক্ষরমালায় তিনি আপন মোক্ষমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ, আজ আমি সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করিতেছি—যিনি জীবনে এমন একটি উৎকৃষ্ট চিন্তা করেন নাই, সাধনায় এমন কিছু লাভ করেন নাই যাহা তাঁহার মাতৃভাষাকে দান করিয়া যান নাই। তিনি ছিলেন বাণীর বীর-ভক্ত, তেমন ভক্ত এ পর্য্যন্ত আর দেখিলাম না—বঙ্গভারতীর চরণসরোজে এমন শুচি-শুভ্র ও প্রেমারুণ অভ্র-আবীর আর কেহ অর্পণ করেন নাই। আজিকার সভায় সেই মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণ করিয়া আমাদের প্রাণ সাহিত্য-প্রেমে পূর্ণ হউক।

এই দুই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য স্মরণে রাখিয়া, আমি আধুনিককালে বাঙালীর সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-সেবার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিব—সে কথা আপনাদের প্রীতিকর হইবে না, আমার পক্ষেও প্রীতিকর নহে। আমি একমাত্র সাহিত্য-নীতি ও সাহিত্যিক আদর্শের দিক দিয়াই চিন্তা করিয়াছি—রাজনীতি বা সামাজিকতার কূটনীতি তাহাতে নাই; সত্যকে প্রিয় করিবার, অসত্যকে শোভন করিবার প্রবৃত্তি তাহাতে নাই; বক্তৃতামঞ্চে ও সংবাদপত্রে কোনও তত্ত্ব বা তথ্যকে যে উপায়ে উপাদেয় করিয়া না তুলিলে গণ-দেবতার তুষ্টি সাধন হয়

না, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বুদ্ধি বিপরীত বলিয়া সে উপায় আমার জানা নাই; এ জন্য আপনারা আমার উক্তিগুলির উপাদেয়তা সম্বন্ধে আশান্বিত হইবেন না। আমি প্রথমেই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের মাতৃ-ভাষা ও সাহিত্যের যে অবস্থা দেখিতেছি তাহার কথাই বলিব।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্য ও সেই সাহিত্যের ভাষা অতি অল্পদিন হইল উচ্চশিক্ষার বাহন ও বিষয়রূপে কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে; এককালে ইহা কল্পনা করা যাইত না। কিন্তু এই মর্য্যাদার মূলে আন্তরিক শ্রদ্ধা বা প্রয়োজনীয়তা-বোধ নাই। আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এই সাহিত্য বাঙালী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে—উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হইতে দূরে স্বতন্ত্রভাবে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষের কল্পনায় হয়তো ছিল যে, একদিন মাতৃভাষাই আমাদের জ্ঞান-চর্চ্চার সহায় হইবে, এজন্য বাংলা-সাহিত্যের সেই শৈশবকালে তাঁহারা বাঙালী-সাধারণকে নব-বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য মাতৃ-ভাষার উদ্ধার ও সংস্কার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—ইহার প্রতি তাঁহাদের সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। আজ যখন বাংলা-সাহিত্য শৈশব—এমন কি বাল্যও অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাহার প্রতি সেই শ্রদ্ধারই অভাব দেখা যাইতেছে, কারণ শিক্ষাভিমানী বাঙালীর সে মনোভাব আর নাই। তখনকার শিক্ষার আদর্শ হয়তো এখনকার মত এত অত্যুন্নত ছিল না, কিন্তু শিক্ষিত-মন বলিয়া একটা পদার্থ তখন দুর্লভ হয় নাই, এবং শিক্ষার মূলে তখন কল্যাণবুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা ছিল। তখন শিক্ষিত অ-সাহিত্যিকের তুলনায় অশিক্ষিত সাহিত্যিকের সংখ্যা অল্পই ছিল—সাহিত্য অপেক্ষা সাহিত্যিকের গৌরব অধিক হইতে পারে নাই। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা স্থান পায় নাই বলিয়াই, বোধ হয়, বাঙালীর হৃদয়-আসনে তাহার একটু স্থান ছিল—এত মিথ্যা তখন গর্ব্ব ও দম্ভভরে বিদ্যার রাজপথে পদক্ষেপ করিয়া বেড়াইত না। আপনারা বোধ হয় আমার কথায় বিস্মিত হইতেছেন, হয়তো বা ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইতেছেন। যে যুগে বাঙালীর জাতীয়তা-বোধ এত প্রখর হইয়াছে, এবং সেই কারণে মাতৃভাষার প্রতি সম্মানের অবধি

নাই—শুধুই সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, উচ্চ শিক্ষার বাহন হইতে চলিয়াছে, যে যুগে ভাষা-সাহিত্যে পণ্যবীথিকা ভরিয়া উঠিতেছে, এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ তাহাদের গব্যরসপিপাসা সাহিত্যরসেই মিটাইতে পারিতেছে—সেই যুগে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, এ কেমন কথা? বন্ধুগণ, কথাটা বড়ই অন্যায়, তাহা আমিও স্বীকার করি; কিন্তু তথাপি সত্য বলিয়াই যে মনে হয়।

আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিয়া পুলকবিহ্বল হইয়া থাকেন,—এইরূপ অতি সহজ পুলকবিহ্বলতা বাঙালী-চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। আমার মনে আছে, একবার কোনও একটি অতি উচ্চপদস্থ বাঙালী সাহেব কোনও এক স্বজাতীয়-সভায় ধুতি-চাদর পরিয়া সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহার ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি যেমন ভারতবিশ্রুত ছিল, তেমনই সাহেবিয়ানার সিদ্ধসাধকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধুতি-চাদরের প্রতি এ-হেন ব্যক্তির অনুরাগ দর্শনে আমরা সে দিন এমনই পুলকবিহ্বল হইয়াছিলাম যে, মনে হইয়াছিল, এতদিনে বাঙ্গালীর কুল পবিত্র এবং বঙ্গজননী কৃতার্থা হইলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর মানসপুত্রগণ পরম গৌরবে অধিষ্ঠান করেন; সেখানে বাংলা ভাষাকে একটু লক্ষ্যস্থল দেওয়া যে কত-খানি দাক্ষিণ্যের কাজ তাহা আমরা বুঝি—এত বড় বাঙালী-সাহেবের পক্ষে ধুতি-চাদর পরিধান করা অপেক্ষা তাহা কম নয়, অতএব আমাদের পুলকিত হওয়া কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃভাষার সহিত বিশ্ব-বিদ্যার কোন-রূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-স্থাপনের আশা করাও অন্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও গবেষণা বা মৌলিক তত্ত্বসন্ধান সাধারণত মাতৃভাষায় হইতে পারে না, এমন কি দেশীয় সাহিত্য বা সংস্কৃতিমূলক গবেষণাও ইংরেজীতে হওয়াই প্রশস্ত। সম্প্রতি এ বিষয়ে নিয়ম-বন্ধন কিছু শিথিল করিলেও, যে সকল মৌলিক রচনা জাতির জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করে বলিয়া বৃত্তি বা উপাধি দ্বারা পুরস্কৃত হয়, তাহাদের প্রায় কেহই মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করে না—সে অভিপ্রায় থাকিলে অনুরূপ ব্যবস্থাও হইতে পারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাও প্রাসঙ্গিক ভাবে; অর্থাৎ তাহা মুখ্যত বাংলা-সাহিত্যের অনুশীলন নয়—'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার্স্'-এর একটা প্রসঙ্গ মাত্র। ইহার ফলে এই বিদ্যায় যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সাহিত্য-জ্ঞান তো

পরের কথা—বর্ণাশুদ্ধির বিষয়েও তাঁহাদের মহাজনসুলভ উদারতা বিস্ময়কর! পাঠপদ্ধতি ও পাঠ্য সম্বন্ধে যাঁহারা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাঁহাদের সকলকে বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে হয় না। যে-কোনও অপর বিদ্যায় পারদর্শী হইলেই হইল—এমন কি তিনি যদি কেবল গণিতবিদ্যা-বিশারদ হন তথাপি তাঁহার মত গ্রাহ্য হইবার যোগ্য! অনেক দিন পূর্ব্বে যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা যে এত সত্য তাহা তখন ভাবি নাই—রহস্য কথা বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কোনও এক 'মেসে'র বাসায় পাচকের অসুখ হওয়ায় বাবুরা বিপন্ন হইয়া পড়েন; তখন তাঁহাদেরই মধ্যে এক ব্রাহ্মণসন্তান সে দিনের মত সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইলে, একজন তাঁহার রন্ধন-বিদ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় তিনি নাকি বলিয়াছিলেন—উহা তাঁহার মাতৃভাষা, অতএব বিদ্যার কথা নিতান্তই অবান্তর। পাঠ্যনির্ব্বাচন বা সঙ্কলনেও যে বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ আশা করি নিষ্প্রয়োজন। স্কুলে যেমন বাংলার শিক্ষক অনুপস্থিত থাকিলে, যে কোনও শিক্ষক—এমন কি অবস্থা-বিশেষে কেরানিবাবুও কাজটা চালাইয়া দিলে নিতান্ত অসঙ্গত বা অশোভন হয় না, তেমনই বাংলার উচ্চতম অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইতে হইলে, বাংলা বিদ্যা যেমন-তেমন—অপর যে কোনও বিদ্যার অধিকারী হইলেই চলে। আপনারা ইহাও জানেন যে, বাংলা-সাহিত্যের অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য, এমন কি আধুনিক সাহিত্যের যেগুলি 'ক্লাসিক্‌স্', সেগুলি আর মুদ্রিত হয় না—কিন্তু তজ্জন্য কোনও অসুবিধা হয় না, কারণ বিষয়টির নাম "ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার্‌স্"—বাংলা-সাহিত্য তো নয়!

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা যদি মোটের উপরেও সত্য হয়, তবে বাংলা-সাহিত্যের সম্মানবৃদ্ধির জন্য পুলকিত হইবার কারণ নাই, বরং ইহাতে শঙ্কিত হইবার কারণ আছে। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে এরূপ সম্মান হিতকর না হইয়া অহিতকর হইয়া থাকে। এতদিন এ সাহিত্যের যেটুকু সত্যকার সাহিত্য, তাহাই সাহিত্যরসিকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে—এক্ষণে যাহা সাহিত্য-হিসাবে অপাংক্তেয় তাহাও এই কৃত্রিম সম্মানের জোরে শ্রদ্ধা দাবি করিবে, ফলে ক্রমশ সাহিত্যের আদর্শই অবনত হইবে। বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে ইহা যে কতখানি অনিষ্টকর আপনারা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বাংলা-সাহিত্যের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিমাণ, বাজারে সৎ-সাহিত্যের চাহিদা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থ আজকাল বড় কেহ পড়েন না, সাময়িক পত্রিকাগুলির পাত্রেই সকলে অবসর মত এক আধ চুমুক সাহিত্যরস পান করিয়া থাকেন। অতি কদর্য্য কাগজে ছাপা সুলভ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী না থাকিলে, বঙ্কিম, মধুসূদনকে বোধ হয় রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয়ের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইত; রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র ছাপা-কাগজ বোধ হয় একই কারণে অত্যুচ্চ 'ক্লাসিকে'র লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে; এবং 'চয়ন', 'সঞ্চয়ন', 'চয়নিকা' প্রভৃতির প্রসাদেই কবিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক-সমাজের গোচর হইয়া থাকে।

এ যুগ মুখ্যত পত্রিকার যুগ—ক্ষণজীবী সাহিত্যের যুগ। উপন্যাস ভিন্ন আর কোনও রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি কোনও প্রকাশকের নাই—বাঙালী পণ্ডিতগণ মাতৃভাষায় লিখিত আর কোনও ধরণের গ্রন্থ স্পর্শ করেন না। পত্রিকাগুলি সাধারণত অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক-যুবতীর দিবানিদ্রা আকর্ষণের ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সম্পাদকগণ সাধারণত সেইদিকেই লক্ষ্য রাখেন—এবং সম্পাদকের কোনরূপ পাণ্ডিত্য না থাকিলেই কাজটি আরও সহজ হয়। বাংলা মাসিকপত্রিকাগুলির জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায় দুইটি—ছবি ও গল্প। ছবি দুই প্রকার—চিত্র ও বিচিত্র: চিত্রগুলি দেহের, ও বিচিত্রগুলি ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোমের মানচিত্র। এইগুলি পাঠকমণ্ডলীর সাহিত্যিক অগ্নিমান্দ্য দূর করে—অতিশয় লঘু পথ্য, উল্টাইয়া গেলেই পাঠ শেষ হয়; গল্পগুলিও অতিশয় সুপাচ্য। এই সকল পত্রিকায় আর সকলই থাকে, থাকে না কেবল সাহিত্যের কথা। যে সকল আলোচনা ও গ্রন্থ-সমালোচনা কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহাও সম্পাদকের সাহিত্য-জ্ঞান ও দায়িত্ববোধের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এমনও দেখিয়াছি যে, গল্প বা প্রবন্ধের ভাষায় অতিশয় স্পষ্ট ইডিয়ম-দোষ রহিয়াছে, সম্পাদক সেটুকুও সম্পাদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই।

আমাদের দেশে এই সাময়িক পত্রিকাগুলিই সাহিত্যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—এই গণতন্ত্র, সাহিত্যকে যেমন, তেমনই সাহিত্যিককেও শ্রদ্ধা করে না। পত্রিকাগুলিতে আপনারা যে কোনও রামা-শ্যামার ফোটো প্রকাশিত

হইতে দেখিবেন; আর দেখিবেন কলার-টাই-ধারী অসংখ্য বালবৃদ্ধযুবার প্রতিকৃতি; কেহ বড় চাকুরিয়া, কেহ বা ডক্টরাচার্য্য নামধারী সাধারণশ্রেণীর পণ্ডিত, কেহ বা কোনও বড়লোকের বিলাতযাত্রী বংশধর; বিলাতপ্রত্যাগত হইলে অবশ্য অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন থাকে না, জাতির গৌরববৃদ্ধি করিতে এমন গুণ আর নাই! ইংরেজীতে যাহাকে snobbery বলে, এ যুগে সর্ব্বত্র তাহাই প্রকট; ইহা হইতে আমাদের পোলিটিক্যাল ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌-এর মূলমন্ত্র বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সাহিত্যিকের ছবি নাই। আজকাল অবশ্য সিনেমা-অভিনেত্রী ও নৃত্যকলাবিলাসিনীর প্রতিপত্তিই অধিক—ময়ূরবাহন সাহিত্যের কুমার-সম্প্রদায় এক্ষণে 'উষার উদয়সম অকুণ্ঠিতা' এই সকল উর্ব্বশীকেই তাঁহাদের ইষ্টদেবীরূপে বরণ করিয়াছেন।

এই যে সাহিত্য, যাহার গর্ব্ব আমরা করিয়া থাকি, তাহা যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা অর্থ যশ বা সম্মানের প্রত্যাশা করেন নাই—পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের কামনাও করেন নাই। যাঁহার যেমন শক্তি—তিনি নিঃস্বার্থভাবে সেই মত দান করিয়া গিয়াছেন, সেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দানেই আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দিন-দিন সেই প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে —সেই সাত্ত্বিক দান ও প্রেমের সেবা বিরল হইয়া উঠিতেছে। আজ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সাধনাহীন Dilettante ও চতুর Adventurer-এর দল বৃদ্ধি পাইতেছে; ফলে, আসল ও মেকী—সাধু ও ভণ্ডের পার্থক্যজ্ঞান লোপ পাইতেছে। অতি-আধুনিক সাহিত্য নামে যে নাসাকর্ণহীন জীব কিছুকাল পূর্ব্বে জন্মিয়া এখন তাহার জীবলীলা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে, তাহার জাতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন প্রায় সকল প্রবীণ ও প্রৌঢ় সাহিত্যিক—ব্যভিচার ও অতিচারের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ইঁহারা সাক্ষাতে বা পরোক্ষে তাহাকে লালন করিয়াছেন। আমি সাহিত্যের পক্ষ হইতে উক্ত জীবটির বিপক্ষে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কারণ, সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টিই হয়, নষ্ট হয় না; অতএব উহাতে সেই সাহিত্যের কোনও ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু এই অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে সাহিত্যের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা আরও হ্রাস হইয়াছে—সাহিত্যের নামে আপামরসাধারণের মনে একটা 'বোল হরিবোল'-ভাব ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। আমার মনে হয়,

আজকাল সাহিত্য-সম্মেলনে যে নানা শাখার সৃষ্টি করিতে হয়, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—উদ্যোক্তাগণের মনে আশঙ্কা জাগে যে, কেবল সাহিত্য বা সাহিত্যিক লইয়াই বড় একটা কিছু করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই বোধ হয়, আপনারাও দর্শন প্রভৃতির দ্বারা একটু সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া, পরে সাহিত্যিক 'রস'-চর্চ্চার আয়োজন করিয়া থাকেন। বাংলা মাসিকপত্রেও দেখিতে পাই, প্রথমেই একটা গুরুগম্ভীর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না হইলে পত্রিকার যেন মানরক্ষা হয় না। আপনাদের দোষ নাই; আজকাল সাহিত্যিক লইয়াই কোনও ভদ্র-সভা করা চলে না। কারণ, 'সাহিত্যিক' নামে যে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় অধুনা বিস্তারলাভ করিয়াছে, তাহারা সত্যই জাতিহীন। জাত হারাইলেই যেমন বোষ্টম হয়, তেমনই আজকাল স্বভাব হারাইলেই সাহিত্যিক হয়। সমাজে ইহাদিগকে দেখিলে অতিশয় সরল গ্রাম্য ব্যক্তিরাও চিনিতে পারে, এবং অবজ্ঞা ও বিস্ময়মিশ্রিত ভাবে বলিয়া উঠে—'উনি একজন সাহিত্যিক'। 'বাংলায় এম্-এ' বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে ভক্তির উদ্রেক হয়, 'সাহিত্যিক' বলিলে ভদ্রলোকমাত্রেরই মনে ঠিক তদ্রূপ ভাবই জাগে। ভেক ধারণ করিলেই যেমন ভিক্ষা মেলে, একটি ডুগডুগি বা একতারা লইয়া গৃহস্থের নিদ্রাভঙ্গ ও তণ্ডুলহরণ দুই কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়—গৃহস্থ তাড়াইয়াও দেয় না, বসিতেও বলে না—আধুনিক সাহিত্যিকগণের সামাজিক অবস্থা সেইরূপ। এ জন্য আমি আপনাদের সকলকেই ঐ জাতিভুক্ত করিতে চাহি নাই; আমার জাতি গিয়াছে বলিয়া আপনাদের সকলের জাতি মারিব কেন?

কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের এই দুরবস্থা আমার অভিজ্ঞতা-মত আমি আপনাদের গোচর করিয়াছি। সাহিত্যের প্রতি যে অশ্রদ্ধা, মাতৃভাষার প্রতি যে নিদারুণ ঔদাসীন্য, আমি তলে তলে বহিতে দেখিয়াছি, আজ আপনাদের কাছে বড় দুঃখে তাহার কাহিনী বিবৃত করিলাম। বর্ত্তমান যুগ হয়তো সাহিত্য-সৃষ্টির যুগ নয়, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যজ্ঞানও কি হারাইতে হইবে? ভাষাটাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে হইবে? বাঙালী আপনারা, আপনাদের অতি-আধুনিক বংশধরগণ যে ভাষায় 'সাহিত্য' লেখে, বাংলা দেশে সে ভাষা চলিত নয়, বাঙালী তাহা বোঝে না,—তাই বিলাতে পাঠাইয়া

সাহেবকে দিয়া পড়াইয়া তাহার সার্টিফিকেট জোগাড় করিতে হয়! ইহার জন্ত দায়ী কে? আপনারাই তো বিলাতী ডক্টরেট না পাইলে কাহাকেও সাহিত্যাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

অভিভাষণ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, তথাপি বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে আরও দুই একটি কথা আমার বলিবার আছে। কিছুকাল যাবৎ বাংলা ভাষা—সাহিত্যের ভাষা—লইয়া যে আন্দোলন সুরু হইয়া এক্ষণে কতকটা শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার অভিপ্রায় ছিল বাংলা ভাষাকে মোদকখণ্ডিকার মত কড়াপাকের বদলে নরম পাক দেওয়া—আদি-রসগোল্লাকে স্পঞ্জ-রসগোল্লায় পরিণত করা। ইহার ফল কিঞ্চিৎ ফলিয়াছে—নূতন ফ্যাশন মাত্রেই যতটা চল্‌তি হয়, এই ভাষার ফ্যাশনও ততটা চল্‌তি হইয়াছে। কারণ, এই ভাষাই বাংলা-সাহিত্যের নব-কার্ত্তিকদের উপযুক্ত বাহন—বেশ হাল্কা চালে চলে, আবার আবশ্যকমত একটু উড়িতেও পারে। প্রায় পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল ইনি বাংলা-সাহিত্যের বাগানে ও বাগানবাড়িতে বিচরণ করিতেছেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে বাতিল করিয়া স্বমহিমা ঘোষণা করিতেছেন। ইঁহার বিরুদ্ধে এককালে যে কোলাহল হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আর শোনা যায় না; তথাপি এতদিনে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আধুনিক সাহিত্যের যাঁহারা শক্তিশালী লেখক, যাঁহাদের যথার্থ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতিভা আছে, তাঁহারা এই ফ্যাশনের মোহ হইতে মুক্ত আছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়াছি, তাহা এই যে, আমাদের দেশের অতিবড় ধুরন্ধরগণেরও সাহিত্যজ্ঞান এত অল্প যে, সাহিত্যের ভাষা লইয়া তাঁহারা এমন একটা প্রমাদের বশীভূত হইয়াছেন! এখনও ভামহ-দণ্ডীর মোহ ঘুচিল না—সাহিত্যিক কোন্ ভাষায় সাহিত্য রচনা করিবেন, বাহির হইতে তাহার বিধান দেওয়া চলিবে; এবং সে বিধান দিবেন হ্যাটকোট-মণ্ডিত আধুনিক মম্মটভট্ট! এখনও ভাষার রীতিঘটিত কুসংস্কার ঘুচিল না—অথচ আর সর্ব্ববিধ কুসংস্কার ঘুচিয়াছে! বাংলা-সাহিত্য একটি আধুনিক সাহিত্য—সংস্কৃতপণ্ডিতগণ সেকথা না বুঝিতে পারেন, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য-বিচারের মূলসূত্রগুলিও আমাদের দিক্‌পালদিগের জানা নাই; সেই অজ্ঞতাজনিত অপূর্ব্ব মতবাদ অজ্ঞতর সমাজে প্রচার করিবার চেষ্টা দেখিয়া লজ্জায়

অধোবদন হইতে হয়। ভাষার কোনও রীতি সাহিত্যবিচারের বহির্ভূত, তাহা কথ্যই হউক, আর সাধুই হউক। প্রত্যেক শক্তিমান সাহিত্যিক আপন বিশিষ্ট ভাবপ্রেরণার বশে যে ভাষায় আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাই তাঁহার ষ্টাইল বা স্বকীয় যথাযথ ভঙ্গি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বা শরৎচন্দ্রের ভাষাকে যদি ব্যক্তিগত ষ্টাইল না বলিয়া কোনও একটা রীতি বলা সঙ্গত হইত, তবে অন্য কোনও রীতির কথা উঠিতে পারিত। যাহাকে কথ্যভাষা বলা হইয়া থাকে তাহা আদৌ কথ্য কি না সে তর্ক তুলিব না, কিন্তু সেই ভাষায় যদি কেহ সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তবে সেই ভাষা সেই রচনারই ভাষা, এবং যদি তাহা লেখকের বিশিষ্ট ভাবচিন্তার যথাযথ ভঙ্গি লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহা ষ্টাইল-গুণযুক্ত হইয়াছে। আবার ,যদি সেই ভাবচিন্তার উৎকর্ষ ও মৌলিকতা উচ্চাঙ্গের হয় তবে সেই ষ্টাইলও উচ্চ সাহিত্যিক ষ্টাইল বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব রচনাবিশেষ হইতে ভাষাকে পৃথক করিয়া কোনও একটা সাধারণ রীতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা যায় না, এবং তেমন রীতিকে সকল সাহিত্যিকের উপরে চাপাইয়া দেওয়া চলে না। যাহারা সাহিত্যের লেখকমাত্র, স্রষ্টা নয়—তাহারাই এইরূপ রীতির শরণাপন্ন হয়, এবং রীতিভেদ লইয়া কোলাহল করে। যাহারা এইরূপ কোনও রীতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং সাহিত্যিকের বুদ্ধিভেদ ঘটাইতে চেষ্টা করে, তাহারা যেমন মূর্খ, তেমনই আত্মম্ভরী। অন্য দেশের সাহিত্য-সমাজ যে কথা শুনিবামাত্র হাসিয়া উড়াইয়া দিত, আমাদের দেশে সেই কথা বলিয়া সাহিত্যের সমাজপতি হওয়া যায়!

দ্বিতীয় এক সমস্যা কিছুকাল যাবৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহার নাম বানান-সমস্যা। ইহা আদৌ একটি সমস্যা কি না সে বিষয়ে আমার মন এখনও সন্দেহাকুল আছে। সাহিত্যের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ যোগ নাই বটে, কিন্তু এই সংস্কার-চেষ্টা অন্যভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করিবে। আমি এই সংস্কারের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কিছু বলিব না—বিরুদ্ধেও নয়, স্বপক্ষেও নয়; কারণ, এক মুদ্রণসৌকর্য্য ছাড়া আমি ইহার কোনও অত্যাবশ্যকতা দেখিতেছি না। সংস্কারমাত্রেরই পক্ষে কোনও না কোনও যুক্তি আছে—আমি কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিব, "হঠাৎ বানান লইয়া এই মাথা-ব্যথা পড়িয়া গেল কেন?" ভাষা বা সাহিত্যের জন্য কোনও ভাবনা নাই; থাম-খিলান মেরামত

করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু কার্নিসের কারিগরিতে বৈঠকী পরামর্শের বেশি কিছু দরকার হয় না বলিয়াই সে পক্ষে এত উৎসাহ! যেখানে অন্নাভাবে দেহ শুকাইতেছে সেখানে সর্ব্বাগ্রে কেশবিন্যাসের পারিপাট্য-বিধান কি নিতান্তই মানস-কণ্ডূয়নের ফল নয়? কিম্বা, হয়তো সত্যকার প্রয়োজন কিছু আছে—পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি; তাই বানান-সংস্কার করিতে গিয়া যে সকল গুরুতর বাধা পদে পদে উপস্থিত হইয়াছে, সেগুলিকে কোনও রূপে—যেখানে যেমন সেখানে তেমন করিয়া—অতিক্রম করিতে হইয়াছে; কারণ, সেই প্রয়োজনটাই বড়—শব্দের ইতিহাস, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতির ভাবনা তেমন গুরুতর নহে; কাজের লোক যাহারা, তাহারা 'rough and ready'-কেই আদর্শ-নীতি বলিয়া মনে করে—বানান-সংস্কার যখন করিতেই হইবে, তখন সেই নীতি ছাড়া উপায় কি?

ভাষা ও সাহিত্যের এই যে অবস্থা, এবং তাহার যে কারণ আমি সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি—সে সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। কোনও জাতির ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা হইতেই তাহার স্বাস্থ্য ও আত্মিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা একালে আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির যতই বাহ্বাস্ফোট করি না কেন—বিভাষায় ব্যুৎপত্তি, ও সেই ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চায় আমাদের প্রতিভার যতই পরিচয় দিই না কেন—একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, মাতৃভাষা সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা, জাতিহিসাবে আমাদের অধঃপতনেরই সূচনা করিতেছে। গত শতাব্দীতে বাঙালী জাতির যে জাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রেও অবশ্য পাওয়া গিয়াছিল,—কিন্তু তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ এই যে, সেই প্রতিভা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত হইয়াছিল; জাতীয় জাগরণের এমন প্রমাণ আর নাই। আজ যে আমাদের ভাষা ক্রমশ ছন্নছাড়া হইয়া উঠিতেছে—ভাষার সম্বন্ধে কাহারও কোনও মমত্ববোধ নাই—তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে আমরা জাতিহিসাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

ইহার প্রতিবিধানকল্পে আমি কোনদিকে কোনরূপ সংস্কারের কথা তুলিব না—নূতন কোনও মতের সৃষ্টি করিব না। জাতীয়-শিক্ষার সমস্যা একটা দুরূহ ও বিরাট সমস্যা, সে সমস্যা আলোচনা করিবার যোগ্যতাও আমার নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র সাহিত্যিক মাত্র—আমি যাহা ভাবিয়াছি তাহাই বলিব। উপস্থিত,

বাঙালীকে তাহার সাহিত্যের সহিত পরিচিত ও ভাষার বিষয়ে সচেতন করিবার জন্য দুইটি কাজ করা যাইতে পারে, এবং সে কাজের ভার সাহিত্যিকমণ্ডলীকেই লইতে হইবে। বাংলা-সাহিত্যের দিক দিয়া কয়েকটি ভাল কাজ ইতিমধ্যে কিছু কিছু হইয়াছে, যথা—ভাষাতত্ত্বের আলোচনা, ভাষার ইতিহাস-রচনা, অভিধান-সঙ্কলন ও প্রাচীনসাহিত্য-উদ্ধার; যে সকল পণ্ডিত এইরূপ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যে দুইটি কাজ অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয় তাহা অন্যবিধ—দুইটিই প্রচারমূলক; একটি, বাংলা-সাহিত্যের ক্লাসিকস্‌গুলিকে উপাদেয় সংস্করণে সুসম্পাদিত করিয়া বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা; অপরটি, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস, ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ-রচনা। ইহার জন্য সাহিত্য-প্রচার-সমিতি বা ঐরূপ একটা পরিষদ্-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, ব্যবসায় বা অপর কোন্ নীতিকে ইহার ভিত্তি করিতে হইবে—সে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এরূপ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার কোন-না-কোন উপায় আছেই; সেই উপায় করিতে পারিলে কিছু ফললাভ সুনিশ্চিত। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সৎ-সাহিত্যের সহিত—খাঁটি বাংলার সহিত—পরিচয়ের অভাবেই বাঙালীর রুচি ও রসবোধ এত অবনতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ জাতিকে বিধাতা অন্তত একটা বস্তু দিয়াছেন—তাহা ভাবানুভূতির শক্তি; সত্য ও সুন্দরকে দেখিলে তাহার প্রাণ সাড়া দিবেই; এখনও এই একাকারকারী অন্ধকারের মধ্যে যেখানেই একটু আলো জ্বলে, সেইখানেই তাহার মুগ্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

আরও একটি বস্তুর অভাব দূর করিতে পারিলে ভাল হয়—একখানি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচনা. পত্রিকা। এই পত্রিকায় প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে, এবং বিশেষ করিয়া গ্রন্থ-সমালোচনা থাকিবে। গ্রন্থ-নির্ব্বাচনে ও সমালোচনা-পদ্ধতিতে এমন রসবোধ ও বিচার-শক্তির প্রমাণ থাকিবে যে, কালে ঐ পত্রিকা সকল সুস্থমনা সাহিত্য-রসিকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া সত্যকার বিচারকের আসন গ্রহণ করিবে। ইহার জন্যও একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিকমণ্ডলী সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

আপনাদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা আর অধিক ক্ষণ করিব না—আমার কথা

ফুরাইয়া আসিয়াছে। বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা হয়তো প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণকে শুনাইবার মত হয় নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রক্ত-সম্পর্কই বাংলার বাহিরেও বাঙালীদের সবচেয়ে বড় ও সত্যকার সম্পর্ক; সে রক্ত দূষিত হইলে ব্যাধি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে, সম্পর্ক সহজ থাকিবে না। তাই আপনাদের এই সম্মেলনে আমি সেই সাহিত্যের কথা ভাবিয়া যে বেদনা বোধ করিয়াছি—আপনাদের নিকটে অকপটে তাহা নিবেদন করিলাম। কিন্তু বাংলার বাহিরে আপনারা যে বৃহত্তর বঙ্গের সৃষ্টি করিতেছেন তাহাতে আপনারাই বাংলা-সাহিত্যকে একটি উদারতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। আপনাদের বাঙালী-প্রাণ ও বাঙালী-প্রতিভা ভারতের সর্ব্বঅঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া এমন একটি স্পন্দন অনুভব করিতে পারে, যাহাতে বাংলা ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির একটি পূর্ণতর রূপ প্রতিফলিত হয়। এ যুগের কবি ও মনীষী সেই রূপেরই ধ্যান করিয়াছেন—সেই ধ্যান-দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে বিশ্ববরেণ্য করিয়াছে, এবং বাংলা ভাষাকে একটি অনন্যসাধারণ গৌরব দান করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দেরও দেশ ছিল ভারতবর্ষ, তাঁহারও ভাবদৃষ্টি কেবল বাংলাদেশে নিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা সেই দৃষ্টি হারাইয়াছি—আমাদের সাহিত্য-প্রেরণা অতিমাত্রায় প্রাদেশিক হইয়া পড়িতেছে। আপনারা যদি প্রাদেশিকতামুক্ত হইয়া সেই ভারতবর্ষের আত্মাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে বাঙালীজাতির জন্য একটি নূতন গৌরব অর্জ্জন করিবেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের সেই আত্মাকে যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারই ভাষায় সেই অপূর্ব্ব চিত্র উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম—

"ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর-অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সে অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধপৃথিবী প্রভান্বিত হইয়াছে; সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয় তট পর্য্যন্ত, অর্দ্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশ্বভূতের জন্য আত্মোৎসর্গে মায়ের

ব্যথা হয় নাই। তিনি কখনও ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত পরকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং 'যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে'—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার সমীপে উপস্থিত হয়—সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন তিনি তাহাকে কোলে করিয়া স্নেহের সহিত স্তন্যদান করিয়াছেন। 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন।' কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই; যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশবিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। মা আমার স্বয়ং ইড়াদেবী—মনুকন্যা মানবীরূপে তিনি স্বয়ং মনুকর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সরস্বতীরূপে তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের কুলদেবতা, বাগ্‌দেবীরূপে তিনি ব্রহ্মবাদিনী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীরূপে আমাদের ধীশক্তির অদ্যাপি প্রচোদনা করিতেছেন। তিনিই বেদমাতা অদিতি, স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে জন্ম দিয়াছেন। সেই অদিতি হইতেই ভদ্র ও অমৃত-বন্ধু দেবগণ জন্মিয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর দক্ষকন্যা সতী—যিনি প্রজাপতির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার যজ্ঞোৎসৃষ্ট দেহ নারায়ণচক্রে শতখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া, কামরূপ হইতে হিঙ্গলাজ, জালন্ধর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতভূমির প্রত্যেক ধূলিকণায় চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের বা হিমবৎকন্যা পার্ব্বতীর দেহের পরমাণু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই ধূলি হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক ধান্যশীর্ষে ও যবশীর্ষে ইড়ারূপ পরমান্নের অমৃতরস সঞ্চিত আছে। বিষ্ণুরূপী যজ্ঞপুরুষে অর্পণের পর, পঞ্চ মহাযজ্ঞে যাবতীয় ভূতে অর্পণের পর, হবিঃশেষরূপে সেই ইড়াভোজনে আমরা অধিকারী রহিয়াছি। এই সর্ব্বদেবময়ী মহতী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্—
বন্দে মাতরম্।*

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

জাতির ভাষা ও জাতির সাহিত্য

বাংলা দেশের বর্ত্তমান সাহিত্যিক আবহাওয়া যত লক্ষ্য করিতেছি ততই একটা বিষয়ে বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সে কথাটি এই, বাংলা-সাহিত্য আর যাই হোক্, বাংলা আর হইতেছে না, তার সহজ অর্থ এই—আমরা জাতিভ্রষ্ট হইতেছি। ভাষা জাতির জাতীয় প্রাণের আধার, সেই আধার নষ্ট কিম্বা ভগ্ন হইলে সাহিত্যসৃষ্টি হইতে পারে কি না, এমন প্রশ্নও উত্থাপন করিতে হয়, আমাদের অবস্থা এতই শোচনীয়। আমি এই প্রশ্নেরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে, শব্দ ও অর্থের সহিত-ভাবই সাহিত্য। আধুনিক কাব্যশাস্ত্রের ভাষায় ইহাকে একটু প্রসারিত করিয়া বলা যাইতে পারে—ভাব ও ভাষায় যখন সম্পূর্ণ মিলন ঘটে তখনই সাহিত্যের জন্ম হয়। কাব্যের প্রধান লক্ষণ—Expression ; যাহাকে ইংরাজীতে আর্ট বলে—বাংলায় যাহাকে রসসৃষ্টি বলিতে পারি—তাহার স্বরূপ এই Expression—শব্দ ও অর্থের সহিত ভাব—ভাব ও ভাষার হরিহরত্ব—কালিদাস বলিয়াছেন "পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ"। আধুনিক রসপ্রমাতাগণের মতে—উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাষা ভাবেরই রূপ ; শব্দ অর্থের প্রতীক মাত্র নয়—তাহার দেহ, তাহার নিজ-রূপ। একদা এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছিলাম—প্রাণ ও দেহ পৃথক নয়, প্রাণ দেহের বাহিরে দেহকে অতিক্রম করিয়া, অথবা দেহের কোন অংশ বিশেষে বিরাজ করে না ; যতখানি দেহ ততখানিই প্রাণ। কথাটা তখন ভালো করিয়া বুঝি নাই, আজ কাব্যের বা সাহিত্যের ভাষা ও ভাবের অভেদ-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় সেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল—বলিতে ইচ্ছা হয়, ভাষাই ভাব ; উৎকৃষ্ট সাহিত্যে ভাষাকে অতিক্রম করিয়া, ভাষার বাহিরে ভাবের সন্ধান করিতে হয় না—শব্দের ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি-গুণ শব্দের মধ্যেই থাকে—অতিক্রম করিয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে, ভাব সুপ্রকাশিত হয় নাই—Expression চূড়ান্ত হয় নাই। এক কথায়, Expressionই সর্ব্বস্ব, ভাব যেখানে তাহার ভাষা-দেহ সম্পূর্ণ ভাবে পায় নাই—যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাও বাক্যে ধ্বনিত হয় নাই—সেখানে কাব্য-সৃষ্টি সার্থক হয় নাই।

কথাটা স্থূল ভাবেই বলিলাম, সূক্ষ্ম আলোচনার স্থান এ নহে; তথাপি সাহিত্যে ভাষার মূল্য সম্বন্ধে এ মত গ্রহণ করিতে কাহারো আপত্তি হইবে না।

সাহিত্যের আর এক সংজ্ঞা আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের দিনে ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ যোগসাধন বা গভীরতম ভাবের আদান-প্রদানের উপায় এবং সেতু যাহা, তাহাই সাহিত্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার দ্বারা মানুষ মানুষকে চিনিয়া লয়, যাহা যুগ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানুষে মানুষে আত্মপর ভেদ ঘুচাইয়া সমমানবতার স্থাপনা করে—যাহা মনুষ্যসমাজের সেই গভীর সহিত-ভাবের আধার, তাহাই সাহিত্য। এখানে স্পষ্টতঃ ভাষার কথা নাই—ভাবের কথাই আছে। ইহা হইতেই সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের নিরাকারত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সার্ব্বজনীন মানবতা বা মহামানব নামক এক কল্পমূর্ত্তির আরাধনায় সাহিত্যেও জাতিবর্ণহীন এক আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আদর্শ স্বীকার করিলে—যুক্তিশাস্ত্রমতে ভাষাও নির্ব্বিশেষ হইয়া উঠে—বিশ্বমানবের যেমন কোন জাতি নাই, বিশ্বসাহিত্য-রচনাতেও তেমনই ভাষার বিশিষ্টতা থাকিতে পারে না। এই কথাটাই আমি একটু বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সাহিত্য ভাষার অধীন, ভাষা একটা বিশেষ জাতির ভাষা। ভাষাকে বাদ দিয়া অর্থাৎ ভাবের বিশিষ্ট রূপটিকে বাদ দিয়া সাহিত্যরসের ধারণা করাও যায় না। দেশের জলবায়ু ও জাতির রক্তগত সংস্কার—কোনও জাতির যে ভাব-জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে, ভাষা তাহারই রূপ। যাহা নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার তাহাই যেমন সৃষ্টিতে বিশেষ হইয়া উঠে এবং বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্যই যেমন সৃষ্টির মূল অভিপ্রায়—তেমনই নিখিল মানবচেতনা বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহাই জাতি-বিশেষের বিশিষ্ট ভাব-গণ্ডী আশ্রয় করিয়া রূপ পরিগ্রহ করে—প্রত্যেক বিশিষ্ট ভাষা সেই ভাব-দেহ নির্ম্মাণের উপাদান। সৃষ্টির রহস্য সর্ব্বত্রই এক—একাকার বা নির্ব্বিশেষের আদর্শ সৃষ্টির আদর্শ নহে; Individual ও Particularই সেই বৈচিত্র্যের নিদান—যাহা সকল আর্ট বা রসসৃষ্টির রহস্য। শিশিরকণাতে সূর্য্য-বিম্বের মত এই Particular এর মধ্যেই Universal প্রতিফলিত হয়, তবেই রসের আস্বাদন হইয়া থাকে। অতএব রসের শ্রেষ্ঠ আধার যে সাহিত্য—তাহার মধ্যে সার্ব্বজনীন মানবতার প্রকাশ থাকিলেও তাহার একটা বিশিষ্ট রূপ অবশ্যম্ভাবী।

এই বিশিষ্ট রূপ জাতির জাতীয়তার মধ্যেই আছে—এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে জাতীয়তার গূঢ় গভীর লক্ষণ নিহিত থাকে জাতির ভাষায়। ভাষা ব্যক্তির নয়, জাতির; জাতির সমগ্র অতীত জীবন, পরম্পরাগত সাধনা ও সংস্কৃতি যে নিয়মে গড়িয়া উঠে, ভাষাতেও সেই নিয়ম বর্ত্তমান। কোনও জাতির ভাষা তাহার জাতি-ধর্ম্মেরই অন্তর্গত—প্রকৃতির মতই ইহা দুর্ল্লঙ্ঘ্য। ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষা জাতির স্বাস্থ্যরক্ষার মতই অত্যাবশ্যক। ভাষার শৈথিল্য শক্তিহীনতার লক্ষণ—ভাষায় অনাচার প্রবেশ করিলে জাতিধর্ম্মই লোপ পায়।

এই জন্যই সকল আত্ম-সচেতন উন্নতিকামী জাতিই ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষায় অতিশয় যত্নশীল। যাহাদের সত্যকার সাহিত্যজ্ঞান ও রসবোধ আছে তাহারা অতি সাবধানে তাহাদের ভাষাকে রক্ষা করিয়া থাকে। ভাষা সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের প্রমাণ এখানে আলোচনা করিব না। সাধারণ জ্ঞানেও একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভাষার সঙ্গে ভাবের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—ভাষা ভাবের উপর, এবং ভাব ভাষার উপর নির্ভর করে। ভাব যদি সত্য হয়, অর্থাৎ প্রাণের গভীর প্ররোচনায় তাহার উদ্ভব হয়—যদি তাহা খাঁটি আত্মপ্রকাশ-মূলক হয়, তবে জাতির অন্তর-প্রকৃতির প্রতিরূপ যে ভাষা, তাহাকেই সে আশ্রয় করিবে; সেই ভাষা যত সুস্থ, অবিকৃত ও শক্তিশালী হইবে, ততই তাহার আত্মপ্রকাশ সুন্দর ও যথাযথ হইবে। প্রাণ যদি ব্যাধিগ্রস্ত না হয় তবে তাহা নিজস্ব ভাষাতেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। জাতির সাধনা ও সংস্কৃতির অনুপাতে তাহার ভাষাও পুষ্ট হইয়া উঠে। পিতৃপিতামহগণের পুরুষপরম্পরাগত সাধনার ফল এই ভাষা; যে জাতির ভাষা তাহার আত্মপ্রকাশের পক্ষে যত সুনমনীয় ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সে জাতি তত পুণ্যবান।

সাহিত্যের জাতিধর্ম্ম ও তদনুষঙ্গী ভাষার মূল্য সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার স্থান নাই। এইবার আমাদের সাহিত্য ও ভাষার বর্ত্তমান প্রবৃত্তি ও অবস্থার সম্বন্ধে কিছু বলিব। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের অবস্থা যেমন অরাজক, তেমনি বাংলা ভাষাও স্বৈরাচারের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া বাদপ্রতিবাদ যথেষ্ট হইয়াছে—আমি নিজে এতদিন প্রায় একক ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতেছি, ব্যাধি আরও গভীর তলে মূল বিস্তার করিয়াছে। সাহিত্যের আদর্শ-বিচার এখন নিষ্প্রয়োজন। জাতির মেরু-মজ্জা

দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—অন্নকষ্ট, কুশিক্ষা এবং কুপথ্যের প্রাচুর্য্যে আমরা মনঃপ্রাণের স্বাস্থ্য হারাইয়াছি। শ্রুতি বলিয়াছেন 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'; রসোপলব্ধিও আত্মোপলব্ধির মত; এই ক্ষীণজীবী বুভুক্ষু লালসা-কাতর জাতি রসপিপাসু হইতে পারে না—বলহীনের পক্ষে আত্মার সাধনা দুষ্কর। সাহিত্যের নামে আজকাল যাহা চলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ সাহিত্য নহে—রসসৃষ্টি বা রসাস্বাদন তাহার অভিপ্রায় নহে। একথা আধুনিক লেখকগণ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন। ইহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন—দেহের ক্ষুধা নিবারণই পরম পুরুষার্থ, তাহাই জীবন-ধর্ম্ম, তাহাই সত্য ও বাস্তব। যাহারা আত্মায় বিশ্বাস করে না তাহারা রসের আদর্শ স্বীকার করিবে কেন? জীবন-যুদ্ধে যাহারা অপারগ—ভোগের বস্তু আহরণ করিবার শক্তি নাই, অথচ দীনদরিদ্র-সুলভ কাঙালপনা যাহাদের মজ্জাগত, দেহে শক্তি নাই অথচ দেহের ক্ষুধা আছে,—এমনই অভিশপ্ত প্রেত-দশা যাহাদের, সাহিত্যে তাহাদের কি কাজ? তাই সাহিত্যের নামে তাহারা যাহা করিতেছে তাহা ভোগের আনন্দ নহে, ব্যর্থ ভোগ-পিপাসার লালাস্রাব। এই হতভাগ্য জাতির আরও হতভাগ্য এই সকল সাহিত্যিকগণকে দেখিয়া দুঃখ হইবারই কথা—ইহাদের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক সমালোচনা নিতান্তই অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু তথাপি একটা বিষয় ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। ইহারা সাহিত্যের আদর্শ লইয়া যাহাই করুক—বাংলা ভাষাকে একেবারে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। সাহিত্য এক্ষণে মুমূর্ষু, কিন্তু তাই বলিয়া ভাষাকে গলা টিপিয়া মারিবার কারণ কি? কারণ অনেক, তাহার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ, সম্প্রতি বাংলা ভাষার আদর্শ সাহিত্যিক-রীতি বিচলিত হইয়াছে। কথ্য-ভাষা ও লেখ্য-ভাষা লইয়া যে বিবাদ, তাহারই ফলে ভাষায় প্রাদেশিক স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়াছে। এমন আর কোন সাহিত্যে হয় নাই। সাহিত্যের ভাষা স্বভাবের নিয়মেই শতাব্দী ধরিয়া একটা আদর্শে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে—আইনের সাহায্যেও নয়, সজ্ঞান চেষ্টা দ্বারাও নহে। বাংলা সাহিত্য বলিয়া একটা যে বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূল কারণ—এইরূপ একটা ভাষা ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাষায় কোনও বিশেষ প্রদেশের বাক্-ভঙ্গী যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তবে বুঝিতে

হইবে, সমগ্র জাতি রসসংবেদনার ক্ষেত্রে সেই বাক্-ভঙ্গীকে প্রাণের প্রেরণাবশে আশ্রয় করিয়াছে—সেই ভাষাই তাহার গভীরতম রসজীবনে সাড়া জাগাইয়াছে। এই ভাষা প্রাদেশিক হইয়াও যে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক নহে, তাহা যে রসিকমাত্রেরই আপন ভাষা, তাহার প্রমাণ—জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা সেই ভাষাকে আশ্রয় করিয়াছে। এ ঘটনা সর্ব্বত্রই ঘটিয়াছে; আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গুলি সেই সেই দেশের একটি কোন বিশেষ প্রাদেশিক বুলিকে আদর্শরূপে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তথাপি এ ভাষা কোন প্রদেশের সম্পূর্ণ কথ্য-ভাষা নহে—ইহার বিশেষ বিধি আছে, ইহার রূপ কথ্য-ভাষা হইতে উন্নত ও স্বতন্ত্র। সাধুভাষা বলিয়া এই সাহিত্যিক ভাষাকে গালি দিয়া ইহার বিরুদ্ধে একটি কৃত্রিমতর ভাষাকে উদ্যত করিয়া কিছুকাল ধরিয়া যে আন্দোলন চলিয়াছে, এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথিগণও সেই আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাকে যতখানি সফল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যের সেই পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ভাষার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। ইহারই ফলে, অতঃপর ভাষার কোনও আদর্শ বা বিধি আর টিকিতেছে না। যত বড় অজুহাতেই হোক, স্বেচ্ছাচার একবার প্রশ্রয় পাইলে তাহা সীমা অতিক্রম করিবেই।

কথ্য-রীতির উপরে অতি মাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে অতঃপর সাহিত্যের ভাষার জন্য কাহারও সাধনা করিতে হয় না, ব্যাকরণের অতি সাধারণ নিয়ম, এমন কি অর্থ-সঙ্গতির দিকেও, কাহারও দৃষ্টি নাই। কথ্য-রীতিই যে ইহার জন্য দায়ী আমি তাহা বলি না, কিন্তু ভাঙ্গন একবার ধরিলে তাহা এমনই করিয়া মূল পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তোলে। ভাষার অনুশীলন অভাবে রসবোধও সুমার্জ্জিত হইতে পারে না; যাহার যেমন স্বাভাবিক রুচি তাহাই অশিক্ষিত পটুত্বের অধিকার লইয়া ভাষাকে মলিন ও অপরিচ্ছন্ন করিয়া তোলে। বাংলা লিখিতে বসিয়া অবাধে ও নির্ব্বিবাদে ইংরেজী শব্দ—তাহাও অশুদ্ধ ব্যবহার করা—যেমন রীতি হইয়া উঠিতেছে, তেমনই এক ইডিয়ম-এর সঙ্গে অন্য প্রাদেশিক বুলি এমন ভাবে মিশ্রিত হইতেছে যে, অনেক সময়ে ভাষার কোন রীতিই লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তু সবচেয়ে লজ্জা ও আশঙ্কার কারণ—একদল লেখক যেন পণ করিয়াছেন, ভাষার ভিত্তি আমূল উৎপাটন করিয়া বাংলাকে ইংরেজী করিয়া তুলিবেন। তাঁহারা যে-ভাষায় লিখিয়া থাকেন তাহা মাতৃভাষামাত্র-সম্বল কোনও বাঙ্গালীর

পক্ষে বুঝিতে পারা দুষ্কর। এই ভাষা যাঁহারা তারিফ করিয়া পড়েন—তাঁহারা আর যাহাই হউন, বাঙ্গালী নহেন, এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ভাষার উপর অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে এইরূপ বিজাতীয় ভঙ্গির রচনায়।

এই সকল হইতে মনে হয় যে, আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনেও একটা সংস্কার জন্মিয়াছে যে—ভাষার কোন নিজ স্বরূপ নাই, কোন স্বধর্ম্ম নাই। যে যাহা লিখিবে তাহাই ভাষা—এবং তাহা যতই ব্যভিচারী হইবে ততই তাহা মৌলিক প্রতিভার নিদর্শন। ভাষার ব্যক্তিগত রীতি বা ষ্টাইল যাহাকে বলে সেই ষ্টাইল এবং তাহার অন্তর্গত মৌলিক সুষমা যে প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব, এবং তাহা যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে—এ কথা সকল সাহিত্যরসিকই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ষ্টাইল বাতুলের স্বেচ্ছাচার নয়, এবং প্রতিভার প্রমাণ যে-ষ্টাইল তাহার লক্ষণ এই যে—ভাষার জাতি রক্ষা করিয়াই ব্যক্তির একটি নিজস্ব ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠে; ইহাই লেখকের শক্তি, এই জন্য তাহা রসিকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। যেখানে ভাষার জাতি মারিয়া একপ্রকার ব্যক্তিত্বের ঘোষণা হইয়া থাকে, সেখানে দুইটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম—লেখকের ভাষা-জ্ঞানের অভাব, দ্বিতীয়—অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতা। এই দুয়েরই মূল কারণ এক—তাহা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও প্রাণের শক্তিহীনতা। কোনও দেশের সাময়িক সাহিত্যে লেখকবিশেষের বা কোন লেখক-গোষ্ঠীর এইরূপ দুষ্কৃতি অসম্ভব নয় বলিয়াই তাহা উপেক্ষার যোগ্য; কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সাহিত্যে এই অনাচার এতই সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে যে, সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আর চলিবে না।

ভাষার এই অবস্থা, বা লেখক সাধারণের এই প্রবৃত্তি ইহাই প্রমাণ করে যে, জাতির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কুৎসিত সাহিত্যরচনার প্রবৃত্তিও এতখানি আশঙ্কার বিষয় নহে। ভাব কুৎসিত হইলেই ভাষাও কুৎসিত হয়, অথবা কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিবার একটা কামনা ব্যাধির মতই প্রবল হইতে পারে; কিন্তু সেখানেও বুলি যদি খাঁটি জাতীয় বুলি হয়, তবে বুঝিতে হইবে, লেখকের নৈতিক অধঃপতন হইলেও তিনি জাতিভ্রষ্ট হন নাই। অতিশয় ক্ষোভের মধ্যে ইহাও একটা বড় কথা—কারণ, সেখানে বুঝিতে পারি, মানুষটা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু কোন জাতির সাহিত্যসাধনার ভাষাই যদি বিভাষা বা অপভাষা হইয়া উঠে, তবে সে জাতির অপমৃত্যু যে আসন্ন, এমন

আশঙ্কার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। জাতির সাহিত্য ও জাতির ভাষা এবং জাতীয় জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে আশা করি সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। জগৎঘটিত বা মনুষ্যঘটিত যত কিছু ব্যাপার সকলই যে পরিবর্ত্তনশীল, এবং সেই পরিবর্ত্তনই প্রগতি-মূলক একথা না হয় মানিলাম; একথাও মানি, সাহিত্যের আদর্শ বা ভাষার রীতি ঠিক একস্থানে অচল হইয়া থাকিতে পারেনা; এবং ইহাও মানি যে, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ব্যক্তিজীবনে যেমন—লেখক-জীবনেও তেমনই অত্যাবশ্যক, বরং তাহাই শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু আশা করি, কোন প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না যে, পরিবর্ত্তন বা প্রগতির অর্থ আমূল উৎসাদন—বিবর্ত্তনের অপর নাম অস্তিত্বলোপ। পুরাতন নূতন হয়, কিন্তু মরে না; আমি একালের মনুষ্য-জীব হইলেও আমার দেহটার বীজের বয়স কোটি বৎসর। যাহা নব নব যুগে নিত্য নূতনরূপে পল্লবিত ও কুসুমিত হইতেছে তাহারও প্রাণধারার একটা প্রাচীন নিয়তি আছে; যেদিন সেই নিয়তি-নিয়ম নিবৃত্ত হয় সেদিন হইতে সে আর বাঁচে না।

আমাদের ভাষার বয়স বোধ হয় এক হাজার বৎসরও নয়, সাহিত্যের বয়স আরও অল্প; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জন্মিয়াছে এবং বৃদ্ধি পাইতে সুরু করিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার একটা নিয়তি-নিয়ম আরব্ধ হইয়াছে। জীবনের তথা সৃষ্টির ইহাই নিয়ম। দেহ যেমন প্রাণমনের স্থির ভিত্তি—মনের আয়তন যতই পরিবর্ত্তিত হউক, দেহের কাঠামো বদলাইতে পারে না, মানুষের মন উড়িতে চাহিলেও তাহার স্কন্ধে পক্ষোদ্গম হয় না, সেই পুরাতন গঠনের দেহ লইয়াই তাহাকে উড়িতে হয়—তেমনই জাতির চিত্ত, কর্ষণের ফলে যতই প্রসারিত হউক, তাহার সাহিত্য-বুদ্ধি বা রসিকতা যতই উন্নত হউক এবং ভাবের অভিনবত্বের প্রয়োজনে প্রকাশভঙ্গি যতই পরিবর্ত্তিত হউক, ভাষার কাঠামো বা তাহার মূলপ্রকৃতি কখনও বিধ্বস্ত হইতে পারে না। ভাষা যদি বিকলাঙ্গ হয় তবে বুঝিতে হইবে লেখক অক্ষম, দুর্ব্বল ও বিদ্যাহীন; যদি তাহা বিভাষার অনুকারী হয় তবে বুঝিতে হইবে, লেখকের জাতিধর্ম্ম তথা প্রাণধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। যদি কোন দেশে শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যেও ভাষায় এই ব্যভিচার দোষ প্রশ্রয় পাইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বুঝিতে হইবে সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে ত্বরায় বিলুপ্ত হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, আমরা কি জাতি হিসাবে মরিতে প্রস্তুত? আমরা সত্যই বিশ্ববিহার করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছি? বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বমানব, বিশ্বভারতীর মত বড় বড় শূন্যগর্ভ বচনের মোহে আমরা কি আমাদের জাতি বিকাইব? ঐ সকল কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য ক্ষুদ্র-প্রেমের পরিবর্ত্তে মহাপ্রেমের জয়ঘোষণা করেন। ইঁহারা আকাশ-বিহারী ভাববিলাসী নয়—অতিক্ষুদ্র, স্বার্থপর, অসত্যসন্ধ ব্যক্তি। বিশ্বের নামে আত্মীয়কে তাঁহারা বর্জ্জন করেন, অপ্রেমকে উদারতার আবরণে ঢাকিয়া রাখেন, অক্ষমতাকে অতি উচ্চ আদর্শের দুরূহতায় মহিমান্বিত করেন। ইহা যে সত্য তাহার প্রমাণ, এযুগে এই অধঃপতিত সমাজে, এইরূপ মতবাদীর সংখ্যাই বেশী,—নিশ্চয়ই হঠাৎ আমরা এতগুলি মানুষ দেবতা হইয়া উঠি নাই! আজিকার সাহিত্যেও এইরূপ বিশ্বতান্ত্রিক যাঁহারা, তাঁহারা ভাষা সম্বন্ধেও এইরূপ উদার হইয়া উঠিয়াছেন; ভাষার কোন স্বকীয় রীতির সংকীর্ণতা ইঁহারা মানেন না—বিশ্বসাহিত্যের মত একপ্রকার বিশ্বভাষা এই বাংলাভাষার ভিতর দিয়া আবির্ভূত হউক, ইহাই তাঁহাদের প্রকাশ্য যুক্তি। কিন্তু আসল কথা তাহা নয়; ইহারা নিজেদের বুলি ভুলিয়াছে—ইহারা আত্মভ্রষ্ট, তাই মাতৃভাষা বিভাষা অপেক্ষাও অপরিচিত। জাতির প্রাণের সহিত ইহাদের প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না; ভাবনায় কামনায়, আশা ও বিশ্বাসে, সুখে ও দুঃখে ইহারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, অতিশয় একা—ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব, Individualist। তাই ইহারা সামাজিক ও জাতীয় জীবনের অন্যতম আধার যে ভাষা, তাহার ভঙ্গী ভুলিয়া গিয়াছে।

আজিকার প্রসঙ্গে আমার কথা আর বেশী নাই। আজ আমি যে বিষয়টির আলোচনা করিলাম সাহিত্যের দিক দিয়া তাহা গুরুতর বটে, তথাপি শিক্ষালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, জাতির ভবিষ্যৎ যাহারা—সেই বালকবৃন্দের কথা স্মরণ করিয়া আমি এই সমস্যাটিকেই উপস্থাপিত করিলাম, সাহিত্যরসের পরিবর্ত্তে এই অপেক্ষাকৃত কটুরস পরিবেশন করিলাম। যাঁহারা শিক্ষাদানের ভার লইয়াছেন—বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষার গোড়ার দিকটি লইয়া আছেন, তাঁহারাই এই আশঙ্কা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। এই শিক্ষা যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়, বাঙ্গালীর ছেলে যদি ভাল করিয়া বাংলা শিখিবার এবং মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তবেই এই দারুণ সঙ্কট হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

বাল্য হইতেই রীতিমত মাতৃভাষার চর্চ্চার অভাবে যাহারা প্রায় নিরক্ষর থাকিয়া যায় তাহারাই পরে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া ভাষার মুণ্ডপাত করিয়া থাকে। নিরক্ষর থাকিয়া যায় বলিয়াছি, তাহার কারণ আছে। প্রথমতঃ, অতি কদর্য্য ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক গলাধঃকরণ করিতে তাহারা বাধ্য হয়—এই সকল পুস্তকে সাহিত্যরস ত থাকেই না, ভাষাও এমনই যে, তাহাতে উন্মুখ চিত্তও বিমুখ হইয়া উঠে। নানা আদর্শের নানা রীতির রচনা পড়িয়া তাহারা ভাষা সম্বন্ধে দিশাহারা হয়, এবং ভ্রমপরিপূর্ণ অশুদ্ধ শব্দযোজনা ও ইডিয়মের অপব্যবহার দেখিয়া, ভাষার আদর্শ-বিষয়ে শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারে না; এজন্য নিজেরাও স্বৈরাচারী হয়। ভাষা-শিক্ষার মূলে এই অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই—ভাষার অশুদ্ধি এবং রচনার উৎকৃষ্ট রীতির প্রতি প্রথম হইতেই এই অযত্ন ও অসাবধানতায় অভ্যস্ত হয় বলিয়াই—শেষে এমন সংস্কার দাঁড়াইয়া যায় যে—বাংলা ভাষার কোন অভিজাত্য নাই, ইহার মূল প্রকৃতি বলিয়া কিছু নাই; ইহাকে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করা যাইতে পারে; লেখক হইতে হইলে ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্র, অভিধান-নির্দ্দিষ্ট অর্থ, অথবা কোন রীতির সম্মান রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। আজ সর্ব্বত্র ইহাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহারা এই ভাষা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের প্রতি আমার কয়েকটি নিবেদন আছে। বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতি যাহাতে বাংলাদেশের সর্ব্বত্র জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর মধ্যে জাগ্রত ও অটুট থাকে—সেই মহৎ লক্ষ্যের অনুপ্রেরণায় তাঁহারা যেন বাংলাভাষার বিশুদ্ধ আদর্শটিকে কখনও কলুষিত হইতে না দেন; কারণ, আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থায় এই ভাষাই জাতীয়তার প্রধান বন্ধন—আর কিছুই আমাদের নাই।

এই ভাষাই এ যুগে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর তপস্যালব্ধ একমাত্র পুণ্যফল। ইহারই প্রসাদে আমরা নবজীবন লাভ করিয়াছি, জগতের জাতিসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ মর্য্যাদার আসন পাইয়াছি। এই ভাষাই আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তীর্ণ করিয়াছে, ইহারই অপূর্ব্ব শক্তিবলে আমরা আমাদের আত্মার পরিচয় পাইয়াছি। এই ভাষার প্রথম সঙ্গীত-ধ্বনি জয়দেবের কোমলকান্ত সংস্কৃত পদাবলীর মধ্যে উঁকি দিয়াছিল; এই ভাষাই মৈথিলী ও মাগধীর মিশ্রণজাত গৌড়ী-ব্রজবুলির মধ্যে লুকাচুরি খেলিয়াছিল; ইহাই চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের

কবিতায় প্রেমের অরূপ-মাধুরীকে শব্দ-শরীর ধারণ করাইয়াছিল; মুকুন্দরাম কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের লেখনী-মুখে ইহাই বাঙ্গালীর ঘরসংসারের নিত্যপরিচিত ভাব-জগতের বাণী বহন করিয়াছিল; ইহাই ভারতচন্দ্রের হাতে রাজ-দরবারের মাল্যচন্দনে ভূষিত হইয়া অভিনব সারস্বত-শ্রী ধারণ করিয়াছিল; বাংলার শাক্তসাধক, সুফী-মজ্‌যুব, ও বৈষ্ণব বাউল-কীর্ত্তনীয়ার মর্ম্মান্ত অনুভূতির মূর্চ্ছনা-যুক্ত হইয়া এই ভাষায় যে গীতাবলী উৎসারিত হইয়াছে, আজও এই বিংশ-শতাব্দীর বিজাতীয় অথবা বিশ্বমানবীয় কালচারের যুগে, বাঙ্গালী তাহাতে জন্মান্তর-স্মৃতির মত অসহ্য-পুলকে শিহরিয়া উঠে; এই ভাষার নিগূঢ় প্রকৃতি ও প্রচ্ছন্ন শক্তির আশ্বাসে বঙ্কিম-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভা সঞ্জীবিত হইয়াছে—ইহারই কল্যাণে আমরা ভারতীয় অপর সকল জাতির উপরে সাহিত্যিক অধিরাজত্ব লাভ করিয়াছি।

সেই ভাষার স্বরূপ-পরিচয় উদ্ধার করিতে হইবে, বিদ্যার্থী বাঙ্গালী সন্তানকে তাহার সেই পৈতৃক সম্পদের অধিকারী করিতে হইবে—ভাষার অতি-আধুনিক অভিনবত্ব হইতে তাহার চিত্তকে সংযত করিয়া, শিক্ষার প্রথম অবস্থায় তাহাকে ভাষার এই মূল সুরটি ধরাইয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমানে একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, বাংলাভাষার বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ইডিয়ম নির্দ্ধারণ করিবার মত একখানিও পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ এ পর্য্যন্ত প্রণীত হয় নাই। এই বিশাল দেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ইডিয়ম-এর গোলযোগ হইতে ভাষার সেই বিশুদ্ধ রীতিটিকে উদ্ধার করিয়া লইবার কোনও উপায় এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এজন্য যতদূর সম্ভব—যেগুলিকে বাংলা-সাহিত্যের ক্লাসিক বলা যাইতে পারে—কি প্রাচীন কি আধুনিক—সেই সকল গ্রন্থ হইতে প্রচুর পরিমাণে পাঠ্য নির্দ্দেশ করিয়া ভাষার রীতি হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। আমার মনে হয়, বিদ্যালয়ে বাংলাশিক্ষার সংস্কার এই প্রণালীতে কতকটা স্বাধীন ভাবেই করিয়া লইতে হইবে।

আর একটি কথা আমি সসঙ্কোচে নিবেদন করিব, আশা করি কেহ আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ করিবেন না। গত ৬।৭ বৎসর আমি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছি, তাহাতে একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা এই; অধিকাংশ ছাত্রেরই পাঠ বা আবৃত্তির অভ্যাস নাই—উচ্চারণ-দোষে সাহিত্যের রস তাহারা উপলব্ধি করিতে

পারে না। ইহার কারণ, বাল্যশিক্ষার কালে শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুস্পষ্ট পাঠ বা আবৃত্তির দিকে শিক্ষক বা অভিভাবক কাহারও দৃষ্টি থাকে না। ইহা একটি গুরুতর ত্রুটি বলিয়া মনে করি। ভাষার আসল রূপ তাহার ধ্বনি; এই ধ্বনির সৌন্দর্য্য যদি কানে না ধরা দেয় তবে প্রাণের রসে ভাষা রসান্বিত হইতে পারে না—এই জন্যই বোধ হয়, কোন সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচক বলিয়াছিলেন—"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ঋষিদের যে অতিসাবধানতা ছিল তাহাও এই কারণে; মন্ত্র ঠিক মত উচ্চারিত না হইলে মন্ত্রের দেবতা অভীষ্ট বরদান করেন না—একথা সত্য; ভাষার উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হইলে বাণী-দেবতা সেবকের প্রাণে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে রসাস্বাদনের অধিকার দেন না। ভাষার এই দিকটিতেও যথাসাধ্য মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। উচ্চারণ-দোষ দূর করিবার চেষ্টা প্রথম হইতে করা চাই—পাঠ ও আবৃত্তি আরও অধিক পরিমাণে নিত্যকর্ম্মের তালিকাভুক্ত করিতে হয়। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে—উহা যেন সখের কাজ না হয়। আমার বিশেষ অনুরোধ, ভাষাশিক্ষার অতিপ্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে বিদ্যালয়ে যেন এই ব্যবস্থা থাকে। ভাষার ধ্বনিই ভাষার প্রাণ—শিক্ষার্থীর প্রাণের সঙ্গে সেই প্রাণের যোগ না হইলে ভাষার ভিতর দিয়া তাহার আত্মস্ফূর্ত্তি ঘটিবে না।

আমার যথাজ্ঞান ও যথাবিশ্বাস বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা ও আলোচনা করিলাম; বিষয়টির আলোচনায় আমি যে মতবাদ আশ্রয় করিয়াছি তাহার কোন কোন অংশে মতভেদ থাকিতে পারে—তাহা লইয়া বিতর্ক করিবার অবকাশ নাই। বিতর্কের স্থলগুলি আমি জানি, তথাপি আশা করি, আপনারা আমার আদর্শ ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভুল বুঝিবেন না। আমার এই অভিভাষণ আধুনিক সাহিত্য-রথিগণের উদ্দেশ্যে নয়—সাহিত্য-সৃষ্টির পরিবর্ত্তে যাঁহারা ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি করিবার ভার লইয়াছেন সেই শিক্ষক-ব্রতধারী সুধী ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া আমি আমার এই বক্তব্য নিবেদন করিলাম।*

* নেত্রকোণা চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের সারস্বত-উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হইয়াছে। এ ধরণের গ্রন্থ-প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতন যুগের সূচনা করিতেছে; কেন তাহাই বলিব। যাহা বিগত হইয়াছে তাহার প্রতি বাঙ্গালীর মমতাও প্রায় বিগত হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমানের উপাসক, আমাদের ঐতিহাসিক চেতনা নাই বলিলেই হয়। সম্ভবতঃ পলিমাটির দেশ বলিয়াই আমাদের জীবনের কোন ভাগে কোনও বনিয়াদ পাকা হইতে পারে না—মাটির উপরেও যেমন কোন চিহ্ন থাকে না, মনের ভিতরেও তেমনই কোনও স্মৃতি পুষিয়া রাখি না। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই আমরা জোর করিয়া আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন হইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই, সেই চেতনার যাহা প্রধান সহায়—সেই অতীতের স্মৃতি, পিতৃগণের পরিচয় উদ্ধার করিতে পারি নাই; সে রুচি নাই, সময় নাই। আমরা কালের ধ্যান করি, ভূত-ভবিষ্যতের হিসাব আমরা করি না—ভবিষ্যতের উৎসাহ নাই, বর্ত্তমানের উত্তেজনা আছে। তাই বেশী দিন নয়,—গত শতাব্দীর যে ইতিহাস যাহা এখনও এ যুগ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং যে যুগ গত সহস্রবৎসরের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে—সেই যুগের যাহা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—সেই সাহিত্যও আমরা ভুলিতে চাহিয়াছি। এক একজন বিরাট পুরুষরূপে, মনীষায় ও প্রতিভায়, যাঁহারা এ জাতির নূতন জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বাণী বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা আমরা করি নাই, সে সাহিত্য ক্রমেই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

এতদিন পরে আজ আমরা সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার যে পরিচয় পাইতেছি তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনই আশাপ্রদ। প্রাচীন-সাহিত্যের সম্পর্কে কিছু কাজ বহুপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে-সাহিত্য জীবন্ত—যাহার রসধারায় পুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই, যাহাকে এখনও ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশই হয় নাই, এবং না বুঝিয়া লইলে বর্ত্তমানের সংশয় ঘুচিবে না,—সে

গুলিকে এ পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর ধূলিস্তর হইতে কেহ উদ্ধার করেন নাই ; বিকৃত, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাহাদের পরিচয় একরূপ অজ্ঞাত হইয়াই আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থাবলী সেই অভাব মোচনের প্রথম উদ্যম—ঠিক এইভাবে এমন কাজ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করে নাই ; তাই বলিয়াছি, ইহা এক নূতন যুগের সূচনা করিতেছে।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এই প্রথম খণ্ডে বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদি-রূপটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সাহিত্যিক মূর্ত্তি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার চিরপরিচিত প্রতিকৃতিকেও অ-পূর্ব্বপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি যে কেবল বাংলা গদ্যের আবিষ্কর্ত্তা নহেন, পরন্তু তাঁহার রচনা যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সর্ব্বগুণান্বিত ক্লাসিক—'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার আত্ম-জীবনচরিত পর্য্যন্ত পাঠ করিলে প্রতি-পত্রে ও প্রতি-ছত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার সহিত পরিচয় নাই এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী কে আছে? তথাপি এই গ্রন্থের পাতাগুলি একটির পর একটি উল্টাইয়া পড়িবার কালে যে রস আস্বাদন করিলাম, ইহার ভাষায় যে একটি মৃদু-মধুর কস্তুরী-সৌরভ অনুভব করিলাম, তাহার কারণ কি? ইহার বাক্যগুলিতে এমন একটি নির্ম্মল প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধ-গম্ভীর মাধুর্য্য আছে, যাহা বাংলা গদ্যের আজিকার এই বিচিত্র-বিকাশের পরেও একটি বিশিষ্ট ও দুর্ল্লভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। মনে হইল, এতদিন পরে একটি বস্তুর প্রকৃত পরিচয় পাইলাম, যে বস্তু—বাংলা গদ্যসাহিত্যের—রোমাণ্টিক নয়, খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল রীতি ; এ বস্তু যদি না থাকিত, তবে বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অভাব থাকিয়া যাইত। গ্রন্থাবলীর সাহায্যে এক সঙ্গে এমন করিয়া সাজাইয়া না দিলে কোন লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভার সম্যক পরিচয় সম্ভবপর হয় না।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এই 'সাহিত্য'-ভাগ নূতন করিয়া পড়িতে হইবে—কেমন করিয়া বাংলা গদ্যের জন্ম হইয়াছিল তাহাই আজ এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহা ছিল না তাহা সৃষ্টি করা যে কত বড় প্রতিভার কাজ—'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষা তাহারই পরিচয় দিতেছে। এই ভাষা যাঁহার প্রাণে ও কানে এক নূতন ধ্বনিরূপ অঙ্কুরিত করিয়াছিল,

তাঁহার চিত্ত কোন ছাঁচে গঠিত ছিল, আজ তাহা বুঝিতে পারি। সেকালে, তাঁহার জীবদ্দশায়, বিদ্যাসাগরচরিত্রের সেই সারস্বত-রূপ কেহ দেখিবার অবকাশ পায় নাই—পর্ব্বতের শিখরই সকলে দেখিয়াছিল, সানুদেশ দেখে নাই! কত বড় সাধনা ও রসবোধ থাকিলে তবে ভাষার এই শুদ্ধ-সংযত শ্রী, ও মধুর-গম্ভীর ধ্বনি আয়ত্ত করা যায়, তাহা আজিকার দিনেই বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে পারি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির সমন্বয় হইয়াছিল—যাহার মত আশ্চর্য্য ঘটনা সে যুগের ইতিহাসে আর নাই—তাহারই ফলে, বাংলা গদ্যে এই রূপ এমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের—অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির—অতিশয় পেলব ও মার্জ্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রস-নৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক মনোবৃত্তির অনুযায়ী যুক্তিনিষ্ঠা, পরিমাণ-বোধ ও স্বাভাবিকতা, এই দুইয়ের মিলন ঘটিয়াছে—এই রচনার ষ্টাইলে। সংস্কৃত কবিগণের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহাই আধুনিক আদর্শে, যুগপ্রবৃত্তির শাসনে সংযত হইয়া বাংলাভাষার নবরূপ নির্ম্মাণের প্রেরণা হইয়াছিল; মধুসূদন দত্ত কান ও প্রাণের যে সাধনায় বাংলা অমিত্রচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও আর এক পথে তেমনই সাধনার ফলে এই গদ্যচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাষার সঙ্গীতগুণই যে সাহিত্যসৃষ্টির আদি প্রেরণা, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, বাংলাগদ্যের রূপটি উদ্ধার করিতে কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যের ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুকীর্ত্তির অশেষ নিদর্শন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্য-রচনা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষা মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব তাঁহার অপর কীর্ত্তিনিচয়কে আশ্রয় করিলেও, তিনি তাঁহার অশ্রান্ত অবকাশহীন কর্ম্মজীবনে বাংলাসাহিত্যের সম্পর্কে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিণত লেখনীর লিপি-কৌশলের কথা বলিব না, কিংবা তাঁহার ভাষার নানা ভঙ্গির কথাও বলিব না; এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পড়িলে, ভাষাকে অবলীলাক্রমে যে-কোন ছাঁচে ঢালিবার সেই শক্তি সকলেই লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইবেন। আমি কেবল তাঁহার এই প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চ-

বিংশতি' হইতে একটি বাক্যচ্ছন্দের উদাহরণ দিব। ইহার শব্দাড়ম্বর লক্ষ্য না করিয়া—লেখকের প্রাণ যে শব্দার্থনিরপেক্ষ সুর-মহিমায় অভিভূত হইয়াছে, এবং কান সেই সুরকে ভাষায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহাই লক্ষ্য করিতে বলি। এইরূপ বাক্যযোজনার মোহ তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইলেও এমন দৃষ্টান্ত অধিক নাই। আমি যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রাণের গূঢ় রূপটি অসম্বৃত হইয়া পড়িয়াছে।

একই ঘটনা কাহিনীর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে দুইবার বিবৃত হইয়াছে; প্রথমবারের কথাগুলি এইরূপ—

তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শনাদি করিয়া নির্গত হইলেন; এবং সমুদ্রে দৃষ্টিপাত মাত্র দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক পরমসুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর কোমল তানলয় বিশুদ্ধ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। (বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য, পৃঃ ৬৮)।

এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ—

যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংসবিধান বাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিদল সাহায্যে, শতযোজন বিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর, লোকাতীত কীর্ত্তিহেতু, সেতু সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন—তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল; তদুপরি এক পরম সুন্দরী রমণী, বীণাবাদনপূর্ব্বক, মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। (ঐ, পৃঃ ৬৮-৬৯)।

পূর্ব্বের ঐ ভাষাই যথার্থ ও পরিমিত—বাক্যরচনা হিসাবে অনবদ্য। পরবর্ত্তী রচনায় লেখক বিষয়-বস্তুকে যেন অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র ভাষার সঙ্গীত-তরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আদর্শ গদ্য ইহা নহে, কারণ ইহাতে শব্দ-অর্থের পরিমাণ-সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু ইহাতে যতি-তাল-সংযোগে কি অপূর্ব্ব ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে—একটি অখণ্ড সুর অল্প-পরিসরের মধ্যে পূর্ণবিকশিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে! এই শক্তি যাঁহার ছিল তিনি বালকপাঠ্য গদ্যও লিখিয়াছেন—'কথামালা'র মত অতি-সরল মিতাক্ষর ভাষায়, সেই জাতীয় একখানি ইংরাজী ক্লাসিকের অনুবাদ করিয়াছেন! এই যে প্রতিভা ইহার সাহিত্যিক পরিচয় আবার ভাল করিয়া করিতে হইবে। বিদ্যাসাগরকে এই দিক দিয়া চিনিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়-মনের যে প্রতিবিম্ব

আছে তাহা আরও উজ্জ্বল ও অভ্রান্ত। 'কথামালা'র সম্বন্ধে একটি যে প্রশ্ন আমার মনে জাগিয়াছে তাহা এইখানে বলিয়া রাখি। ইংরেজীতে James-এর Aesop's Fables একখানি ক্লাসিক হইয়া আছে; মূল গ্রীক কেমন জানি না, কিন্তু এই অনুবাদ নাকি মূলকে অনুসরণ করিয়াই এমন উপাদেয় হইয়াছে; সে যাহা হউক, ইহার ইংরাজী ভাষা ও রচনাভঙ্গি অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অনুবাদে এই পুস্তকই ব্যবহার করিয়াছিলেন মনে হইবার কারণ আছে এবং তাঁহার অনুবাদের ভাষাও এমন সরল সংহত ও বিশুদ্ধ যে, ইংরাজীর মত এই বাংলা অনুবাদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এজন্য আমার মনে হয়, এই পুস্তকখানি স্কুলপাঠ্য হইলেও বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা যাইত। এবং তাহা হইলে একদিকে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ও অপরদিকে 'কথামালা'র ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিচাতুর্য্যের দুই বিভিন্ন ভঙ্গিও যেমন সহজে চোখে পড়িত, তেমনই ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার রুচি বা অভিপ্রায়ের আরও সাক্ষ্য হইয়া উঠিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—এই ভাষাই যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি সাধুভাষা তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি এই গ্রন্থাবলীতে তাঁহার ষ্টাইলের যে কালানুক্রমিক বিকাশ লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' এবং তার পরেই 'শকুন্তলা'য় আমরা ভাষার যে রূপ দেখিতে পাই তাহা বাংলারই সাধুরূপ—যেমন বিশুদ্ধ তেমনই প্রাঞ্জল। শকুন্তলায় কথোপকথনের ভাষা বিশেষতঃ নারী-চরিত্রগুলির—একেবারে খাঁটি বাংলা বলিলেই হয়। কিন্তু 'সীতার বনবাসে' দেখিতেছি, ভাষার সে লঘুলীলা আর নাই—সে ভাষা শুধুই সাধু নয় গুরু-ভাষা। 'শকুন্তলা'য় কালিদাসের, এবং 'সীতার বনবাসে' ভবভূতির—ভাব ও ভাষার আবহাওয়াই ইহার কারণ নয়, এই দুই রচনার মধ্যে যে আর একটি বৃহত্তর রচনার ব্যবধান রহিয়াছে তাহাই ইহার কারণ। এই রচনা—মহাভারতের অনুবাদ; এবং ইহাই এই খণ্ডের বৃহত্তম রচনা। ইহার পূর্ব্বের দুইখানি গ্রন্থে তিনি ভাষার যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, এখানে তাহা করিতে পারেন নাই। মূলের ভঙ্গি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি পদবিন্যাসে সংস্কৃতের রীতি স্বীকার করিয়াছেন; ইহার ফলে মহাভারতের ভাষা একটি স্বতন্ত্র

ভাষা হইয়া উঠিয়াছে—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদেও সেই আদর্শ বজায় আছে। আমার মনে হয়, এইভাবে মহাভারত অনুবাদ করার ফলে, অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা সংস্কার বা অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছিল, এবং 'সীতার বনবাস' বা 'রামের রাজ্যাভিষেক' রচনা কালে তিনি এই আদর্শ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 'ভ্রান্তিবিলাসে'র ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রাঞ্জল হইলেও বিষয়বস্তুর তুলনায় উহা আরও লঘু হইতে পারিত। কিন্তু এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই নয় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার শেষ পরিণতি বা বিকাশ ঐরূপ দাঁড়াইয়াছিল, এবং ইহাই তাহার কারণ। বরং বিদ্যাসাগরের ভাষা ও ভঙ্গির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলে, আমি উপরে যে ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহাই বিদ্যাসাগরী ভাষার একমাত্র আদর্শ নয়—ইহাই আমার বক্তব্য।

বর্ত্তমান খণ্ডে তাঁহার সমুদয় সাহিত্য-রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। সে রচনার পরিমাণ বেশী নয় বটে, কিন্তু তথাপি আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাঁহার মত কর্ম্মবীর যোদ্ধপুরুষের পক্ষে সাহিত্যচর্চ্চার এই অবসরটুকুও মিলিয়াছিল কেমন করিয়া! অপর খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে তিনি সারাজীবন সেবা-ধর্ম্মের যে অগ্নি বক্ষে বহন করিয়া যে ধরণের কর্ম্মযজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এবং তাহারি কারণে কি পরিমাণ লেখনী-কর্ম্মও করিয়াছিলেন। শেষ বয়সের রচনা 'রামের রাজ্যাভিষেক' যে কারণেই অসমাপ্ত হইয়া থাকুক, তাহার সঙ্গে ক্লান্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস জড়িত হইয়া আছে। আত্ম-জীবনচরিতের অধ্যায়গুলি যেখানে আসিয়া হঠাৎ শেষ হইয়াছে, তাহাতে আমাদের চিত্ত হায় হায় করিয়া উঠে। আপনার জীবনের কথা লিখিবার বাসনা ছিল—স্মৃতি অটুট ছিল, উপকরণ একটিও হারায় নাই—তথাপি লেখা আর হইয়া উঠিল না! তাহার কারণ আলস্য নয়, সংকল্পের শৈথিল্যও নয়—এতবড় পুরুষসিংহের পক্ষে তাহা অসম্ভব; কিন্তু সময় হইয়া উঠিল না! সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সেই ট্রাজেডিই তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। যে প্রাণ এত কোমল, এত তীব্র যাঁহার জ্ঞান-পিপাসা, যাঁহার সাহিত্যপ্রেম এত প্রবল,—এবং প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য অবিসংবাদিত, সেই ব্যক্তি আপনাকে লইয়া বসিবার, আপনার হৃদয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় পায় নাই! তাঁহার দেশ কাঁদিতেছে—নিজের কথা শুনিবার সময় তাঁহার নাই; অন্যায়, অসত্য, অশিক্ষা, অনাচার ও অনাহার তাঁহার

দেশের মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলিতেছে—ভাবকল্পনায় মজিবার সময় নাই ; নিজের চেয়ে পর বড়, সাহিত্যের চেয়ে মানুষ বড়—তাই পণ্ডিত, সাহিত্যিক, ভাবুক ঈশ্বরচন্দ্র আপনাকে সবলে সংযত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রামশীলতার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এবং তাহারি কারণে তাঁহার চরিত্রে যে কঠোর সংযম ছিল—রচনাবলীর ভাষার ছত্রে ছত্রে তাহাই পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত দুইটি রচনা, এই মহাপুরুষের কীর্ত্তিগত পরিচয়কে ব্যক্তিগত পরিচয়ের দ্বারা পূর্ণতর করিয়া তুলিবে। ইহাদের একটির নাম 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ', অপরটি তাঁহার স্বরচিত 'জীবন-চরিত'। এই দুইটি রচনাই পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও একালের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। আত্মজীবন-চরিতে অল্প অংশই লিখিত হইয়াছিল, এজন্য কেহ মনে না করেন যে এই পৃষ্ঠাগুলির তেমন কোন মূল্য নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাল্য-জীবনের যে স্মৃতি, নিজ বংশ-পরিচয় ও পিতৃমাতৃকুলের যে কয়েকটি চরিত্র, এবং নিজ পরিবারের যে কঠোর দারিদ্র্য ইহাতে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে সেই ভবিষ্যৎ মহামহীরুহের মৃত্তিকানিহিত শিকড়গুলির এবং অঙ্কুর-কালের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মত মূল্যবান আর কিছুই নাই। উত্তর কালে যে বিরাট মনুষ্যত্বের চূড়া বাংলাদেশের আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ভিত্তিস্থাপনা যদি কেহ চাক্ষুষ করিতে চান, তবে এই অসমাপ্ত আত্ম-জীবন-চরিত সে পক্ষে যথেষ্ট। একদিকে যেমন দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নেও তিনি তাঁহার আত্মীয়গণের ত্যাগ, দৃঢ়তা, স্বল্পে-সন্তোষ ও সদাচারের আদর্শে ভিতরে ভিতরে আপনাকেও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাহার প্রভাব এই ক্ষণজন্মা বালকের পক্ষে নিষ্ফল না হইবারই কথা, তেমনই, আর একদিকে সংসারের স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার মধ্যে তিনি সেই বয়সেই যে দুই একটি স্নেহ মমতা ও করুণার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়ে তাহা অতি গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল ; এইরূপ একটি মহিলার কথা তিনি যেভাবে এই জীবনকাহিনীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে—সেই দয়ার সাগরের দয়া-ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ হইয়াছিল কবে ও কি ভাবে,—জানিয়া চমকিত হইতে হয়। একস্থানে লেখক বলিতেছেন—"আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি স্নেহ দয়া সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ

করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ক্ষণভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।" পড়িয়া মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশ এই দেবীর নিকটে চিরঋণী হইয়া আছে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার ভক্তির কারণ আরও একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতার যখন উপবাস করিয়া কাটাইতে হইত, সেই সময়ে একটি সামান্য স্ত্রীলোক যে ভাবে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল—"পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন না।"

কিন্তু 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামক ক্ষুদ্র রচনাটি পড়িয়া বিদ্যাসাগর-চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও নয়। এই "বিলাপ"—তিনি প্রকাশ করিবার জন্য রচনা করেন নাই, কারণ, ইহার মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক দুঃখের অতি করুণ কাতরধ্বনি রহিয়াছে, তাহা অপরকে শুনাইবার উচ্চ রোদনরব নহে। এখানে আমরা যেন মানব-হৃদয়ের এমন একটি নিভৃত গোপন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি যেখানে প্রবেশের অধিকার আমাদের নাই—সে কাজ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। আমার মনে হয়, ইহাতে মৃত মহাত্মার অনুমতি ছিল না, আমরা যেন সত্যই অন্যায় কাজ করিয়াছি; তথাপি ইহা পাঠ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। সেই সিংহবৎ পুরুষের হৃদয় যে কিরূপ কোমল ছিল, সে কথা বাংলা দেশে কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু সে কোমলতা সর্ব্বদাই পৌরুষযুক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে—পরের দুঃখে কেবল বিগলিত হওয়াই নয়, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য অসীম হৃদয়-বলের অভিব্যক্তিও হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃখ নিজের দুঃখ—এ দুঃখের প্রতিকার-চেষ্টা যেমন নিষ্ফল, তেমনই অনাবশ্যক। একটি বন্ধুকন্যা শিশুর শোকে এতবড় জ্ঞানী ও প্রবীণ পুরুষ যে কেমন করিয়া কাঁদিতে পারে, তাঁহার হৃদয়ও যে এত দুর্ব্বল ছিল, তাহা কে জানিত? কান্নার প্রত্যেক কথাটির মধ্যে হৃদয়ের কি ক্ষুধা প্রকাশ পাইয়াছে! বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই অতি বৃহৎ মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা আমাদের চক্ষে তাঁহাকে এক নূতন মহিমা দান করিয়াছে। জীবনে যে কোন দুর্ব্বলতার অধীন হয় নাই, যাহার কীর্ত্তি-গৌরবের শতাংশের

এক অংশ লাভ করিলে মানুষের আত্মপ্রসাদের অন্ত থাকে না, যে কত মানুষের কত দুঃখ দূর করিয়াছে, তিনি যে একদিনের জন্যও আপনাকে অতিশয় সাধারণ মানুষ ভিন্ন আর কিছু মনে করেন নাই,—যে দুঃখ যে শোক সার্ব্বজনীন তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার মত আত্মাদর তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না—'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধচিত্তে তাহাই ভাবিয়াছি। এ যেন কোন মহাকবি-রচিত নাটকের একটি অতি গভীর রসাত্মক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে চিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সবগুলিই যেমন মূল্যবান, ছাপাও তেমনই উত্তম হইয়াছে। 'শ্মশানে বিদ্যাসাগর' চিত্রটি অতিশয় চমকপ্রদ, এমন কি, রোমাঞ্চকর বলিলেও হয়। এ অবস্থার এরূপ চিত্র প্রতিকৃতি-হিসাবে যথার্থ না হইতে পারে, তথাপি চিত্রের এ মূর্ত্তি এখনও জীবিত—ইহার মধ্যে সেই মহাজীবনের নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। জরা ও ব্যাধিপীড়িত মুমূর্ষু দেহে—বিশেষ করিয়া ওই মুখে—যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তূলিকার অযোগ্য নহে। যে জীবনের মত প্রবল প্রচণ্ড জীবন প্রায় কেহ ভোগ করে না—সে জীবনের অবসান হইয়াছে, এ মানুষ আর সে মানুষ নহে; সকলের মধ্যে যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল, সে আজ একা! সেই বীর্য্য, সেই প্রতিভা, সেই জ্বলন্ত আত্মপ্রত্যয়—ও-মুখে সে সকলের চিহ্নও নাই। তথাপি এ মুখও বিদ্যাসাগরের মুখ—স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ কোন বিকৃতি ইহাতে নাই। এই অতি অসহায় দীন মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, এতদিনে এই মহাপুরুষের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে—নিজেকে নিঃস্ব করিয়া, নিঃশেষে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া, আজ তিনি জাহ্নবীতীরে বালুশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। আজ তাঁর ছুটি—মহাবিশ্রাম, মহানিষ্কৃতি! এ চিত্র দেখিয়া বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে। তাই বলিয়াছি এক হিসাবে অপর প্রতিকৃতিগুলি হইতে উহার মূল্য স্বতন্ত্র—চিত্র হিসাবেও ইহা অতুলনীয়। আমাদের দেশের আর কোন মহাপুরুষের এমন শ্মশান-চিত্র দেখি নাই।

বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য

আজ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি—স্মৃতি-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধা নূতন করিয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছি। বঙ্কিমের প্রতিভা ও বঙ্কিমের কীর্ত্তি, জাতির জীবনে তাঁহার দান ও ইতিহাসে তাঁহার স্থান—আমরা এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া নিরূপণ করি নাই, বিস্মৃতির কারণ তাহাই। কিন্তু আজ আমরা এই যে স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা কি কেবল তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য? কেবল স্মরণ করিয়া লাভ কি? বঙ্কিম-চন্দ্রের মত পুরুষকে কেবল স্মরণ করিলেই পরমার্থ লাভ হইবে না—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে, এবং এক্ষেত্রে সে পরিচয় জাতির আত্ম-পরিচয়েরই মত। কারণ, তাঁহার মত পুরুষ একটা জাতি ও যুগের প্রতীক—সে পুরুষের মধ্যে বাঙ্গালী আপনারই প্রতিভার দীপ্ত রূপ দেখিতে পাইবে; যুগ-সন্ধির সেই মহাসঙ্কটকালে এই পুরুষের মধ্যেই সে একদিন নিজের পূর্ণশক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে দেখিয়াছিল, তাহার নিজেরই স্তিমিতচেতনা এই প্রতিভার দিব্যচ্ছটায় স্ফুরিত হইয়া তাহার যাত্রাপথ আলোকিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের যে মূর্ত্তি সকল নশ্বরতা হইতে মুক্ত হইয়া দীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যেন এই জাতির জীবন-জলাশয়ের গভীর তল হইতে উত্থিত একটি প্রস্ফুট প্রাণ-শতদল। অতএব কেবল নাম স্মরণ নয়, সেই মূর্ত্তির পূর্ণ ধ্যান করিয়া আমাদিগকে পুনরায় আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে যে যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, সে যুগান্তরের প্রাণান্ত বিক্ষোভকে নবজীবনধারায় নূতন সৃষ্টির পথে প্রবাহিত করিবার জন্য যে প্রতিভার ও মনীষার স্ফুরণ আমরা ঐ যুগে নানাভাবে হইতে দেখিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রে তাহাই সার্থক হইয়াছিল। আজ বাঙ্গালী সে যুগের সেই বিক্ষোভ আর প্রত্যক্ষ করিতেছে না বটে, কিন্তু তাহার আধুনিক মনো-জীবনের অন্তঃস্থলে সেদিনের সেই বন্যা হইতে যে পলিমৃত্তিকার স্তর সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই অসাধ্য-সাধনের ফল। এখনও—বিংশশতাব্দীর প্রায়

মধ্যভাগে—আমরা যে কয়টি প্রধান ভাবচিন্তা লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিয়া থাকি তাহারও মূলে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের নূতন মনোভাব ও নবসংস্কৃতির প্রধান প্রবর্ত্তক। ইহা বুঝিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বাংলার ইতিহাস সম্যক আলোচনা করিতে হইবে, এবং তদানীন্তন কালের সঙ্গে বঙ্কিমের কীর্ত্তির তুলনা করিতে হইবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ আমরা সেই এক ব্যক্তিকে পাইয়াছিলাম, পাইয়াও হেলায় হারাইতে বসিয়াছি। বঙ্কিমের প্রভাব যে পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা এই ভীষণ যুগ-সঙ্কটে সকল দিকেই দিক্‌ভ্রান্ত হইতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভার একটা দিক—একটা বিশিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে, আমি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বলিতে যে মনীষা, ভাবুকতা ও কবিশক্তির কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হয়, সে সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু বলিব না; কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যে আর একটি বস্তু ছিল, যাহার বলে তিনি বাঙ্গালীর কেবল মনের উৎকর্ষসাধনই করেন নাই—তাহার মনের সংস্কার ও প্রাণের প্রবৃত্তিকেও নূতন পথে চালিত করিয়াছিলেন, তাহার কথাই বলিব; কারণ, কেবল ভাবুকতা বা সাহিত্যিক প্রতিভার দ্বারা একটা জাতির জীবনের গতি-মুখ পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। তাহা যে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কারণ সেই প্রতিভার সঙ্গে ছিল একটি বজ্রবিদ্যুন্ময় ব্যক্তি-সত্তা, তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের মত সুদৃঢ় ও সুগভীর পুরুষ-মহিমা। তাঁহার দৃষ্টি ছিল যেমন গভীর তেমনই অপলক, সঙ্কল্পও তেমনই নির্ব্বিকল্প। এই কথাটি ভাল করিয়া না বুঝিলে বঙ্কিম-প্রতিভার প্রকৃত মহত্ত্ব, তাহার ভাস্বর দ্যুতির বারো আনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—সূক্ষ্ম মনোবিলাসের বা কাল্‌চারের আয়োজন প্রচুর করিয়া তোলেন নাই; তিনি এই জাতির বক্ষে বল ও প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন; ভাব ও চিন্তার প্রচণ্ড শক্তি-বলে তাহার জীবনের জীর্ণ ভিত্তি সংস্কার করিয়া নূতন সৌধের পত্তন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য, তাঁহার প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য তাহাই এ যুগের অপর সকল সাহিত্যিক প্রতিভা হইতে তাঁহাকে একটি অতিশয় পৃথক আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহা বুঝিতে না পারিলে বঙ্কিমকে বুঝিবার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।

অতএব বঙ্কিম-প্রতিভাই শুধু নয়, বঙ্কিম-চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না

করিয়া পারে না; ইহাকে আমি প্রতিভার পৌরুষ বলিব—কবি-প্রতিভার সঙ্গে সেই পৌরুষের মিলন আমাদের দেশে কচিৎ ঘটিয়াছে। কবি, সাহিত্যিক, ভাবুক বা মনীষী আমাদের দেশে আরও অনেকের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গে এমন পুরুষোচিত ঐকান্তিকতা, অটল আত্ম-মর্য্যাদাবোধ, এবং কবি-ধর্ম্মের মধ্যেও মনুষ্যধর্ম্মের এমন অবিচলিত প্রেরণা, এ জাতির ইতিহাসে অতিশয় দুর্লভ। কোনও চিন্তা বা কোনও ভাবই তাঁহার নিকটে খেলার সামগ্রী ছিল না —তিনি সাহিত্যিক ভাববিলাসী ছিলেন না। তিনি যাহা ভাবিতেন তাহার সহিত সেই সিদ্ধিলাভের চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক ছিল। যে সকল চিন্তা অলস শক্তিহীন পুরুষের ভাববিলাস মাত্র, অথবা যাহা ব্যক্তির একক সাধনা বা আত্মোৎকর্ষের সহায়—তাহাকে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রশ্রয় দেন নাই; কারণ, তাহা অতিশয় স্বার্থপরতার লক্ষণ, এবং স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতার মধ্যে তিনি কোন ভেদ মানিতেন না। এই জন্যই, কবি বঙ্কিম, ভাবুক বঙ্কিম, মনীষী বঙ্কিম তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক সাধনায় এমন একটি পুরুষ-মূর্ত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন—যাহাকে তাঁহার প্রতিভা হইতে পৃথক করিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও কাব্যকল্পনার সূত্রধাররূপে তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে দেখি; কল্পনা যত উৎকৃষ্ট হউক, কবির পশ্চাতে একটি পুরুষের সত্তাকে কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারি না। এই জন্যই, যাঁহারা নিছক আর্টপন্থী তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক ত্রুটী আবিষ্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই আর্ট-ঘটিত ত্রুটী সত্ত্বেও তাঁহার গদ্য কাব্যগুলিতে পরিপূর্ণ রসসৃষ্টি হইয়াছে রসিক মাত্রেই যখন ইহা স্বীকার করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলির জন্য আর্টের একটি স্বতন্ত্র আদর্শকেই স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ, কবি-চরিত্র ও কবি-প্রেরণা এই দু'য়ের একটি আশ্চর্য্য সমন্বয় যে সম্ভব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

বঙ্কিম-প্রতিভার এই যে লক্ষণ ইহারই কারণে বঙ্কিমের প্রতিভা কখনও অতিচারী হইতে পারে নাই—তিনি যত বড় উচ্চ ভাবের ভাবুক হউন, কঠিন মৃত্তিকার শাসন কখনও অগ্রাহ্য করেন নাই। সকল তত্ত্বকে তিনিও নর-নারীর চরিত্রে প্রত্যক্ষ জীবন্তরূপে ক্রিয়াশীল করিয়া দেখাইয়াছেন; যাহা চিন্তালব্ধ সত্য, যাহা একটা যুক্তি বা সিদ্ধান্ত মাত্র, তাহাকে নরনারীর হৃদয়-শোণিতে চিত্রিত

করিয়া আমাদের নেত্রগোচর করিয়াছেন। এ শক্তি কেবল কল্পনাশক্তিই নয়—ইহার মূলে আছে অসীম বিশ্বাসের শক্তি। ভাবে যাহাকে পাইতেছি, বস্তুতেও তাহাই আছে। প্রাণ ও মনের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে কোন সংশয়ের ব্যবধান নাই। এই স্থির দ্বিধাহীন দৃষ্টির মূলে যে আত্ম-প্রত্যয় আছে, তাহাই সর্ব্ববিধ পৌরুষের নিদান; কিন্তু কবি-শক্তির সহিত পুরুষ-শক্তির এমন মিলন আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত ঐ একবারই ঘটিয়াছে। একদিকে যেমন ভাবের প্রাবল্য ও কল্পনার অসীম স্ফূর্ত্তি, অপরদিকে তেমনই লোক-ব্যবহার ও মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে সদাজাগ্রত চেতনা; সৃষ্টির নিগূঢ় নিয়ম এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ, এই দুইয়ের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই, সহজ ও সুস্থ মনের যে বিধিদত্ত সম্পদ, সেই বিবেক বা বিচারবুদ্ধিকে কখনও পরাস্ত হইতে না দেওয়া; এই সকল গুণ সেই প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে, এই প্রসঙ্গে আমি তাহাও স্মরণ করাইতে চাই।

কিন্তু বঙ্কিম-প্রতিভার এই পৌরুষের আলোচনায় সে যুগের বাঙ্গালী সমাজকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সে যুগের ইতিহাস এখনও সম্যক আলোচিত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই—সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভার অভ্যুদয় একটু বেশি আকস্মিক ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের মূলে যে একটি প্রধান কারণ ছিল তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই; তখনও বাঙ্গালী জাতি যে এত নির্জীব হইয়া পড়ে নাই, তাহার দেহ-মনের স্বাস্থ্য যে অটুট ছিল সে কথা আমরা ভাবিয়া দেখি না। সে যুগের বাঙ্গালী সমাজের রক্ষণশীলতাকে আমরা আজ অতিশয় কৃপার চক্ষে দেখি, এবং সে জন্য আমাদের পিতৃ-পিতামহ-গণের পরিচয় দিতে আজ আমরা লজ্জাবোধ করি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও চিন্তা করি না যে, সেই অতি রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলার ঔরসেই এই সকল বীর্য্যবান প্রতিভাবান পুরুষের জন্ম হইয়াছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর অতিশয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহারা সে যুগে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই সেই অবজ্ঞাত পূর্ব্বপুরুষের বীর্য্য তাঁহাদের বক্ষে বাহুতে অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে যুগের সেই উদ্দীপ্তির জন্য বিদেশ হইতে অগ্নি-চয়ন করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার

উৎকৃষ্ট ইন্ধন তখনও এ জাতির দেহে-মনে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই; এবং সেই কারণে এখন যাহাকে অতিশয় বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়, তাহা সত্যই ততটা বিস্ময়কর নহে। সেকালের বাঙ্গালীর দেহের আকৃতিও আজিকার মত খর্ব্ব ছিল না, তখনও বাঙ্গালীর 'race-type' অক্ষুণ্ণ ছিল, এমন অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই।

তথাপি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের মত পুরুষের আবির্ভাব এ জাতির মধ্যে একটু বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির সাধারণ প্রকৃতির পক্ষে পৌরুষের এইরূপ অভিব্যক্তি আমাদের চক্ষে যেন একটু অসাধারণ, আজিকার বাঙ্গালীকে দেখিয়া তাহাই মনে হয়; পূর্ব্বের ইতিহাস না জানা থাকাও একটা কারণ। বাঙ্গালী-চরিত্রের যে ধরণের পৌরুষ আমরা এই তিন মহাপুরুষের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাহা হয়ত কোন কালেই দুর্ল্লভ ছিল না; উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং অনুকূল অবস্থার অভাবে ইতিহাসে তাহা চিহ্নিত হইতে পারে নাই। ব্রিটিশ-যুগে বাঙ্গালী জাতির যে অভাবনীয় অভ্যুদয় ঘটিয়াছে তাহার কারণ ঐতিহাসিকেরা নির্দ্ধারণ করিবেন, কিন্তু এই যুগে আমরা যে তিনটি আদর্শ-পুরুষের সাক্ষাৎ পাই তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারি না। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের পৌরুষ, তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনে, দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও অসাধারণ ত্যাগের ভিতর দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরুষ ততটা সহজ-গোচর নহে; তাহার কারণ, সে পৌরুষ কোনও সামাজিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকাশ পায় নাই, সাহিত্য-কর্ম্মের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকায় তাহা আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সুলিখিত জীবনবৃত্তান্ত নাই, থাকিলে, বাহিরের জীবনেও তাঁহার দৃপ্ত পুরুষ-চরিত্রের বহু চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পাইতাম। তথাপি আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে সাহিত্যিক পৌরুষের কথা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে আশা করি সকলেই একমত হইবেন। সেই সাহিত্য-সাধনার মধ্যেই আমরা যে পুরুষ-বীরের পরিচয় পাই—তাহা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সেখানেও দেখিতে পাই, একটি মূল লক্ষ্যের অভিমুখে, অতিশয় অবিচলিত পদক্ষেপে, আপনার মনঃপ্রাণের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একজন পুরুষ-বীর, এই জাতির আধি-ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি-পন্থা নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যত কিছু বাধা—অশিক্ষিতের অবিশ্বাস, শিক্ষিতের অশ্রদ্ধা, বিধর্ম্মীর আক্রোশ, প্রেমহীনের পরিহাস—এই

সকলই অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আপনার অন্তরের অগ্নি ও তাহারই আলোক-শিখাকে সম্বল করিয়া, এই নির্ভীক পুরুষ যে অসীম বিশ্বাসে সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই বিশ্বাসই আর সকলকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দুর্জ্জয় আত্মপ্রত্যয়ের বলেই তিনি একটা জাতির মনোরাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্য যিনি আন্তস্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহার পক্ষে এই ধারণা অনিবার্য্য; এমন কি, তাঁহার মনীষা ও কবি-শক্তি অপেক্ষা তাহার ব্যক্তি-চরিত্রের এই পৌরুষ সকলকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারাশি হইতে উদাহরণ দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে হইবে না। তথাপি আমি ইহার প্রমাণস্বরূপ দুইটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ এখানে করিব। প্রথমটিই অধিকতর প্রণিধান-যোগ্য। তাহা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে কোথাও একটি বৃথাবাক্য নাই। তাঁহার ভাষা যেমন স্পষ্ট, তেমনই পরিমিত; যেমন বাহুল্যবর্জ্জিত, তেমনই অর্থপূর্ণ। যেখানে বাগ্‌বাহুল্যের বা বিষয়-বিস্তারের প্রলোভন দুর্দ্দমনীয়—সেই উপন্যাস-রচনাতেও—তাঁহার সংযম বিস্ময়কর; সেখানেও একটি পংক্তি নাই যাহা অতিরিক্ত বা অকারণ। এই জন্যই তাঁহার উপন্যাসের কলেবর এত ক্ষুদ্র। এই যে বাক্‌সংযম—ইহার মত পুরুষোচিত ধর্ম্ম আর নাই; আবার, উপন্যাসের মত কাব্যরচনায় এতখানি আত্মশাসন শক্তির পরাকাষ্ঠা বলিলেও হয়। এই যে সংযমের কথা বলিলাম ইহা শুধুই আর্টের সংযম নয়; রচনাকে মনোহারী করিবার জন্য যে সকল কৌশলের প্রয়োজন হয় ইহা তাহার অন্তর্গত একটি কৌশলমাত্র নয়। কারণ, যাহা নিরর্থক—এমন কি, মিথ্যা, যাহার মূলে আত্ম-প্রত্যয়ঘটিত প্রেরণা নাই, তাহাকেও সুবিন্যস্ত কথার সাহায্যে একপ্রকার রস-রূপে পরিণত করা অসম্ভব নয়; বলা বাহুল্য সে সাহিত্যও বড়দরের সাহিত্য নয়। কিন্তু আমি এখানে রসতত্ত্বের জটিল তর্কজালে প্রবেশ করিব না; বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কোথাও বৃথাবাক্য নাই, এই কথাটির মধ্যে যে অতি সরল সহজ অর্থ আছে, সেই অর্থই যথেষ্ট; এবং তাহা যে লেখকের কোন্ গুণের পরিচয় দেয় আমি তাহাই সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই লক্ষণ আর একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে—যিনি এত বিষয়ে এত লিখিয়াছেন তিনি নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীরব। বঙ্কিমচন্দ্র

এ-কালের মানুষ—একালের কবি ও মনীষিগণ সাধারণতঃ অতিশয় আত্মসচেতন হইয়া থাকেন; এজন্য, আত্মচরিত কিম্বা Journal, বা আত্মচিন্তার দিন-লিপি রচনা, অথবা বন্ধুবান্ধবকে পত্রচ্ছলে আত্মকথা নিবেদন—ইহার কোন না কোনটি এ যুগের প্রায় সকলেই করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইহার কোনটাই করেন নাই। অতিশয় ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনা, আশা ও নিরাশা, সাংসারিক ও সামাজিক কারণে মানসিক অশান্তি, অন্তরের দ্বন্দ্ব সংশয়—তাঁহার মত পুরুষের জীবনে কত গভীর ও বিচিত্র ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু কুত্রাপি বন্ধুজনের নিকটেও তিনি নিজের সেই একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী ব্যক্ত করেন নাই। মনে হয়, সেখানে তিনি অতিশয় নিঃসঙ্গই থাকিতে চাহিয়াছিলেন; অথবা যে বিরাটকে তিনি অহরহ আপনার আত্মার সমক্ষে রাখিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় নিজের ব্যক্তি-জীবনের যাবতীয় ব্যাপার অতিশয় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করিতেন। আত্মকথা প্রচারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম আত্মম্ভরিতা আছে তাহাকে তিনি অতিশয় হীন বলিয়াই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় দর্পণে আপনার মুখশোভা দেখিতে ভালবাসে, কত ভঙ্গিতে মুখ-প্রসাধন করিয়া তাহার প্রতিবিম্বকে সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা পায়। এইরূপ আত্মপ্রীতি যে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের তাহা ছিল না। বঙ্কিম আপনার কথা যেখানে বলিবার, সেখানে সুচারুরূপেই বলিয়াছেন,—তাঁহার সমগ্র রচনাবলীই তাঁহার সেই আত্মকথা, এবং সে কথা তাঁহার আত্মার কথা, ব্যক্তি-জীবনের কথা নয়। যে উচ্চ আদর্শনিষ্ঠাকে ভারতীয় ভাষায় ব্রহ্মনিষ্ঠা বলে, এবং যাহা পুরুষের শ্রেষ্ঠ পৌরুষের লক্ষণ—ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি, নিজের সম্বন্ধে এই যে কঠিন মৌনাবলম্বন, ইহার আর একটি কারণ আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—একটা দারুণ নিঃসঙ্গতা-বোধ; তাঁহার হৃদ্‌গত উৎকণ্ঠা সমর্পণ করিবার মত কোন দোসর যেন তাঁহার মেলে নাই। কিন্তু তাহার জন্য কোন কাতরোক্তি বা অভিযোগ নাই, অন্তরের নির্জ্জন নিশীথে সে পুরুষ নিজের স্বপ্ন নিজেই দেখে, নিজ হৃদয়-ভার সে আর কাহাকেও অর্পণ করিতে চায় না। এই অভিমান যেমন আত্মার একরূপ আভিজাত্যের লক্ষণ, তেমনই এমন ভাবে আত্মসংবরণ করিবার শক্তিও অতিশয় শক্তিমান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাগত পৌরুষের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম তাহাতে নূতন কিছুই নাই—বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে একটুকু পরিচয় যাঁহার আছে তিনিও তাহাতে বঙ্কিম সম্বন্ধে কোন নূতন জ্ঞানলাভ করিবেন না। তথাপি আমি বঙ্কিম-প্রতিভার সেই সর্ব্বজনবিদিত দিকটির প্রতি আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি; তার কারণ, বর্ত্তমান যুগের বাংলা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, বঙ্কিম-সাহিত্যের রসবিচার অপেক্ষা সেই সাহিত্যের প্রেরণামূলে যে মনুষ্যত্ব, পৌরুষ ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, তাহাই ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। আজিকার বাংলা-সাহিত্যে প্রতিভার বন্যা আসিয়াছে, সে বন্যায় বঙ্কিম বহুপূর্ব্বেই ভাসিয়া গিয়াছেন; কিন্তু প্রতিভার সহিত পৌরুষ যুক্ত না হইলে যাহা হয়, এক্ষণে আমাদের দেশে তাহাই হইতেছে—ক্ষণজীবী ওষধিলতার মত কবিতা ও গল্পে মাঠ বাট আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু বৎসরান্তে তাহাদের চিহ্নও থাকে না, আর একদল গুল্ম ও লতার জঙ্গলে চলিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পৌরুষ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আজ সকল দেশেই অনুভূত হইতেছে। চারিত্রিক স্বাস্থ্যহানির ফলে স্নায়বিক উত্তেজনাই প্রতিভাবিকাশের একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এজন্য সাহিত্যেও আর সত্যকার সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এ যুগের মানুষের মত বা মনের স্থিরতা নাই—ক্রমাগত একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সেই বীর মনীষিগণের কীর্ত্তিকে অপসারিত বা অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে একালের বালখিল্য-প্রতিভা যে সকল মতবাদের আশ্রয় লইয়া থাকে—যে ধরণের বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহার মূলে কোনও চিন্তাগত সত্যনিষ্ঠা নাই, অতিশয় হাল্‌কা মনোবৃত্তির সৌখীন বিলাসমাত্র আছে। মতগুলিও সত্যকার মত নয়, খেয়াল মাত্র; সেই খেয়াল কেবলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কোনটাই দুদিনের বেশী টিকিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া মানুষ হতভম্ব হইয়া যায়, ভাবে—আবার না জানি কোন নূতন মতের আবির্ভাব হইবে, সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আবার কোন্ খেয়াল-খুশী আধিপত্য লাভ করিবে। গত শতাব্দীর সর্ব্ববিধ সাধনার মূলে যে নীতিনিষ্ঠা ছিল, একালে তাহাকে পরিহার করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতিহীনতার জয়ঘোষণা হইতেছে। সেকালে অন্যান্য ভাবচিন্তার মত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, শক্তিশালী প্রতিভাবান পুরুষের প্রতি জনসাধারণ একটি সুগভীর শ্রদ্ধার ভাব

পোষণ করিত; তাহারা জানিত, এমন ব্যক্তির সাধনা মিথ্যা হইতে পারে না, সে সাধনায় কালক্রমে সিদ্ধিলাভ ঘটিবেই। একালে সাধনা বলিয়া কিছুই নাই,—কিছুই কালসাপেক্ষ নহে, সকলই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত; এবং অপ্রত্যাশিত বলিয়াই চমকপ্রদ। এখন কোনও ভাব বা চিন্তার মূলে লেখকের কোনও দায়িত্ববোধ নাই—বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই; সকলেই স্ব স্ব প্রধান। প্রেরণা এক না হইলেও, সাহিত্য বা শিল্প-কলার সাধনায় যে এক একটি গোষ্ঠী আপনা হইতে গড়িয়া উঠে—এক একটি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়, একালে তাহাও আর সম্ভব নয়। এখন প্রত্যেকেই আপনাকে জাহির করিতে চায়—যে সব চেয়ে বেশী চীৎকার করিতে পারে সেই তত বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে লেখক ব্যাকরণ ও অভিধানের মুণ্ডপাত যত বেশী করে, যাহার রচনায় ভাষার প্রাথমিক নিয়মগুলিও তিরস্কৃত হইয়া থাকে, সেই তত অধিক হাততালি অর্জ্জন করে। কিন্তু এই সৌভাগ্যও তাহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় না, কারণ তাহার ঠিক পশ্চাতেই আর একজন আসিয়া উপস্থিত হয়—এক হাততালি না থামিতেই আর এক হাততালি স্বরু হয়; কারণ, এই পরবর্ত্তীর চীৎকার আরও গগনভেদী, তাহার রচনা আরও অদ্ভুত, আরও চমকপ্রদ। বঙ্কিম-যুগের প্রভাব যেদিন লোপ পাইয়াছে সেইদিন হইতেই আমাদের সাহিত্যে এই ধর্ম্মহীন নীতি ও নিষ্ঠাহীন স্বেচ্ছাচার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়াছে। তথাপি এই বর্ণনাটি আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি প্রযোজ্য হইলেও পূরাপূরি প্রযোজ্য নহে; কারণ, সে সাহিত্য আধুনিকতার বায়ুগ্রস্ত হইলেও এতই দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী যে, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে। আমাদের সাহিত্যে যাঁহারা অনাচার করিতেছেন, তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য কুখ্যাতিরও অধিকারী নহেন; তাঁহাদের সেই অনাচারও অনুকরণ-মূলক। তথাপি সেই অনুকরণের মধ্যে যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্যিক জলাশয়ে যে পঙ্কিল আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল উৎস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের প্রয়োজন আছে, তাই আমি আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে একজন ইংরাজ সমালোচকের উক্তি উপরে বাংলায় উদ্ধৃত করিয়াছি। তথাপি, পাছে কেহ সন্দেহ করেন যে, আমি অনুবাদে কিছু রং ফলাইয়াছি, এবং যেহেতু বাংলা কথা অপেক্ষা ইংরাজী

কথার মাহাত্ম্য অধিক, অতএব মূল ইংরাজীও অতঃপর উদ্ধৃত করিতেছি। এ বিষয়ে আমার এতখানি আগ্রহের কারণ, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ও বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রসঙ্গে এই আধুনিকতার স্বরূপ বিশেষ করিয়া উদ্ঘাটন করিতে চাই। এই আধুনিকতার সম্বন্ধে উক্ত ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন—

Literature, painting and sculpture have indeed been affected by not one but several revolutions since the men who made the nineteenth century notable in these spheres, passed to the Great Beyond. True, that in many respects they were merely tinsel revolutions, establishing no great principles in the stead of those they displaced—or, rather ignored ; revolutions based on passing whims, which quickly gave place to others equally ephemeral, the sum-effect of which has been to leave the world wondering as to what the next "ism" will be to dominate for the time-being, in the domain of Art. Instability of belief has succeeded the orthodoxy which characterised the mid-nineteenth century art doctrine. The mid-Victorian Age was marked by the solidity of its popular belief in its leaders in literature and art ; the certainty that what they did was right ; that work expected of them would in due course be presented. But we have changed all this. The feature of the "Georgian" era is its unexpectedness. There is no stabilised "school", instead there are individuals, each anxious for notice, and the one who screams the loudest secures the most attention. The author who pays the least regard to the rules of syntax and composition, the painter who disregards most the niceties of drawing and the harmonies of colour—he is king for the moment, and receives the fashionable plaudits. Their reign is of brief duration, for their successor is on their heels with an even louder scream, and even more bizarre effect ere the echo of the acclamation has died away. (*Introduction to the Life and Work of Sir John Everett Millais in the 'Modern Painters of the World' series*)

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আধুনিক যুগের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এই পাপ কোথা হইতে প্রবেশ করিয়াছে—রোগের বীজ সেই একই, তবে দেহ তেমন সবল নহে বলিয়া বিষের ক্রিয়াও তেমন প্রচণ্ড হইতে পারে নাই; এ পর্য্যন্ত কতকগুলি ব্রণস্ফোটক মাত্র দেখা দিয়াছে।

এই যে অবস্থা, ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়া আজ বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিতে হইবে,

বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এই দু'য়ের সঠিক ধারণা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে; কেবল সাহিত্যিক রসতত্ত্বের সৌখীন আলোচনা করিলে চলিবে না। বঙ্কিম-প্রতিভার যে পৌরুষ একদিন মহাকালের জটাজাল-বাসিনী ভাবগঙ্গার উন্মাদ তরঙ্গস্রোতকে এই বাংলার সমভূমিতে তটশালিনী ভাগীরথীরূপে প্রবাহিত করিয়াছিল, আজ সেই পৌরুষের ধ্যান করিয়া আমাদিগকে আর এক মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় করিতে হইবে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের লোক সে যুগ গত হইয়াছে, সে সাহিত্যও এখন অচল—যুগের সঙ্গে সাহিত্যও কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, এ বিষয়ে আধুনিক সাহিত্যসম্রাট হইতে ক্ষুদ্রতম ভৌমিক পর্য্যন্ত কাহারও মতভেদ নাই। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীর অগ্রবর্ত্তী নয়—পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু সে যুগের সকল কীর্ত্তিই এক্ষণে গলিত ফলের মত মাটি হইয়া গিয়াছে—ইহাই প্রগতিবাদের অবশ্য-স্বীকার্য্য সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়, এইরূপ মনোভাবের ফলেই বাংলাদেশের আধুনিক পণ্ডিতগণ, পুরাতনের উপর আধুনিকের, এবং আধুনিকের উপর অতি-আধুনিকের স্থান নির্দ্দেশ করিতে এত ব্যগ্র, এবং ইহারই ফলে ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপরেও পর্দ্দা টানিয়া দিবার ভাব দেখা যাইতেছে। এ-হেন কালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও আলোচনা অতিশয় অসাময়িক বলিয়াই মনে হয়, অনেক কৈফিয়ৎ দিয়াও মুখরক্ষা করা কঠিন। তথাপি আমি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি; বঙ্কিম-সাহিত্যকে কোন্ দিক দিয়া বিচার করিলে, আধুনিক রুচি ও রসবোধ ক্ষুণ্ণ হইলেও—সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই, আমি তাহাই ভাবিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ক্রমোন্নতিই যে সৃষ্টির একমাত্র নিয়ম, কাল যতই অগ্রসর হইতেছে মানুষও যে ততই উন্নত হইতেছে—না হইয়া পারে না, এইরূপ একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কোন চিন্তা, কোন ভাব—এমন কি, কোনও কারুসৃষ্টির একটা কালনিরপেক্ষ মূল্য নাই; কাল-স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্ত যেমন স্থিরকেন্দ্রিক নয়, তেমনই মানুষের অন্তরেও কোন-কিছুর ধ্রুবচ্ছায়া প্রতিফলিত হইতে পারে না—এই তত্ত্ব এ যুগের মানুষকে সর্ব্ব বিষয়ে অবিশ্বাসী করিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অনিত্যের উপাসনা চলিয়াছে; সেখানেও সকল সৃষ্টিই ক্ষণিক, পূর্ব্বক্ষণকে পরক্ষণ স্বীকার করে না, এবং প্রগতিবাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, যাহা পরবর্ত্তী তাহা যে অগ্রবর্ত্তী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতেই হয়।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর যে ক্ষেত্রেই যথার্থ হউক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, দিলেই সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়। সাহিত্যের জগৎ ও যথাপ্রাপ্ত জগৎ এক নয়; একটি—দেশে ও কালে বিবর্ত্তিত হইতেছে, অপরটি—দেশকালকে আশ্রয় করিয়াও যে পরিমাণে তাহা হইতে মুক্ত, সেই পরিমাণেই তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যপদবীতে আরোহণ করে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড—শেক্স্পীয়ার, কালিদাস, গেটে—বিশ্ব সাহিত্যের এই সকল প্রকাশ দেশকাল-সম্পর্কিত হইলেও ক্রমবিকাশ বা প্রগতিবাদের প্রমাণ নহে—জাগতিক কার্য্য-কারণতত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই ঘটনাগুলির সম্যক ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার প্রয়োজনে, সাহিত্যিক রূপ-বিবর্ত্তনের একটা কালক্রম, অথবা কবি-কল্পনার নানা ভঙ্গির একটা ঋতুপর্য্যায় আবিষ্কার করিয়া, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের কেরানিমাত্র—তাঁহারা সাহিত্য-পণ্ডিত হইতে পারেন, সাহিত্য-রসিক নহেন। কারণ, সাহিত্যের যাহা সার অংশ তাহার ইতিহাস নাই, কালপ্রবাহে যে ক্ষণগুলি পরস্পরকে দ্রুত অনুধাবন করিয়া চলিয়াছে, এবং যাহাদের মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রমশৃঙ্খলা আছে, সেইরূপ কোনও ক্ষণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্ম-ক্ষণ নহে; সে সাহিত্যের জন্ম হয় মাহেন্দ্রক্ষণে, এবং যিনি তাহার স্রষ্টা তিনিও ক্ষণজন্মা।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ যে অর্থে বিগত হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্য সে অর্থে বিগত হয় নাই; বরং আজিকার বাংলা-সাহিত্যের যে অবস্থা—রবীন্দ্রনাথের মতো ঐরাবতও যে অবস্থায় স্রোতোমুখে নিরুপায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছেন—সেই অবস্থায়, বঙ্কিমচন্দ্রকে সেকাল হইতে একালে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, এই মৃতকল্প সাহিত্যের বলাধান হইতে পারিত; কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। আমি যে ক্ষণজন্মা পুরুষের কথা বলিয়াছি, বাংলা-সাহিত্যে সেইরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ যে কয়জন জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা আজিও জাত-সাহিত্যিক ছাড়া সকল শিক্ষিত ও ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন বাঙ্গালীই স্বীকার করিবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, খুব বড় যে সাহিত্য, তাহা কালস্রোতের ঊর্দ্ধে বিরাজ করে; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, সকল সাহিত্যই দেশ কাল ও জাতির

বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করে। কবিমানসের যে উপলব্ধি, তাহা এমনই পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ যে, দেশ কাল জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ তাহার বাধা না হইয়া, তাহাকে রূপ দিবারই সহায়তা করে। সেই রূপের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহা বাহিরের এই উপাদানের জন্যই ঘটে—এবং কবির অন্তরস্থ প্রেরণা এতই উজ্জ্বল যে, ভাব ও এই রূপের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটে না। এইরূপ পূর্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রতিভার যাহা-কিছু রচনা, সে সকলের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি সুসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যে, মনে হয়, এই ব্যক্তি যেন কোন্ পরমক্ষণে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত একটা কিছুকে সমগ্রভাবে লাভ করিয়াছে—তারপর তাহার সেই উপলব্ধির যত কিছু বিচিত্র বাণীসৃষ্টি, তাহা সেই কেন্দ্রগত জ্যোতি-র্বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে এইরূপ স্বপ্রতিষ্ঠ ও সম্যক্‌দ্রষ্টা কবিমনীষী এ পর্য্যন্ত একটিরই আবির্ভাব ঘটিয়াছে—সে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই; সে পরিচয় একবার রীতিমত আরম্ভ হইলে কখনও শেষ হইবে না—বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের প্রবর্ত্তক, সে যুগ বাঙালী জাতির ভবিষ্যতের বীজরূপে এখনও কালগর্ভে নিহিত আছে।

আজ বিংশ-শতাব্দীর এই যুগে বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমের এই পরিচয় কি? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক, সেকালের সেই অপরিপুষ্ট সাহিত্যের অতিশয় সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে যৎকিঞ্চিৎ রসসৃষ্টির পরিচয় আছে; সার্ ওয়াল্‌টার স্কটের উপন্যাসাবলীর মতই সেগুলি অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জন করিতে পারে,—হয়তো তাহাও পারে না, কারণ, আজিকার অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকারাই সাহিত্যরসে অধিকতর প্রবীণ। একালের যে তিনজন মহাপ্রতিভাশালী লেখকের মতামত সাহিত্যিক মাত্রেই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নানা সময়ের নানা উক্তি এইরূপ ধারণারই সমর্থন করে। ইঁহাদের মধ্যে একজন, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের পূর্ব্বসূরিগণের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম রবীন্দ্রনাথকে ও পরবর্ত্তীরূপে আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এ সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্তই পক্ষসমর্থনের মত হয়; বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে সেরূপ কাজ আদৌ রুচিকর নহে। একালে রুচি ও রসবোধের যে বিকাশ, এবং সাহিত্য-সমালোচনার যে পদ্ধতি দেখা যাইতেছে—বড় বড় পণ্ডিতগণ যে ভাবে এই রুচির জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র

কেন, যে কোনও শক্তিমান লেখকের সম্বন্ধে সাহিত্য-নীতিসম্মত আলোচনা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্ত্তি যে তাঁহার উপন্যাস, তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় যে তাহাতেই আছে—অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলির মূল্যেই তাঁহার কবি-প্রতিভার মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাস-লেখকই নহেন। স্কট, জর্জ্জ এলিয়ট্, ডিকেন্স, থ্যাকারে, মেরিডিথ, হার্ডির সঙ্গে তুলনা করিয়া, অথবা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নবতন আদর্শ ও নব্যতম ভঙ্গিমার মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া লইলেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস, নভেল, রোমান্স প্রভৃতির আকৃতি-প্রকৃতি—এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতির সূত্র ধরিয়া, কতকগুলি বাঁধা ফরম্যুলার সাহায্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্য-গুলিকে কেবল পুঁথি-পড়া করিয়া বিদায় করিলেই চলিবে না। কারণ, ইহাই আধুনিক সমালোচনাশাস্ত্রের নীতি যে, উৎকৃষ্ট মৌলিক সৃষ্টির জাতিবিচার চলে না—তাহার যে জাতি সে তাহারই, আর কাহারও সহিত তাহার জাতি-সম্পর্ক নাই; তাহাকে বিচার করিতে হইবে তাহারই আদর্শে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেই হেতু তিনি ঔপন্যাসিক, অতএব, তাঁহার গ্রন্থগুলিতে উপন্যাস-রসরসিক পাঠকের রুচি ও কলাকুতূহলী চিত্ত কতখানি তৃপ্ত পায়, ইহাই দেখিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কোনও কথাই অবান্তর—এমন পণ করিয়া বসিলে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সকল আলোচনাই নিষ্ফল হইবে। উপন্যাস তো সকলেই লেখে, আজকাল রামা-শ্যামাও উপন্যাস লিখিতেছে, এবং প্রায় সকলেই, অন্তত বঙ্কিমের চেয়ে, বড় আর্টিষ্ট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে কলেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলেরই এই মত; সাহিত্যিক প্রগতিবাদীরা যে সকল প্রতিভার আগমনী-গান করিতে-ছেন, এবং তাহার ফলে সাহিত্যের যে ষ্টাইল ও উপন্যাসের যে আদর্শ জয়যুক্ত হইতেছে, তাহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক সমালোচনার এই প্রবৃত্তি দেখিয়াই আমাকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইয়াছে।

আমি জানি, একথা অনেকের মনঃপূত হইবে না; এজন্য আমার বক্তব্য আর একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা প্রয়োজন। বঙ্কিম-প্রতিভার সাহিত্যিক বিচারই

আমারও অভিপ্রায়, যে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান এতটুকু নামিয়া যাইবে না; আমিও কবি-বঙ্কিমের কথাই বলিতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকই বটেন, কিন্তু তাঁহার সেই উপন্যাসের প্রেরণা অতিশয় স্বতন্ত্র; সেই প্রেরণার দিক দিয়া না দেখিয়া—কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট সাহিত্য-কলার দিক দিয়া দেখিলে, তাহার রসাস্বাদনেও যেমন বাধা ঘটিবে, তেমনই একজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তির ব্যক্তি-মানসের সহিত পরিচয় করা যাইবে না।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—'Style is the man', কথাটা একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সৃষ্টি; এই কথাটিই আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় সর্ব্বপ্রথম যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মত বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধেও এই উক্তি সত্য, এবং অতিশয় যথার্থভাবে সত্য। প্রত্যেক সাহিত্য একটি বিশিষ্ট সাহিত্য, তাহার বাণী তাহারই। এই বাণী কথাটিও বাংলায় একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। প্রথমত, ভাষা অর্থেই বাণী নয়; আবার অধুনা-প্রচলিত অর্থে বাণী বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও নয়—অর্থাৎ, কোনও মত, উপদেশ বা মূল্যবান উক্তি নয়। ভাব যখন ভাষায় রূপপরিগ্রহ করে, তখনই তাহাকে বাণী নাম দিব। ভাবের এই যে বাঙ্ময় রূপ বা বাণী, ইহা সম্ভব হয়—যখন সেই ভাব ব্যক্তিবিশেষের ভাব, অতিশয় মৌলিক ও স্বতন্ত্র; এই বাণী ব্যক্তিরই আত্মপ্রকাশ—ইহারই নাম ষ্টাইল। এক ব্যক্তির যে বাণী, তাহার বিস্তার ও বৈচিত্র্য যেমনই হউক, তাহা সর্ব্বত্র এক, তাহার সমগ্র রচনাই একই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। এক ভাষার সাহিত্যে এইরূপ বহু বাণী থাকে—প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র ষ্টাইল, এক একটি ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যদি পূর্ণবিকশিত হইয়া থাকে, তাহার সমস্ত ভাব চিন্তা কল্পনা যদি সেই একটা ব্যক্তি-কেন্দ্রে সুসমাহিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সকল রচনায় সেই এক ষ্টাইল পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে—তাহার সেই মানসপদ্মের দলবিস্তারে কেন্দ্রটি হারাইয়া যাইবে না; পুষ্প যতই নব-নব দলে বিকশিত হউক, তাহা সেই বৃন্তটিরই চতুষ্পার্শে মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিবে। এই জন্য উৎকৃষ্ট প্রতিভার যাবতীয় বাণী সেই একই ব্যক্তির একই ভাবের প্রকাশ, এবং তদ্‌রচিত সমগ্র সাহিত্যকে একটি ষ্টাইল বলিতে হইবে।

এই অর্থে যে ষ্টাইল, তেমন ষ্টাইল বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমের তুল্য আর কুত্রাপি নাই। অন্যান্য ছোট-বড় লেখকের লেখায় যে ধরণের ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়,

তাহা অনেক সময়ে একটা বহির্গত বস্তু; তাহার পরিধিও যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনই তাহাকে একটি বিশিষ্ট টেক্‌নিক্‌-ভঙ্গিও বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তিত্বের কথা আমি উপরে বলিয়াছি, সেই ব্যক্তিত্বের মূলগ্রন্থি খুব বড় লেখকের সাহিত্য, সৃষ্টিতেও বার বার ছিঁড়িতে ও নূতন করিয়া জোড়া লাগিতে দেখা গিয়াছে—লেখক যেন তাঁহার জীবনে কখনও আত্মস্থ হইতে পারেন নাই। যাঁহারা সাহিত্য-কলা-বিলাসী, তাঁহাদের এই ব্যক্তিত্ব অতিশয় দুর্ব্বল,—নানা রং, রূপ ও আলোর নিত্য নব-আকর্ষণে তাঁহাদের আত্মা বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ভাবের পরিধি যদি সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা হইলে একপ্রকার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় বটে; কিন্তু ভাবের লীলা যদি অফুরন্ত হয়, তাহা হইলে তাহার মূলগ্রন্থি যেমন শিথিল হইয়া যায়, তেমনই, সেই প্রতিভা আপন ব্যক্তিত্বকে বার বার খণ্ডিত করে। বঙ্কিম-সাহিত্যের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবের বিচিত্র ও পূর্ণতম বিকাশ সুস্পষ্ট হইয়া আছে; তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনার মধ্যে সেই এক ব্যক্তি, এক ষ্টাইল জাজ্বল্যমান—বঙ্কিম নামক ব্যক্তি-কেন্দ্রে একটি ভাব-জগৎ সকল দিকে পূর্ণমণ্ডলায়িত হইয়া রহিয়াছে। এই ব্যক্তিগত অথচ সমগ্র-দৃষ্টিই তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণ লক্ষণ; ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'সাম্যে'র বঙ্কিমচন্দ্র একই ব্যক্তি। জীবনকে খণ্ডিত করিয়া তাহার অংশবিশেষে সাহিত্যিক কলা-কুতূহলতৃপ্তি সে প্রতিভার প্রবৃত্তি নহে। এই জন্যই, আমি ষ্টাইল কথাটা লইয়া এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম, তাহা এই প্রসঙ্গে অবান্তর নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা যে কোন্ শ্রেণীর তাহা বুঝিতে হইলে আর একটা কথাও এ স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা আজকাল যাহাকে আর্ট বলি—যে সাহিত্যনীতির দোহাই দিয়া থাকি, এবং যাহার অনুশাসনে—একদিকে যেমন রোমান্টিকের উপরে রিয়ালিষ্টিকের জয় ঘোষণা করি, তেমনই অপর দিকে সাহিত্য হইতে সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বহিষ্কার করিতে চাই, সেই আর্ট প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যকে খর্ব্ব করে, সাহিত্যে মানব-চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। জীবনই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, সেই জীবনের কোনও রূপ যখন বাণী হইয়া উঠে তখনই তাহা সাহিত্য হয়; প্রথমে ইহাই হওয়া চাই। পরে, আমরা যখন সেই বাণীরূপের কৌশল পৃথকভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, তখন

আর্ট সম্বন্ধে সজ্ঞান হই—আর্ট আগে, পরে সাহিত্য নয়। জীবনকে যে দেখে নাই, সে সাহিত্যে সেই জীবনের প্রকাশকে বুঝিবে কেমন করিয়া? ষ্টাইলেরই বা সে কি বুঝিবে? কতকগুলি সুপরিচিত, সহজবেদ্য *emotion*-কে কলা-কৌশলে বাণীরূপ দিবার শক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার লক্ষণ নয়; জীবনের একটা খণ্ডকে লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা *good art* হইতে পারে—*great art* নয়; এবং জীবন বলিতে যতদূর সম্ভব একট সমগ্র ভাব বা সমগ্র দৃষ্টির কথাই মনে রাখিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার মত করিয়া, তাঁহারই দৃষ্টি দ্বারা, এই জীবনের একটা সমগ্র-রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং সে কল্পনা বাস্তবের সহিতই বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিল। জীবনের খণ্ড-সমস্যা নয়, আজকাল যাহাকে সমস্যা বলা হয় সেই সমস্যা নয়,—তাঁহার ভাব-কল্পনার পরিধিতে যে সমগ্র-বাস্তব বৃহৎরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া একটি সুসমঞ্জস রূপে পুনঃসৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাঁহার সমগ্র সাহিত্য ইহারই প্রকাশ। উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সজ্ঞান আর্ট-সাধনা ছিল না—জীবনকে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাহার খণ্ডরূপের রসোদ্ঘাটনই তাঁহার সাহিত্যিক ধর্ম্ম ছিল না। জীবন ও জগতের যে রূপ তিনি আত্মগোচর করিয়াছিলেন, তাহাই বীজরূপে তাঁহার কল্পনায় অঙ্কুরিত হইয়া সপল্লব শাখাকাণ্ডে একটি বৃহৎ সুঠাম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল। এই বৃক্ষের মূল কুত্রাপি মৃত্তিকার আশ্রয় ত্যাগ করে নাই, ইহার শীর্ষদেশ ঊর্দ্ধমুখী হইলেও, কখনও শূন্য ব্যোমকে আকাঙ্ক্ষা করে নাই। তিনি সেই জীবনকে যে কাব্যগুলিতে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহারা Romanticও নয়, Realistic ও নয়—পুরুষের প্রবুদ্ধ চেতনায় বাস্তবের যে সর্ব্বাঙ্গ-শোভন রূপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, তাহারই একটি ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভঙ্গি সেগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে অতিশয় বাস্তবরূপেই দেখিয়াছিলেন—রস-ব্রহ্মের সাঙ্কেতিক প্রকাশরূপে নয়, নীতিনিয়মহীন জড়বাস্তবরূপেও নয়। তাঁহার জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনই জীবন্ত। সে জগৎ সুন্দর বলিয়াই তাহার মূলে একটা নীতি বা ধর্ম্ম আছে, কারণ নীতিই সকল সৌন্দর্য্য—সকল মহিমা ও সুষমার নিদান; এই নীতির ঊর্দ্ধে আর কিছুকে স্থাপন করিবার প্রয়োজনও নাই। সেই নীতির পূর্ণলীলার বিগ্রহ যে মানুষ, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও অলৌকিক সত্তা বা পরলোকের ভাবনাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। এই যে মনোভাব—ইহা নিশ্চয় বিশুদ্ধ দর্শন বা বিজ্ঞানের

মনোভাব নহে; আবার যে সুসঙ্গত ভাব-চিন্তার দ্বারা তিনি এই মনোভাবকে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন তাহাও কবিজনোচিত রসাবেশের লক্ষণ নয়। ইহার কি নাম দিব? কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিদ্, ঐতিহাসিক—তিনি খাঁটি কোনটাই নহেন; বরং ইহাই বলিতে হয় যে, এখানে এমন একটি দৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে মানব-মানসের বিভিন্ন বৃত্তি একযোগে কাজ করিতেছে—বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়সাধন হইয়াছে। জীবনের যে বাস্তব-রূপ মানুষকে চিরদিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, সেই বিরাট দুর্জ্ঞেয় দুঃসহ বাস্তবের সম্মুখীন হইবার সাহস বা শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই বঙ্কিমচন্দ্রকে অবাস্তব-ভাববিলাসী বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করে, এবং বাস্তবের নামে অবাস্তব সাহিত্য রচনা করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে আধুনিক রসিকমণ্ডলীর অভিযোগ এই যে, তাহাতে প্রবল নীতিনিষ্ঠা ও যুক্তিবিরুদ্ধ কল্পনা, এমন কি অলৌকিক ও অপ্রাকৃতও স্থান পাইয়াছে। এই অভিযোগের কোনটি তথ্যহিসাবে মিথ্যা নয়; এবং তত্ত্ববিচারের দ্বারা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলেও কোনও ফললাভ হইবে না। কারণ, সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহা প্রধানতঃ তত্ত্বঘটিত নয়, রুচিঘটিত; রসের কথাটা অনেক সময়েই অবান্তর—রসের ধার খুব কম লোকেই ধারে। রুচি ও রসজ্ঞান এই দুইটি প্রায় একসঙ্গে অবস্থান করে না—রসজ্ঞানশাসিত রুচি ও রসজ্ঞানবর্জ্জিত রুচি, এ দুইয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। জীবনকে দেখিবার ভঙ্গি সাধারণ রসিকের একরূপ, আর্টতান্ত্রিক সাহিত্যবিলাসীদের একরূপ, এবং ভাবুক, মনস্বী, অথচ রসরসিক পুরুষের আর একরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র যে রসিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় আজিকার অধ্যাপকেরাও স্বীকার করিবেন; এবং ভাবকে ভাষায় রূপ দিবার শক্তি যে তাঁহার ছিল, এ কথা ছাত্রসভায় স্বীকার না করিলেও, মনে মনে বোধ হয় স্বীকার করেন। বাকি দাঁড়াইতেছে এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের একটা অর্থ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তথাকথিত আর্ট লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন না। ইহাতে যদি কোনও অভিযোগের কারণ থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তাহা যে রুচিঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবনবাদ তাঁহার কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তিনি যে কত বড় কবি তাহা স্বীকার করিবার মত রসজ্ঞানী রসিকের অভাব পূর্ব্বেও যেমন হয় নাই, পরেও হইবে না; কোন বড় কবির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সাক্ষাৎভাবে আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ, সে প্রতিবাদ নিষ্ফল। রসবোধ যুক্তির চেয়ে বড়, সেখানে যুক্তির প্রয়োজনই হয় না; কিন্তু রুচি যদি মানুষের প্রবৃত্তির মত—রিপুর মত—অন্ধ ও প্রবল হইয়া উঠে, এবং সেই সঙ্গে মহামূর্খতাকে পরম পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত একটি সমাজের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি কোন তর্ক চলে না; আরও কারণ এই যে, আজিকার দিনে এইরূপ পাণ্ডিত্যই অতিশয় সুলভ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে শুধুই রসিকতা নয়, রসজ্ঞানেরও উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। নিছক কাব্য-রসের আস্বাদনে আমাদের যে বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহার সঙ্গে জীবন বা জগৎ-সমস্যার কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম—যিনি জীবন-সত্যকে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন; জীবনের সহিত সেই বোঝাপড়ার ভার তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্রের উপরে বরাত দিয়া তাহাকে কাব্যসাহিত্য হইতে দূরে রাখেন নাই। কিন্তু কবিমানসের এই যে জীবন-জিজ্ঞাসা ইহাও রূপরসপ্রধান—ইহারও মূলে আছে অপরোক্ষ অনুভূতি, অতএব ইহা উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার পরিপন্থী নহে। ইহাকে রসিকতা না বলিয়া রসজ্ঞান বলিয়াছি এই জন্য যে, এইরূপ প্রেরণায় ব্রহ্মাস্বাদের পিপাসা নাই; ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে এই জগৎসৃষ্টিই সর্ব্বদা সমক্ষে বিদ্যমান থাকে, এবং তাহারই রহস্যভেদজনিত একটি আস্বাদ কবিচিত্তে আনন্দ দান করে—এখানে শুধু আনন্দ নয়, সেই আনন্দের হেতু সম্বন্ধেও সজ্ঞানতা থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা জগৎ ও জীবনকে অতিক্রম করিতে চাহে নাই, তিনি জীবনের বাহিরে আর কিছুকে স্বীকার করেন নাই; তাঁহার আধ্যাত্মিকতাও সম্পূর্ণ আধি-ভৌতিক, এজন্য খাঁটি হিন্দুয়ানির দিক দিয়া তিনি নাস্তিক ছিলেন। আবার এই জীবনের বাস্তব-গভীর সমস্যাকে রসবাদী আর্টিস্টের মত—পাশ্চাত্য সংশয়বাদীর মত, অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার মত প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না; তাই আর এক অর্থে তিনি ঘোরতর আস্তিক; এই আস্তিকতার জন্যই তিনি সাহিত্যে নীতি-পরায়ণতার অপরাধে অপরাধী। জীবনের প্রতি যাহাদের সত্যকার শ্রদ্ধা নাই, আপন আত্মারও প্রতি যাহাদের আস্থা নাই, তাহারাই বাস্তববাদের নামে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কলরব করিয়া থাকে।

রসের বিচারে কোনরূপ ফিলজফি বা মতবাদের পৃথক মূল্য নাই তাহা জানি, কিন্তু ইহাও সত্য যে, উৎকৃষ্ট কবিপ্রেরণার যে বাণী, তাহাতে জীবন বা ভাগবত সৃষ্টির সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে ; এই উপলব্ধির নানা রূপ আছে। শেক্সপীয়রের নৈর্ব্যক্তিক কল্পনায় মানুষের ভাগ্য ও জগৎবিধানের কোনও সুস্পষ্ট অর্থ ধরা না পড়িলেও, মহাকবির একটা মনোভাব তাহার মূলে নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে। সেই মনোভাবের প্রকাশ-ভঙ্গি হইয়াছে নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে যে জগৎ-সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে, একরূপ মনোভাব এক নূতন সাহিত্যিক রূপ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—অলঙ্কার-শাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আমরা সেই রূপকে উপন্যাস নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। তাঁহার অপরাপর রচনায় যে সজ্ঞান চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি আছে, তাহাও সেই এক ভাবদৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—সে যেন সেই একই ভাবানুভূতির টীকা-ভাষ্য। বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা এই দুইয়ের এমন আশ্চর্য্য একমুখিতা সচরাচর দেখা যায় না। পূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তিনি আপনার মধ্যেই যেন তাহার কতকটাকে পাইয়াছিলেন। ইহা যে তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্বেরই একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ—কোনও তত্ত্ব বা চিন্তাগ্রন্থি নহে, তাঁহার উপন্যাসগুলিই তাহার প্রমাণ। কারণ, চিন্তামাত্রেই বিশ্লেষাত্মক, তাহা দ্বারা রূপসৃষ্টি হয় না ; সকল তত্ত্বই নিরাকার—তত্ত্বও ভাবরূপেই অপরোক্ষ হয় ; এবং যখন সেই ভাব রূপধারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখনই তাহা সেই শক্তির বলে সৃষ্টির সত্যে পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে, বা আখ্যা-পত্রের উপরে নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া, তিনি যে তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই আখ্যানমুখে, ভাবকল্পনার অবারিত বেগে, জীবনের পটভূমিকার উপরে রঙে ও রেখায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল এমনই একটি শরীরী চিন্তা ; তথাপি কে বলিবে, সে একটি রূপক মাত্র—জীবন্ত নারীমূর্ত্তি নহে ! 'আনন্দমঠ' এমনই একটা ভাবচিন্তার বাণীরূপ—শুধু তাহাই নহে, একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাব-সত্যকে, তিনি এই দেশের জল মাটি আকাশ ও অরণ্যের পরিবেশে, এবং এই জাতির মজ্জাগত সংস্কারের অনুকূল করিয়া, কি জীবন্ত জগৎরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ! আমি এখানে তাঁহার কল্পনা বা সৃষ্টিশক্তির কথাই বলিতেছি না—সে কবিত্বের যে নিদর্শন তাঁহার কাব্যে আছে, তাহা সকল শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই

গৌরবজনক; এখানে আমি কেবল ইহাই বলিতেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যকীর্ত্তির মূলে ছিল যে প্রেরণা তাহা কোনও চিন্তা বা মতবাদের প্রেরণা নহে; তাহা সেই পূর্ণ দৃষ্টি—যাহার বলে, ভাব ও রূপ, তথ্য ও তত্ত্ব, বাস্তব ও আদর্শ এক হইয়া যায়, রসপিপাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনও বিরোধ আর থাকে না।

এই যে প্রতিভা—ইহা এমনই স্বতন্ত্র যে, ইহার বাণী সাহিত্যবিচারে একটা নূতন আদর্শ ও নূতন রুচির দাবী করিতেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে একটা জীবন-বাদেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সে জীবনবাদের একদিকে আছে প্রত্যক্ষের উপাসনা—যাহা আছে তাহা ছাড়া আর কিছুকে স্বীকার না করিয়া, তাহারই ইঙ্গিত-অনুযায়ী পূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধান। অপর দিকে আছে, সেই প্রত্যক্ষকে একটি সমগ্র উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ উৎকণ্ঠার নিবৃত্তিসাধন। প্রথম দিকটির প্রেরণা য়ুরোপীয়; দ্বিতীয়টি ভারতীয় সংস্কারের ফল। তিনি জীবনকে কেবলমাত্র আর্টের অধীন করিয়া দেখেন নাই, মানুষের চরিত্রে অন্ধ নিয়তির লীলাই প্রত্যক্ষ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে রোমান্স-রস আছে তাহার কারণ রসাবেশের অসংযম নহে; অতিশয় স্থিরদৃষ্টিতে জীবনের বাস্তব-মহিমাকে বরণ করিয়া যথাযথ প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষাই তাহার কারণ। এজন্য তাঁহার রচনায় যে নীতিজ্ঞানের প্রভাব আছে, তাহাতে যদিও আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কাব্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। কারণ সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে—ব্যক্তির প্রতিভা; এবং জীবনকেই যে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে সেই তত বড় ব্যক্তি—তাহার যে বাণী তাহাই উৎকৃষ্ট ষ্টাইল, তাহাই GREAT ART; আর সকল আর্ট—আর্ট মাত্র; সে আর্ট মরসুমী ফুলের মত, যেমন চমকপ্রদ তেমনই ক্ষণস্থায়ী। যে সকল কাব্য আদিকাল হইতে মানুষের জীবন-রসে অভিষিক্ত হইয়া আজও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, যাহার বাণী মানুষের প্রাণের আকুল উৎকণ্ঠা নিবারণ করে, যাহার মধ্যে তাহার ভয়-ভাবনা দ্বন্দ্ব-সংশয় একটি পরম উপলব্ধির দ্বারা আশ্বস্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই শ্রেণীর, তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তিও সেই প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাপি, তাঁহার তুলনা তিনিই। বর্ত্তমান যুগে সেই সাহিত্যের যে পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার গদ্যকাব্যগুলি তাহারই শেষ নিদর্শন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্বে,

য়ুরোপীয় জ্ঞান-সাধনা একজন বাঙালীর প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া যে ভারতীয় মনীষাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার ফলে জীবনের বাস্তব যে ধরণের কল্পনায় এক নূতন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে এখনও বিলম্ব আছে।

মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ অবশেষে এই মর্ত্ত্যের মলিনতামুক্ত হইয়া সেই লোকে প্রস্থান করিলেন—'বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'; যেখানে চন্দ্রতারকার ভাতিও ম্লান, বিদ্যুৎ দ্যুতিহীন, অগ্নির তো কথাই নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে মর্ত্ত্যমমতার কথা আমরা জানি, তাঁহার উদয়কালের সেই 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' হইতে অন্তকালের—

> একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
> শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে—

—পর্য্যন্ত, প্রাণের আকুতি ও দীর্ঘশ্বাসের গীতি স্মরণ করিলে আমরাও যেমন সেই জ্যোতির্ম্ময় পরপারের দিব্যস্বপ্নে আশ্বস্ত বোধ করি না, তেমনই খেয়াপারের সেই ক্ষণটিতে রবীন্দ্রনাথও কেমন বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিতে ইচ্ছা হয়। এ ভাবনা দুর্ব্বল মানবচিত্তের ভাবনা;—মানুষ আমরা, এবং এতকাল রবীন্দ্রনাথের অতি গভীর মানবতার কাব্যদুগ্ধধারে আমাদের প্রাণ পুষ্ট হইয়াছে, তাই, আজ মৃত্যুর আলোকে সেই মহামানবের মূর্ত্তি একবার আমাদের চোখ দিয়া দেখিতে চাই। আমরা জানি, মৃত্যুর দ্বারপথে রবীন্দ্রনাথ কোন নূতন পথে প্রবেশ করিলেন না—চিররাত্রির সেই তিমিরাবরণ তিনি অনেক আগেই ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি এই পারে থাকিতেই তমসার ওপার পর্য্যন্ত সেতু রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জানার ভিতর দিয়া তিনি যে অজানাকে জানিয়াছিলেন, মৃত্যুর আবির্ভাবে যখন সেই অজানাকে তাহার সাক্ষাৎরূপে জানিলেন, তখন তাঁহার প্রাণ কি একটুও চমকিত হয় নাই? তিনি অরূপ-অসীমকে রূপের সীমায় দেখিবার সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সকল দেখাই রূপরঞ্জিত ছিল; এক্ষণে তিনি সেই অরূপকে সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপ দেখিলেন? মৃত্যুর সে রূপ কি একটুও ভিন্ন নহে? রবীন্দ্র-কাব্যে, জীবন ও মৃত্যুর স্বারূপ্য-সাধনার যে অপূর্ব্ব গীতিসুর বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিঃশ্বসিত হইয়াছে, আজ সেই সুর আমাদের প্রাণে নূতন করিয়া আরও গভীরভাবে বাজিয়া

উঠিতেছে; আজ রবীন্দ্রনাথ যে-মৃত্যুকে বরণ করিলেন, সে মৃত্যু কি সেই জীবনের দাবীও স্বীকার করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রাণ কি সেই ভাবের শরীরে শরীরী হইয়াই দিব্যধামে পৌঁছিয়াছে? এ প্রশ্ন হয়তো অন্য সময়ে অবান্তর, এমন কি অশোভন—তাঁহার একান্ত নিজস্ব আত্মিক উপলব্ধির সম্বন্ধে আমাদের কোনও কৌতূহল যেমন অনাবশ্যক, তেমনই নিরর্থক; রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনার সেই অপর পৃষ্ঠে—তাহার গূঢ়তম সত্তায়—কোন্ বিশ্বাস, কোন্ ধ্রুব-জ্ঞান কি ভাবে বিদ্যমান ও বিকাশমান ছিল, সেই অপ্রকাশকে জানিবার শক্তিও আমাদের নাই—অধিকারও নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনের যে প্রকাশের দিকটি দেখিয়াছি, যাহা আমাদের এই মর্ত্ত্যসংস্কার-মলিন প্রাণকেই আশ্বস্ত ও উজ্জীবিত করিয়াছে, তাহার অবসান ও পরপারের সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে প্রবেশ, এই দুইয়ের মধ্যে—লোকান্তরের মত—ব্যক্তিত্বেরও একটা রূপান্তর কল্পনা করিয়া, মর্ত্ত্যের সহিত অমর্ত্ত্যের ব্যবধান বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না; সেই মৃত্যুর ছায়া, রবীন্দ্র-কাব্যের আলোকে আলোকিত আমাদের চিত্তপ্রাঙ্গণে পড়িয়া, যে ভাবের উদ্রেক করিতেছে—আজ তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

২

সেদিন কবির শ্রাদ্ধবাসরে যখন সেই ঋষিমন্ত্র পাঠ হইতেছিল—'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—তখন কবির নিজের রচিত আর একটি মন্ত্র আমাদের প্রাণে আর এক ভাবের উদ্রেক করিতেছিল—

ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার হউক অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়,
তোমারি হউক জয়॥

—এখানে, পৃথিবীর মলিন আলোক অপসারিত করিয়া, অপ্রকাশের তিমির-তোরণ ভেদ করিয়া যাহার প্রকাশকে কবি বন্দনা করিতেছেন, তাহা যে এই বায়ু, জল, ওষধি ও পার্থিব রজঃ প্রভৃতিকে মধুমৎ করিয়া তুলিবার সেই একই অমৃত-আলোক-ধারা—এ আশ্বাস আমাদের প্রাণে জাগে না। এ গান শুনিয়া মনে হয়, জীবনের কক্ষে শতদীপ জ্বালিয়া আমরা বাহিরের অন্ধকার রাত্রিকে যতই ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি না কেন, জীবনের সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণের পথে, সেই মৃত্যুই দুর্জ্ঞেয় রহস্যপুরীর প্রাকারতলে, নক্ষত্রশলাকাখচিত বিরাট তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন যে তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়ের প্রার্থনা আত্মার আর্ত্তরবের মতই উত্থিত হয়—'মৃত্যুর হোক লয়' বলিয়া মৃত্যুর যে রূপকে স্বীকার করিতে হয়—মনে হয়, তাহা হইতে ঋষি অথবা কবি কাহারও নিষ্কৃতি নাই। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থান-গীতিও চিরযুগের মৃত্যুভয়-পীড়িত মানুষের অন্তিম আকুতি-স্বরে ভরিয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে উৎসবশালায় তিনি স্বহস্তে অসংখ্য দীপ জ্বালিয়াছেন, স্বরচিত বিচিত্র কুসুমমাল্যে আমাদের ললাট ভূষিত করিয়াছেন, সেই উৎসবশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন তিনি বাহিরের অন্ধকারে পদক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার দূরাগত কণ্ঠের আর এক গীত আমরা এখানে বসিয়া শুনিলাম—

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চির সাথী
লও লও ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার॥
হয় যেন মর্ত্তের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥

—তাহাতে আমাদের উৎসবশালার এই দীপাবলী আর তেমন উজ্জ্বল বোধ হয় না। তখন আমাদের সেই উৎসবনায়ক রবীন্দ্রনাথকে সেই মহা-অজানার সম্মুখে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্তরের অভয় কামনা করিতে শুনি, তাহাতে মনে হয়, জীবনেই মৃত্যুকে জয় করিবার যে সাধনাই করি না কেন, জীবিতের চক্ষে

মৃত্যুর আবরণ ঘোচে না—মৃত্যুর সেই জলজ্জটাকলাপ জীবনের আলোককে উপহাস করিয়া, আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া, অন্ধকারকেই অন্ধতর করিয়া তোলে; মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয় না হইলে, অসীমের পথে সেই অন্ধকার পার হইবার ধ্রুবতারাটির সন্ধান মেলে না। কবি যে 'বন্ধন-ক্ষয়ে'র কামনা করিলেন, তাহাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, দেহের ইন্দ্রিয়-বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার মনের সেই মণিপদ্ম, রূপ-রস-স্পর্শের বর্ণ, গন্ধ ও মধুর যে অশেষ আনন্দে দলে দলে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সকল সংস্কার, মৃত্যুর সহিত মুখামুখী হইবার কালে, তিনি মোচন করিতেই চাহিয়াছিলেন? একদিন যে গাহিয়াছিলেন—

> তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ,
> তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
> আছে কত সুরের সোহাগ তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
> সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন।
> সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য,
> আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বাললো॥

—আজ এই মুহূর্ত্তে সে কথা কি তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন! কবির প্রাণ কি তখন 'কান্নাহাসির দোল-দোলানা পৌষ ফাগুনে'র সকল মোহ দূর করিয়া —নিজের সেই অপরিমেয় প্রাণ-বহ্নির নির্ব্বাণ কামনা করিয়া—স্নিগ্ধ শীতল শান্তি-পারাবারে তরী ভাসাইবার জন্য, মুক্তিদাতা কর্ণধারকে ডাক দিল—তাহারই ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করিল! এত সাধ ও সাধের জীবন পিছনে পড়িয়া রহিল; যে কণ্ঠ অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া গানে গানে আলোকের উৎস অবারিত করিয়াছিল, সে কণ্ঠ শুধুই নীরব হইল না—গানের সেই স্বরও ভুলিয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে গম্ভীর বেদগাথার মতই উদ্গীত তাঁহার সেই স্বরচিত গানগুলির মধ্যে, অনন্তের পথে সেই দেহমুক্ত আত্মার যে যাত্রী-বেশ মানস-চক্ষে দেখিতে পাইলাম, তাহা জীবনের নিকট বিদায় লওয়ার বেশ; মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরাদির যে মহাপ্রস্থান-বেশ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাও সেই বেশ। এই মহাযাত্রার পথে পশ্চাতের আকর্ষণ এতটুকু থাকিবার যো নাই— সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে হয়, সকল মমতা, সকল মোহ জয় করিতে হয়।

কবি এইখানে থাকিতে যে আলো দুই চক্ষে ভরিয়া লইয়াছিলেন, সে আলোকে মৃত্যুর পথ আলোকিত হইল না; গানের সহস্র ফুলে যে মালা গাঁথিয়াছিলেন, সেই মালার কথাও মনে রহিল না; পৃথিবীর আর কোন কবির জীবনে যে আনন্দ এমন নিরবচ্ছিন্ন গীতময় হইয়া উঠে নাই, সেই আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডারও খেয়াপারের কড়ি যোগাইল না। যখন, সেই চরম মুহূর্ত্তে, কবির মুখ হইতে, সকল যুগের সকল মানবের সেই এক আর্ত্ত আবেদন, কম্পিত কণ্ঠে, নিরাভরণা বাণীর বেশে, বাহির হইয়া আসিল—

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

তখন, শোকস্তব্ধ হৃদয়কে বারবার কেবল এই কথাই বলিলাম—

সকল অভ্যাসহারা সর্ব্ব আবরণ ছাড়া
সদ্য শিশুসম
নগ্ন-মূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম'।

৩

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-সাধনায় মৃত্যুকে কখনও ভোলেন নাই, বরং জীবন ও মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার সাধনাই তাঁহার কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। মানুষ যাহার কথা চিন্তা করিতে ভয় পায়, আমাদের যাবতীয় মর্ত্ত্যসংস্কার যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,—যাহার বর্ণনায় সকল কালের সকল কবির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, এবং গান রোদন হইয়া উঠিয়াছে,—রবীন্দ্রনাথ সেই মৃত্যুকে বারংবার যে সঙ্গীতে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্যথাও সুখ হইয়া উঠে, হর্ষ ও বিষাদ একই অশ্রুজলে বিগলিত হয়। কবি জীবনকে ভালবাসিতেন বলিয়াই—যে-মৃত্যু সেই জীবনেরই পরিণাম, তাহাকে একটা সর্ব্বনাশ বা মহাশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, করিলে জীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। জীবনকে শুধুই ভোগ করা নয়—সেই ভোগ যে একটা মোহ, তাহার মূলে যে কেবল অন্ধ ইন্দ্রিয়-চেতনাই আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে বাধিত বলিয়াই তিনি জীবনের সহিত মৃত্যুর সঙ্গতি-সাধনে এমন উৎসুক ছিলেন। এই ভাব-সাধনায়

তিনি জীবন ও মৃত্যুর অভেদ উপলব্ধি করিতেই প্রয়াস পাইতেন; কখনও বা, জীবন হইতে জীবনে আত্মার প্রয়াণ-লীলায়, মৃত্যু একটা ক্ষণচ্ছেদ মাত্র, ইহাই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইতেন। জীবনের দেবতা যিনি, মরণের দেবতাও তিনি —ইহা না হইয়া পারে না; অতএব জীবনে যিনি এত স্নেহময়, এত সুন্দর, মরণে তিনি অন্যরূপ হইবেন কেমন করিয়া?—

যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

কিংবা—

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

অথবা—

জীবনে ফুল-ফোটা হ'লে মরণে ফল ফল্‌বে

এবং—

মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণ-পুটে,
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে—
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

—এত বড় আশ্বাস ও বিশ্বাস যাহার, মৃত্যু তাহাকে বিচলিত করিবে কেমন করিয়া? যদি বা তাহার সেই আঘাত, দেহ-বিচ্ছেদের সেই যাতনাও স্বীকার করিতে হয়, তাহাও ক্ষণিক—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে কবির এই যে মনোভাব, ইহার কারণও খুব স্পষ্ট। অতি

গূঢ় ও গভীর জীবন-রস-পিপাসাই এই মনোভাবের কারণ। কবির নিকটে মৃত্যুর কোন পৃথক সত্তা নাই এইজন্য যে, আত্মার অমরত্ব—জীবনের বাহিরে, মৃত্যু নামক কোন সীমানার অপর পারেই—আরম্ভ হয় না। যে-চেতনা অমরত্বের অনুষঙ্গী তাহা কোন নির্ব্বিকল্প কৈবল্যের অবস্থা নয়, সীমা ও অসীমার মিলন-ভূমি—এই অপরূপের নাট্যশালায় সেই অমরত্বের নিত্য আস্বাদন হইয়া থাকে; আত্মা অমর এই অর্থে যে, সে—রূপ হইতে রূপান্তরে—সেই রস-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবে না। সেইজন্যই জীবনের শেষ নাই; এই রূপের খেলাও যেমন অনন্তকাল চলিতে থাকিবে, তেমনই, সেই খেলার সঙ্গী বা চেতন-সহচররূপেই আত্মার আত্ম-চেতনার কথনও লয় হইবে না। ইহার কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা না করিয়া, একটা স্থূল অর্থ করিলেই চলিবে—এবং সহজ মানবতার দিক দিয়া তাহা সত্যও বটে। সে অর্থ এই যে, কবি এই জগৎ-দৃশ্যের বাহিরে কোন অস্তিত্বের কামনা করিতেন না—সেইজন্য, সেই কামনারই রঙে রঙিন হইয়া মৃত্যুও তাঁহার নিকটে মনোহর হইয়াছিল। জগতের রস-রূপ এতই মনোহর যে, এ রূপের সঙ্গ ত্যাগ করিতে কখনও তাঁহার মন সরে নাই। যে ব্যক্তিত্বের বৃন্তবন্ধনে রূপের এই মধুসৌরভময় সহস্রদল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই ব্যক্তিত্বের লয় যদিও বা মনে উদিত হইত, মহানির্ব্বাণের বর্ণহীন তাপহীন জ্যোতিঃ-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার ইচ্ছা হইত,—তথাপি, তখনও সেই অকূল পারাবার অপেক্ষা জীবনের এই তটভূমি, এই জগৎ, সুন্দরতম বলিয়া বোধ হইত, এবং মৃত্যুকেও জীবনের সুহৃদ বলিয়া মনে করিতে বাধিত না। যখন—

আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই,

তখন—

ভুবন বলে তোমার তরে
আছে বরণ-মালা,
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে,
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই॥

এই কামনাকে, এই প্রেমকেও, তিনি শোধন করিয়া লইয়াছেন—পরমার্থ-লাভের সহায়রূপে ; এই রূপরসচর্য্যাকেই তিনি আত্মার সহিত মিলন বা আত্মোপলব্ধির একমাত্র পন্থা বলিয়া বার বার নিজেকে আশ্বস্ত করিয়াছেন—

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্ব ভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা ॥

অতএব, যে প্রবল কামনা মৃত্যুকেও জয় করিতে চাহিয়াছে—সে কামনা জগতেরই এই রূপরস-সম্ভোগের কামনা। মৃত্যুও সেই কামনার জোরে অমৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর একটি গানে কবির সেই কামনা, ব্যর্থতার করুণ সুরকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায়, যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাতে প্রাণ যেন মৃত্যুকে স্বীকার করিয়াও করিবে না। পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়ার—একেবারে গত হওয়ার —যে বেদনা, তাহাই আকাশ ও পৃথিবীর শোভাকে যেমন মমতায় মেদুর করিয়া তুলিয়াছে, তেমনই, সেই বেদনাই শান্তিলাভ করিতে চায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন-কল্পনায় ;—

যখন পড়বে না মোর চরণ-চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,

ঘাটে ঘাটে খেয়াতরী
এমনি সেদিন উঠবে ভরি,
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে।

—এই গানের ঐ শেষ তিনটি পংক্তিতে যে দীর্ঘনিশ্বাস জমাট হইয়া আছে, তাহাই ইহার মূল সুর ; ঐ তিনটি পংক্তিই ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদেরও হৃদয়ের তন্ত্রীতে যেরূপ আঘাত করে, তাহাতে বিদায়ের ব্যথাই তীব্রতর হইয়া উঠে ; উহার মধ্যে সেই ব্যথাকে অগ্রাহ্য করিবার যে ভাব আছে, তাহা নিতান্তই গৌণ বলিয়া মনে হয়। কবি যখন সান্ত্বনার ছলে বলেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।

—তখন সে আশ্বাস, সেই ব্যথার তুলনায়, অতিশয় অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। কারণ, যে-প্রাণ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার সময়ে এমন বিদার-বিধুর হয়, সে প্রাণের পক্ষে এ আশ্বাস সত্য নয়। মৃত্যুতে যদি ব্যক্তিত্বের লোপ হয়—তাহাই যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এই প্রাণও মরিয়া যাইবে; তখন 'কান্না-হাসির এই দোল-দোলানি'—এই "pleasing anxious being"-ও যে আর থাকিবে না! সেই ভয়ই যে সব চেয়ে বড় ভয়—সেই ক্ষতিই যে সব চেয়ে বড় ক্ষতি! তাহার বদলে, ঐ যে ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বের চেতনা—সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষে ব্যাপ্ত হওয়ার আনন্দ—তাহা কি সত্যই একটা সান্ত্বনা! কবি এখানে এই যে 'চিরদিনের সেই আমি'র অমরত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে একটা তত্ত্বজ্ঞানের আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু প্রাণের আশ্রয় ইহাতে কোথায়? যে-আমি সকল খেলায় খেলা করে—সে আমি একটি সুন্দর কল্পনা মাত্র; তাহাতে একটা ভাবের সৌন্দর্য্যই আছে, প্রাণের ক্ষুধার বস্তু সে নয়—সে একটা মনের বিলাসের সামগ্রী। এইরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় আছে, তাঁহার 'শিশু' বিদায় লইবার কালে তাহার মাকে বলিতেছে—

বাদ্‌লা যখন পড়বে ঝরে'
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গা'ব ঐ বনে।
জান্‌লা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক দিয়ে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে
খোকার লাগি' তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হ'য়ে বলব তোমায় 'ঘুমো.'

তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুক্‌ব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো॥

—ইহাও কবিতা-হিসাবেই উপভোগ্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গানটির মধ্যে এই কল্পনাই একটি তত্ত্বরূপে উঁকি দিয়াছে। কবি, মৃত্যু হইতে মুক্তি, বা ব্যক্তির অমরত্বের যে আশ্বাস সেখানে ঘোষণা করিতেছেন, তাহা একটা তত্ত্বগত আশ্বাস মাত্র; অথচ সেই তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাণের কামনার মধ্যে একটা বিরোধ রহিয়াছে। তাহাতে ব্যক্তি চেতনাও যেন লোপ পাইতেছে না, বিশ্ব-চেতনার মধ্যেই তাহা জাগিয়া থাকিতে চায়; যে রূপরস-সম্ভোগ ব্যক্তি-দেহে ব্যক্তির চেতনাতেই সম্ভব, তাহাকেই দেহহীন নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় ভোগ করিতে চায়। জীবনের প্রতি এই অতি-গভীর ও দুশ্ছেদ্য মমতার বশে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখনই একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেন নাই, তাহাকে বার বার দূরে রাখিতে চাহিয়াছেন। যৌবনে একদা তিনি মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া এই যে বলিয়াছিলেন—

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী পরে
মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখী এই সব দেখা-শোনা
ক্ষণিকের মেলা;

*   *   *

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহা পরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম;
তবে মৃত্যু দূরে যাও, এখনি দিয়োনা ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আমার দু'দিন হ'তে
করিয়ো না চুরি।

—ইহাই তাঁহার প্রাণের অকপট উক্তি, এই মনোভাবই মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব। ইহারই বশে, মৃত্যুকে দূরে রাখিবার আকুল আগ্রহে তিনি কত ভাবেই না জীবনের অমৃত-রূপ ধ্যান করিয়াছেন!

৪

তথাপি মনে হয়, আমরা তাঁহার যে-জীবন কাব্যের চলচ্চিত্র-পটে নানা বর্ণে বিলসিত হইতে দেখিয়াছি, তাহার অন্তরালে আত্মার যে নিশ্চল নিষ্কম্প জ্যোতিঃ-শিখা 'ঘূর্ণির মাঝখানে একটি বিন্দু'র মত স্থির হইয়া বিরাজ করিতেছিল—তাহার সন্ধান কখনও পাই নাই। যে-পুরুষ জীবনের এই নাট্যশালায় অজস্র ফুল ও অফুরন্ত আলোর আয়োজন আপনিই করিয়া লইয়াছিলেন—তিনি যে অন্ধকারকে কখনও ভোলেন নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি ; কিন্তু এত মমতা, এত মোহের মধ্যেও, যে বিশ্বাস তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে চিরদিন অটুট ছিল, যাহার বলে তিনি সকলই জানিয়া শুনিয়া এই অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন—সে কথা তিনিই জানিতেন, আমরা জানিতাম না। তাই মৃত্যুর তরণীতে পা দিবার সময়ে তিনি যখন সেই অনিত্য-লীলার নটবেশ ত্যাগ করিয়া নিত্যের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, তখন আমাদের চমকিত হইবার কারণ থাকিলেও, কবির আত্মা চমকিত হয় নাই ; তিনি তখন অতি ধীর গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠেই তাঁহার আত্মার সেই অভয়মন্ত্র ঘোষণা করিলেন। মৃত্যুর বিভীষিকা যেমন তাঁহাকে জীবনের প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই, তেমনই জীবনের হাসি-কান্নায় নিজের প্রাণকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াও, তিনি মৃত্যুকে কখনও বিস্মৃত হন নাই, যথা সময়ে তাহার দাবী মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসিয়াই তিনি নিজের অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির বলে জীবনকে একটি উৎসবশালায় পরিণত করিয়াছিলেন—মৃত্যুকে জয় করিবার ভাবনাই যেন তাঁহার ছিল না। আমরা কবির সেই প্রাণের লীলাকে তাঁহার কবিতার মধ্যে যে-রূপে প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি—কবি হয়তো নিজে কখনও তাহাকে সেইরূপে দেখেন নাই ; আমাদের নিকটে তাহা যেমন ছিল, কবির নিকটে তেমন ছিল না। সেই একান্ত একক আত্মসাক্ষাৎকারের দিককে কবি তাঁহার কাব্য-সাধনাতেও পৃথক রাখিয়াছিলেন—সেই দিকটি আমাদের চোখে পড়িবার নয় বলিয়াই কখনও পড়ে নাই। এই জীবন-রঙ্গভূমির নেপথ্য-অন্তঃপুরে—যেখানে কোন দর্শক নাই, শ্রোতা নাই, যেখানে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শের বিচিত্র বেশ-বিলাস, আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল সরিয়া মুছিয়া যায়, সেখানে রূপশিল্পী নিজেকে নিজের সৃষ্টি হইতে পৃথক করিয়া দেখে। সেখানে যে আত্মসাক্ষাৎকার অনিবার্য্য—রবীন্দ্রনাথ, রূপের ভাষাতেই অপরূপের সুর যোজনা

করিয়া, তাঁহার গানগুলিতে, নিজের সেই ব্যক্তি-চেতনার শেষ স্বাক্ষর দিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কারণ, প্রাণের সেই গভীরতম আকুতি ও আশ্বাস—সেই অতিশয় আত্মগত অনুভূতি—জাগ্রত ব্যক্তি-চেতনাকেও অতিক্রম করে, তাহা অনির্ব্বচনীয়; তাই তাহাকে গানের সুরেই কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যায়। সে সুরও যেন নিজের সঙ্গে নিজেরই আলাপন—অন্যের নিকট তাহা স্পষ্ট হইবার নয়,—

আমার একটী কথা বাঁশী জানে,
বাঁশীই জানে।
ভরে রৈল বুকের তলা,
কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল ব'লে গেলেম বাঁশীর
কানে কানে॥

কিংবা-

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো।
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি'
নীরব রেখোনা তোমার বীণার বাণী—
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো॥

অথবা—

নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশীতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়ন জলে॥

ইহা হইতেই, তাঁহার গান যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই গানের ভিতর দিয়াই কবি নিজের গভীরতম বেদনা, কামনা বাসনা, আশা ও বিশ্বাস—প্রাণের অতিশয় নিভৃত নির্জ্জনে যেন সকলের অগোচরে যে দেবতার নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন, সে দেবতা কি শুধুই জীবনের দেবতা, না শুধুই মৃত্যুর? যখন শুনি—

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি',
কিছুই সেদিন কিছুই রবেনা বাকি,
পরম মরণ লভিব চরণ-তলে।

—তখন কোন প্রশ্নই আর থাকে না।

এই যে আর এক প্রকার পরম আশ্বাসের অনুভূতি, ইহা আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলার—একটি চরম পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে পূর্ণ করিয়া দেওয়ার—যে 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি', তাহারই পূর্ব্বাস্বাদ। এই যে মৃত্যু—এ মৃত্যু রূপপিপাসার গুঞ্জরণ-শেষে মধুপানে নীরব হওয়ার মৃত্যু। এ অবস্থা মানুষের সাধারণ অনুভূতির অতীত, ইহাকে বাক্যের দ্বারা বোধগম্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এখানে কবি নন্—মিস্টিক-রসের সাধক। এ অবস্থায় জীবনের প্রতি মমতা, এবং তাহারই ফলে মৃত্যুকে আড়ালে রাখিবার কোন প্রয়োজনই আর নাই ; এমনও বলা যাইতে পারে যে, এ অবস্থায় পৌঁছিলে জীবন ও মৃত্যু দুইয়েরই কোন সাক্ষাৎ চেতনা আর থাকে না। অতএব, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সেই অপর ও প্রায় সর্ব্বকালীন যে ভাব-কল্পনা—যাহাতে মৃত্যুর সঙ্গে লুকাচুরি খেলার একটি নূতন রসে তিনি আমাদের মনকে আকুল, এবং জীবনেরই পূজায় উন্মুখ করিয়া দেন,—তাহাই কবির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের নিদান।

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

—এই যে আশ্বাস, ইহাই মানব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এক দিকে জীবন-বিরহ, ও অপর দিকে মৃত্যু-মিলন—এই উভয়েরই গান তিনি কত ছন্দে কত সুরে গাহিয়াছেন, কিন্তু তথাপি, মৃত্যুর সহিত মিলনের সুখ নয়—জীবনের বিরহ-ভয়ই তাঁহার কাব্যে জীবনকে যে দুর্ল্লভতার গৌরব দান করিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে চরিতার্থ করে। কবি রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নানা স্তর আছে, সোপান-পরম্পরাও হয়তো আছে,—একই মন্ত্রের সাধনায় তিনি হয়তো আসন

পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কিংবা যেখানে পৌঁছিয়াছেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাহাতে কখনও প্রেমের অতৃপ্তি-সুখ, কখনও ভক্তির আত্মসমর্পণ, কখনও জ্ঞানের দৃঢ় প্রত্যয় আছে—কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি জীবনকে লেশমাত্র অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করেন নাই। এই জগৎ ও জীবনের প্রতি যে আসক্তি তাহা যদি একটা মোহমাত্রই হয়, তথাপি সেই মোহই মুক্তিরূপে জ্বলিয়া উঠিবে—একদা তাঁহার কবিচিত্তে এই যে প্রত্যয় জাগিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে এক সুগভীর উপলব্ধি ছিল; সেই উপলব্ধিও অতি উৎকৃষ্ট বাণীতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমন আশ্বাসবাণী তাঁহার কাব্যে আর কোথাও তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সে বাণী যেন একটি প্রকাশ—একটি Revelation; তাহাতে ভাব-কল্পনার সম্পূর্ণ প্রভাব থাকিলেও, সে বাণী যেন এক অপৌরুষেয় প্রজ্ঞার আলোকে সমুজ্জ্বল। আমি এখানে কবির সেই উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা;
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

এবং—

চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো দোলা দিতেছ
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।

*　　*　　*

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে করো কে বা জানে!

*　　*　　*

এই মত চলে চিরকাল গো,
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চিরদিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে ত' যেমন যা' ছিল
হারায়নি কিছু, ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।...
আছে সেই আলো, আছে সেই গান
আছে সেই ভালবাসা।
এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

—মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বাণী ইহার পরে আর কোথাও পূর্ণতর বা স্ফুটতর হইয়া উঠে নাই, ইহার নিকটে—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

—এক প্রকার তত্ত্বরসের কুহক-সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

৫

কিন্তু কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলাম এই বলিয়া যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে, ও সেই জীবনের সাধনাকে আমরা এতকাল যে ভাবে যেরূপে বুঝিয়াছিলাম, আজ তাঁহার মৃত্যুসংক্রান্ত কতকগুলি ব্যাপারে সেই জীবন ও সেই সাধনার সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সংশয়-ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইয়াছে। জীবনকে নূতন করিয়া দেখিবার জন্য যে আলোক তিনি জ্বালিয়াছিলেন—উপনিষদের সেই ঋষিমন্ত্র, সেই "মধুবাতা ঋতায়তে" মন্ত্রের যে কবিভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে, আমাদের বহুকালের অভ্যস্ত সংস্কার—জীবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে যে পরলোক ও মৃত্যুর অন্ধকার যুগ যুগ ধরিয়া ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—তাহার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার স্বরচিত ও অভিপ্রেত যে মন্ত্রগান সহকারে তাঁহার আভ্যুদয়িক সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে—মৃত্যুর সেই রহস্যান্ধকার জীবনের উপরে আবার

তেমনই ভাবে নামিয়া আসিয়াছে, জীবন যেন নিতান্তই ক্ষুদ্র তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। আমার চিত্তে এই যে ভাবান্তর ঘটিয়াছে, ইহার আরও প্রকৃষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু যখন আসন্ন, এবং আরও পরে যখন কবি তাহার প্রায় সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি দেখিলেন, তখন তিনি যে দুই কবিতায় তাঁহার চরম বাণী লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহাও কম অর্থপূর্ণ নয়; আমি তাহাই স্মরণ করিয়া প্রসঙ্গের আরম্ভে, কবির আজন্ম-সাধনায় মৃত্যুকে জয় করিবার সেই প্রয়াস আর এক চক্ষে দেখিয়াছি। হয়তো সে দেখাও ঠিক নহে,—গূঢ়তর তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে কবির সেই সাধনাকে একটি নির্দ্বন্দ্ব-ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সহজ, অথবা সম্ভব। কিন্তু আজ কোনরূপ তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিবার মত প্রাণের অবস্থা নয়; তাহার উপর, কবির সেই চরম বাণী প্রাণ মন বিকল করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই কবিতা দুইটি হইতে কয়েকটি বিশেষ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের অর্থ যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই বলিব।—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।...
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

এবং—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বার বার
এসেছে আমার দ্বারে।...
যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস,
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা জীবনের এ মিথ্যা কুহক,
...দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

—এখানে জীবন ও মৃত্যু দুয়েরই এক মূর্ত্তি; জীবন সরল-বিশ্বাসীকে মিথ্যার ফাঁদে ফেলিবার জন্য সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ করিয়াছে, এবং মৃত্যুও আঁধারে তাহার নিপুণ শিল্প—'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি'—ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ইহাও জীবনেরই মিথ্যা কুহক—'দুঃখের পরিহাসে ভরা'। একদিকে ছলনা, আর একদিকে ভয়—জীবন ও মৃত্যু কেহই সত্য, শিব, বা সুন্দর নয়। কিন্তু কবি এই প্রবঞ্চনাকেও মূল্যহীন মনে করেন নাই, কারণ, যে মহৎ—যে আপনার অন্তরের চিরস্বচ্ছ, ঋজু, বিশ্বাস-সমুজ্জ্বল পথে এই কুটিলকে জয় করে, ইহাকে সহ্য করিয়াই—

সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত
অন্তর-অন্তরে

—অর্থাৎ, যে ইহাকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই—'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত'; কিন্তু, এই ছলনাকেই অনায়াসে সহিয়া—

সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এই উক্তি আরও গভীর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে ইহার শিথিল বাক্যযোজনায়; ভাষা যেন সেই মর্ম্মান্তবিদারী চরম অভিজ্ঞতার অর্থ বহন করিতে না পারিয়া, একপ্রকার মন্ত্রচ্ছন্দের বাণীরূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক; কারণ, ইহা সেই সময়ের উক্তি—যখন এক অতিতীক্ষ্ণ দেহচেতনা-কাতর আত্মার শেষ মর্ত্ত্যবন্ধন খসিয়া যাইতেছে; ইহাতে কেবল এক প্রাণান্তিক বিশ্বাসের ঘোষণাই আছে—যাহাকে সম্বল করিয়া সেই জীবন-ক্লান্ত পথিক অবশেষে অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন।

তথাপি, ইহাতেও—জীবনের ছলনা, মৃত্যুর নিপুণ শিল্প, প্রভৃতির—অর্থ খুব স্পষ্ট। সে অর্থ এই যে, শেষ পর্য্যন্ত আত্মাই আত্মার পরম নির্ভর; আত্মার বাহিরে যাহা কিছু, তাহার একটা নেতি-মূলক (negative) মূল্যই আছে; জীবন ও মৃত্যু—দুইয়েরই বন্ধনপাশ এই হিসাবে তুচ্ছ নয় যে, তাহাকে কাটিয়া বাহির হইবার শক্তিই আত্মার মহত্ত্ব প্রমাণ করে। এই মিথ্যা—সুন্দর কিম্বা ভয়ঙ্কর হইয়াও—আত্মার কোন ক্ষতি করিতে পারে না; কারণ, আত্মার অন্তরের আলোকে সত্যই ধৌত হইয়া উঠে।

ইহাই কবির শেষ বাণী। এ বাণী একদিকে যেমন সত্য-স্বীকারের বাণী—আত্মার অভয়-ঘোষণার বাণী, তেমনই, আর একদিকে ইহা জীবনকে বিদায় দেওয়ার—জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলার—বাণী। কবির আত্মা যেন জীবনের সকল দেনা শোধ করিয়া মৃত্যুস্নানে নির্ম্মল ও শুচি হইয়া উঠিয়াছে। কবি এতদিনে জীবনের যে পরিণামকে বরণ করিলেন, সে পরিণাম পূর্ব্বেও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, কারণ, তাঁহাকেই আমরা গাহিতে শুনিয়াছি—

> চোখের আলোয় দেখেছিলাম
> চোখের বাহিরে।
> অন্তরে আজ দেখব, যখন
> আলোক নাহি রে।
> ধরায় যখন দাওনা ধরা
> হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
> এখন তোমার আপন আলোয়
> তোমায় চাহি রে।
> তোমায় নিয়ে খেলেছিলাম
> খেলার ঘরেতে,
> খেলার পুতুল ভেঙ্গে গেছে
> প্রলয় ঝড়েতে...

অতএব, এই মনোভাব—এই বৈরাগ্যের সুর—অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, প্রাণের মোহের উপরে এই আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসা জয়ী হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাঁহার এই শেষের বাণী শুনিয়া আমরা চমকিত হইয়াছি বটে, মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের সেই দুর্দ্ধর্ষ মানবতাও অবশেষে আধ্যাত্মিকতার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। তিনি জীবনের মধ্যেই, 'সহস্র বন্ধনমাঝে মুক্তির স্বাদ' লাভ করিতে পারিলেন না; শেষ পর্য্যন্ত সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়াই তাঁহাকে আত্মার মুক্তি বা অভয় প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু হয়তো আমরাই ভুল বুঝিয়াছিলাম; এতদিন জীবনের বহিরাবরণে বিচ্ছুরিত কবি-শিল্পীর সেই অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার রশ্মিচ্ছটাই আমরা দেখিয়াছি, সেই শিখার অন্তঃস্থলের স্থিররশ্মি দেখি নাই। জীবনকে যে বাহিরের দৃষ্টিতে তিনি দেখিয়াছিলেন, সে দৃষ্টি তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন; যাহা শুধু বাণীতেই ধরা যায়, শুধু

তাহাই নয়—যাহাকে বাণীতেও ধরা যায় না, তাহাকেও তিনি সুরে ধরিয়া দিয়াছেন; কিন্তু যাহা বাণী ও সুর দুইয়েরই অতীত, তাহাকে তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন—তাঁহার মৃত্যুকালীন মুখ-জ্যোতি তাহার আভাস মাত্র দিয়াছে। সেই আভাসের সাহায্যেই রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-কাব্য আর একবার ভাল করিয়া আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা

১

ইংরেজীতে 'রিদ্‌মিক প্রোজ' নামে যে রচনা-রীতির নামকরণ হইয়াছে তাহা স্বরসংঘাতের বিন্যাসজনিত একপ্রকার ধ্বনিতরঙ্গের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই 'রিদ্‌মিক প্রোজ'কেই বাংলায় আনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন ধরিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু আজিও সফল হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ চেষ্টা হয়তো শুধুই খেয়ালের ব্যাপার নহে—তাঁহার আর্টবিলাসী মনের বৈচিত্র্য-লিপ্সাও ইহার কারণ বটে; কিন্তু মনে হয়, তদপেক্ষা গভীরতর কারণ তাঁহার কবি-স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গীতিধর্ম্মী, তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি হইতে কাব্যের গীতিচ্ছন্দকে সহস্রধারায় প্রবাহিত করিয়াছেন; ছন্দোবন্ধের যে বন্ধন, তাহাকে মিলের বাঁধনে দৃঢ়তর করিয়া তিনি আপনার বিশিষ্ট কবি-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই মিল ও ছন্দের স্বভাবসুলভ বশ্যতাও তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে—নিজ স্বভাবকে অতিক্রম করিবার বাসনা তাঁহাকে বারবার অধীর করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, মানসীর 'নিষ্ফল কামনা'র মত কবিতা এবং অমিত্রাক্ষর-কবিতা রচনার ইচ্ছা প্রবল হইলেও, তিনি সাহস করিয়া তাহার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন নাই—তেমন সাফল্যলাভ করেন নাই বলিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও আত্মসংযম করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁহার কবিধর্ম্মের অনুকূল নহে, যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও অমিত্রাক্ষরের যতি-কৌশল নাই—গীত-সুর-বর্জ্জিত, ছন্দ-মাত্র-সহায় স্বরমূর্চ্ছনায় তাহা সঙ্গীত সৃষ্টি করে না; বরং তাঁহার সেই কবিতার পংক্তিগুলি যেন শব্দ-মাত্রের বর্ণবিন্যাস-গুণে গীতিঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠে। প্রমাণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) এস নাথ, ওই দেখ
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্ন-শয়ন,

কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি'
আর্দ্র করি' ঝরণার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি', ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, 'বেলা যায়' 'বেলা যায়'
বলি'। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এস নাথ, বিরল বিরামে।

(২) মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম; সম্মুখে গভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি,
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে; দিবালোক-তট হ'তে
এস, নেমে এস, কনক-চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে।
কোথা ছিলে, প্রিয়ে?

এই সকল পংক্তিতে যে ছন্দঃ-স্রোত বহিয়াছে, তাহা অমিত্রাক্ষরে রচিত হইলেও আবেগময় গীতিস্বরযুক্ত; এই স্বরই যদি মিলের সাহায্য পায় তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সুন্দরী আরও লীলা-চঞ্চল, আরও বিলাস-বিহ্বল হইয়া উঠে; যথা—

কতদিন এই বনে
দিক্ দিগন্তরে আষাঢ়ের নীল জটা
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্ম্মহীন দিনে সঘন কল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয়; এসেছিল কতদিন

অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাস হিল্লোলাকুল যৌবন উৎসাহ,
সঙ্গীতমুখর সেই আবেগ-প্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দ-প্লাবন ; ভেবে দেখ একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা—
চিররাত্রি চিরদিন ?

উপরি-উদ্ধৃত কাব্যখণ্ডগুলিতে গীতিসুর প্রবল হইয়া আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্ব্ব ভাবের বাহন বটে ; এমন কি, ইংরেজী কাব্যে গীতিপ্রধান (lyrical) অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটি পৃথক আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অমিত্রাক্ষর মিত্র না হইয়া সত্যই অমিত্র হইয়া উঠে ; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাহার প্রমাণ—

(১) নেহারিল নত করি' শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিল চাহিয়া নব গৌর তনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস ; সরোবরে
পা' দুখানি ডুবাইয়া দেখিল আপন
চরণের আভা।—বিস্ময়ের নাই সীমা।

(২) নয়নে নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি, বেধে যায় হৃদয়ের
কথা ; হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে ; চাহে
নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা পাশে।
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,

সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন,
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি' কাতর হৃদয় !

—এইরূপ অসংখ্য আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-লক্ষ্মী গীতিপ্রাণা,—নূপুর খুলিয়া এক পা'ও চলিতে তাহার বাধ' বাধ' ঠেকে। তাই, ছন্দোহীন—অর্থাৎ, পদমাত্রা ও মিলের শাসন-মুক্ত, অথচ সুরলয়যুক্ত—রচনার আকাঙ্ক্ষা তিনি গদ্যেই মিটাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য পুরুষের চালে পা ফেলিয়া চলে না, নট বা নটিনীর বিলাস-লীলায় তাহার ভঙ্গিমা সর্ব্বত্রই লীলায়িত। তাঁহার গদ্যও ভাবে ও রূপে কাব্যধর্ম্মী। গদ্যের অবারিত অনিয়ন্ত্রিত গতিভঙ্গিকে তিনি কেমন সুরময় করিয়া তোলেন, তাহার উদাহরণ তাঁহার রচনা-রাশির মধ্যে সর্ব্বদাই মিলিবে, আমি এখানে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিব।—

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ অতল উৎসের তীরে খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন্ দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্প-কোরকের মত, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল? সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণ-মদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কি অসীম ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন্‌শা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে? ("ক্ষুধিত পাষাণ"—গল্পগুচ্ছ)

২

কাব্যে ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ছন্দ কেন—মিল ত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বল্পপরিসর সুসঙ্কীর্ণ

পদবিন্যাসের গীতিচাতুরী তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেও, উদারতর ছন্দ-স্বাধীনতাও তাঁহাকে চিরদিন লুব্ধ করিয়াছে; তাই, কখনও পয়ারের চতুর্দ্দশ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, কখনও তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার কাব্য-বিহঙ্গ পক্ষবিস্তার করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ইহারই প্ররোচনায় তাঁহার ছন্দঃসৃষ্টির সর্ব্বশেষ সফল প্রয়াস—'বলাকা'। মিল ও ছন্দ কোনটাকে ত্যাগ না করিয়া তাঁহার ভাব-কল্পনার 'হংসবলাকা' * কবিতার চরণ-চারণকে ইচ্ছামত দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়াছে—অমিত্রাক্ষরের যতি-স্বাচ্ছন্দ্যকে মিত্রাক্ষরে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ছন্দ-মুক্তি ঘটে না। গদ্যে যে মুক্তির উপায় আছে, পদ্যে তাহা নাই। যে-শৃঙ্খল রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মীর চরণে, বাহুতে, ও কটিতটে শৃঙ্খল না লইয়া নূপুর-কাঞ্চী-কঙ্কণের মত স্বচ্ছন্দ নৃত্যচ্ছন্দে বিচিত্র ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে—সেই শৃঙ্খল মোচন করিবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় vers libre-এর উদ্ভাবনায় এখনও পরিশ্রান্ত হইতেছেন। একদা 'লিপিকা'র গদ্যকাব্যে তিনি ইহার এক রূপ ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা যে কাব্যচ্ছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না—গদ্যেরই সে একটা আবেগময় ভঙ্গিমা মাত্র, ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। গদ্যের এই ভঙ্গিমা ইতিপূর্ব্বে আরও এক জন আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—যিনি 'রাজকাহিনী'র মত গদ্য-কাব্য লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব বস্তু দান করিয়াছেন, তিনিও এই খেয়ালের বশে পদ্যগন্ধী গদ্য লিখিবার হাস্যকর প্রয়াস হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে 'রাজকাহিনী' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব—তাহাতে, গদ্যের গদ্যত্ব বজায় রাখিয়াই রচনাকে কতটা কাব্যের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব তাহার নিদর্শন আছে।—

(১) যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, সেইদিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রাণী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে' সেই রূপার চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, কেবল সূর্য্যমূর্ত্তির নীচে সোণার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকী ছিল মাত্র। পুষ্পবতী যত্ন ক'রে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, এক গাছি সোনার তার, সরু হ'তেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মত পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোল্‌তার হুলের মত বিঁধে

* ইহাও একটি আর্ষপ্রয়োগ; 'প্রদোষ' অর্থে যেমন ভোর-রাত্রি নয়, তেমনি 'বলাকা' অর্থে 'বক'—হংসের শ্রেণী বা পংক্তি নয়।

গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মত পরিষ্কার সেই রূপার চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মত ঝক্ ঝক্ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্ম্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটু ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে। এই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল, তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন—"মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝি বা সেখানে কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল!"

(২) বাপ্পাদিত্য সেই সূর্য্যকুণ্ডের জলে সূর্য্য-পূজা ক'রে, গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়ন-মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্দ্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়ন-মন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন;—সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মস্‌জিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপ্ ধপ্ করছে, আকাশে আধখানি চাঁদ, চারিদিকে নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'ল এ গান যেন কোথায় শুনেছেন। হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চম্‌কে উঠে শুনলেন—"আজ কি আনন্দ, ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!"—এ যে সেই গান। নগেন্দ্রনগরের রাজপুত রাজকুমারীর ঝুলন-গান।

—এ রচনা পাঠ করিয়া স্বতই মনে হয়, এই বস্তু কি কাব্যচ্ছন্দে রীতিমত কবিতার আকারে আরও রমণীয় হইত না? কিন্তু বার বার ইহাই প্রতীতি হয় যে, এই রূপই ইহার যথার্থ রূপ, অন্য কোনও রূপে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইত না। উৎকৃষ্ট রচনার ইহাই নিঃসংশয় লক্ষণ।

এ ভাষাও গদ্য, তথাপি ইহার বিষয়বস্তু একপ্রকার কাব্যই বটে। ভাবের সহিত রূপের নিখুঁত সামঞ্জস্য রক্ষার ফলে ইহা এইরূপ গদ্যভঙ্গিতে রচিত হইতে বাধ্য—ইহাকেই বলে 'ফর্‌ম্' ও 'কন্‌টেণ্ট'-এর ঐকাত্মিক পরিণয়। কারণ ইহা যে-ধরণের কাব্য তাহা নিছক রস-পরিণামী নয়, এখানে ভাব-সৌন্দর্য্য কথাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাতে চিত্রের পট-বিস্তার আছে; বর্ণনা ও বিবৃতির গদ্যই ভাবাকুলতার সৃষ্টি করিয়াছে। এ কাহিনী শুনিতে শুনিতে মনে হয়, এক সুদূর সুন্দর রূপকথার রাজ্যে স্বপ্নপ্রয়াণ করিয়াছি। সেথানে সুধাধবল মর্ম্মর প্রাসাদের অলিন্দে বসিয়া অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে দূরবিসর্পী প্রান্তরসীমায় চাহিয়া আছি। পৃথিবী রহস্যময়, কিন্তু মানুষের জীবন অতিশয় সরল ও সংক্ষিপ্ত; সে জীবনের ছবিগুলি রেখা-বিরল ও বর্ণ-বহুল,

এবং সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যকে উজ্জ্বল করিয়াছে ভাবের একটিমাত্র সুর—জ্যোৎস্না রাত্রে বাঁশির আলাপের মত। সে সুরে জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না, রণদুন্দুভি ও ঝুলনগান, রাজা ও রাখাল, আর্টের ঐশ্বর্য্য ও প্রাকৃতিক বন্য-শোভা—এমন একটি কোমল মধুর রাগিণীতে মিলিত হইয়াছে যে, রসিক মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন বালকটি রহিয়াছে সে উৎকণ্ঠিত উৎকর্ণ হইয়া সারারাত্রি জাগিয়া থাকে—রূপকথার সমাপ্তি চায় না। ইহাই রূপকথা, ইহার এমন রূপ আর কোথায়ও দেখি নাই।

৩

কিন্তু গদ্য নয়—চাই পদ্যেরই পরিবর্ত্ত; ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া কবিতা রচনা করিতে হইবে; ইহাই হইল এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাধন, রবীন্দ্রনাথের শেষ সাধনাও তাহাই। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রতিভার অস্তিমকালে বুঝিয়াছেন, 'মডার্ন' না হইলে এ যুগে সকল কীর্ত্তি নিষ্ফল। যে রস-কল্পনার বশে ভাষায় অর্থাতীত ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ছিল, সে রস এ যুগের রস নয়। রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন কবিতাগুলির ভাষা এবং ভাববস্তু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—ইহা সে কাব্য নয়। এ ভাষা অতিমাত্রায় 'বাস্তব'। ইতিমধ্যে তরুণসম্প্রদায় সর্ব্ববিধ বন্ধনমোচনের মত কাব্যেরও ছন্দোবন্ধন মোচনের জন্য অধীর হইয়াছে, নহিলে কবি হওয়ার বড়ই অসুবিধা। ইহারাও 'মডার্নিজ্‌ম'-এর দোহাই দেয়, কিন্তু আসলে ইহাদের রসবোধের বালাই নাই; তাই ভাষাও নাই—সে প্রাণও নাই, সে কানও নাই। তাহাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা রবীন্দ্রনাথও সমর্থন যে করেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে। বাংলা ভাষায় ধ্বনিচ্ছন্দের যত রাজ্য আছে তাহার সকলই তিনি আবিষ্কার ও অধিকার করিয়াছেন; এখন ছেলেরা হুইটম্যান হইবার চেষ্টায় নিষ্ফল তাণ্ডবে মাতিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সাফল্যের পন্থা দেখাইবেন। সাহিত্যিক গদ্যের অন্বয়রীতি উল্টাইয়া, এবং যেমন করিয়া হউক, শব্দের বর্ণসংঘাত-সাহায্যে ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করিয়া, যদি কবিতা রচনা করিতে হয়, তবে তাহার সেই কৃত্রিমতা ছন্দোবন্ধন অপেক্ষাও দুরূহ। যাহা সহজ গদ্যে অথবা সরলতর পদ্যে আরও সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করা যাইত, তাহার এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, অতঃপর কাব্য—ভাবের বাণীরূপ না

হইয়া, শব্দ নাচাইবার রঙ্গস্থল হইয়া উঠিবে। যেহেতু ইহাতে ভাব অপেক্ষা শব্দের প্রাধান্যই অধিক, রসসৃষ্টির পরিবর্ত্তে ধ্বনিসৃষ্টিই ইহার মুখ্য অভিপ্রায়, এজন্য ইহাতে কবি ও কাব্যের প্রাণান্ত ঘটে। উদাহরণ দিব। যাহা আদৌ গদ্য, তাহাকে কাব্যরূপ দিতে চাহিলে—অথবা যে ভাষায় ছন্দোহীন 'রিদ্‌ম' সম্ভব নয়, তাহাতে কেবলমাত্র বর্ণসংঘাত ও পংক্তিপর্ব্বের সাহায্যে কাব্যচ্ছন্দের অনুরূপ শ্রুতি-সুখ উৎপাদন করিতে চাহিলে, যাহা হয়—তাহাই যে রচনাটিতে বিশেষ করিয়া হইয়াছে, আমি সেই 'পৃথিবী' সন্দর্ভটির সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করিব।

কারণ, এই রচনাটিতেই ছন্দোহীন ছন্দের ভঙ্গিমা অতিশয় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধরণের অন্যান্য 'কবিতা'গুলিতে আর সকলই ছিল; কিন্তু ভাষার এমন শব্দ-সঙ্কর, সমাস-সন্ধিযুক্ত শব্দ-ঘনঘটার গুরু-গুরু গরগর ডম্বরুনাদ আর কোথায়ও এমন সার্থক হইয়া উঠে নাই। শব্দের এই ঘনঘটা যেখানেই একটু নরম হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই—

> হাওয়ার মুখে ছুটলো ভাঙা কুঁড়ের চাল
> শিকল-ছেঁড়া কয়েদী ডাকাতের মতো—

অথবা

> চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
> স্বর্গীয় মদের ফেনা।

—ভাষা এমনই ভব্য, এবং উপমা এমনই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে!—কারণ, 'চাঁদের পেয়ালা' অপেক্ষা 'চায়ের পেয়ালা' শুনিতে অনেক ভাল, এবং 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' বাংলাভাষার বস্ত্র-হরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ভাঙা কুঁড়ের চাল' 'হাওয়ার মুখে' উড়িবার মত হালকা হইতে পারে, কিন্তু 'কয়েদী ডাকাতের মত' জোয়ান সে নয়, এবং ছিঁড়িবার মত শিকল তাহার দেহের কোথায়ও শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে না। এই কবিতার আর একটি চিত্র এইরূপ—

> বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
> কালো শ্যেন পাখীর মত তোমার ঝড়,
> সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
> তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে'
> হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে—

কালবৈশাখীর ঝড়ের ছবি,—কিন্তু কোনও একটা রূপ স্পষ্ট হইতে পারে নাই। আকাশটা কেশর-ফোলা সিংহ, ঝড় হইয়াছে শ্যেনপাখী, এবং দিগন্ত—বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ একটা কিছু; চিত্রের অংশগুলি সামঞ্জস্য-হীন। কিন্তু ভাষার এই ঘনঘটা সত্ত্বেও ভাবের মহত্ত্ব কুত্রাপি নাই। কালবৈশাখীর ভীষণতা উপলব্ধি করিতে হইবে কেবল বাক্যের ঘনঘটায়, শব্দের ঝড়ে; অর্থাৎ ইহা বিশুদ্ধ Onomatopœia। নতুবা, ঝড়ের সঙ্গে শ্যেনপাখীর তুলনা! আকাশজোড়া কালো মেঘ আর একটা বড় চিল!—তার চঞ্চু হইল বিদ্যুৎ! ছোটকে বড়র উপমান করিলে বড়ই ছোট হইয়া যায়; এরূপ কল্পনাকে সুস্থ বলা যায় না। আদিম যুগের কাব্যে এইরূপ উপমাই আমরা বেশি দেখিতে পাই, তাহাতে কবিকল্পনার শৈশব-সারল্য ও প্রাবল্যই প্রকাশ পায়; আধুনিক কবির পক্ষে সে কৈফিয়ৎ খাটে না।

এই কবিতার ভাষাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। অতি আধুনিক কাব্যে বাণীর বাণীত্ব নাই—ছন্দ অনাবশ্যক হইয়াছে সেই জন্যই। এখানেও শব্দের ঝড় বহাইতে গিয়া কবি শব্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই 'আধ-পোষা নাগ-দানবে'র 'আধ-পোষা' অভিপ্রেত অর্থ বহন করে না; 'ডাল-পালা আলুথালু করে'র মত ইডিয়ম-বিরুদ্ধ প্রয়োগ আর্ষপ্রয়োগ হইয়া দাঁড়ায়। 'অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধূলায়' এবং 'বনের মৃদু মর্ম্মর উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে অধীর কল কল্লোলে'—প্রভৃতিতে, আওয়াজের খাতিরে যেমন 'ধূলো'র বদলে 'ধূলায়' লিখিতে বাধে নাই, তেমনই 'উঠেছে'র সঙ্গে 'উচ্ছ্বসিয়া'র মত সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে কবি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কোনখানে 'আঁকড়ে' আবার কোথায়ও 'উপচিয়ে' ('উপ্‌চে' নয়)—ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরঙ্কুশ কবি বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও হইতে পারেন নাই। 'আতপ্ত দক্ষিণে-হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ মিলনের স্বগত প্রলাপ আম্রমুকুলের গন্ধে'—ইহা স্বগত প্রলাপ হইতে পারে, কিন্তু বাক্য নয়,—শব্দসমষ্টি মাত্র। রেখা ও রঙের জাল বোনা—চিত্ররচনা হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ কথার জাল বোনাও কি কাব্যকলা? 'তোমার স্বভাবের গর্ত্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে'—বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাষা কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে! 'তার ক্রটির পূর্ণ মূল্য শোধ হয়েছে বিনাশে', 'সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যূষে',

'জীবনের কোনও একটি ফলবান খণ্ড'—এ সকল শব্দযোজনা কি বাংলা? শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তিনি স্বীকার করেন না, অট্টহাস্যের স্থলে 'অট্ট বিদ্রূপ' শুনিতে নূতন, এবং সেজন্য জোরালো বলিয়া মনে হয়; কিন্তু হাস্যের আওয়াজ আছে—বিদ্রূপের তো আওয়াজ নাই; তাহা হইলে 'অট্ট-বিদ্রূপ' হয় কেমন করিয়া? 'বিদ্রূপ' অর্থে নিশ্চয়ই 'হাস্য' নয়! রচনার সব চেয়ে বড় দোষ—অকারণ বাগ্‌বাহুল্য, তাহাও ইহাতে আছে, যথা—

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য্য প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি
উন্মীলিত নিমীলিত হ'তে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো এক আসনের
সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি—

—ইহাতে ভূগোল গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র মিলিয়া কালকে যেরূপ অসীম করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কাব্যরসের উপযোগী বটে; কিন্তু 'বিপুল নিমেষে'র ক্ষুদ্র অংশ তো ক্ষুদ্র নয়, অন্তত দশ হাজার বৎসর হইবে। তার পর—'আসনের সত্য মূল্য'; এই কবিতারই আর এক স্থানে আছে—'ত্রুটির পূর্ণ মূল্য শোধ হয়েছে বিনাশে'; এ ভাষা মূল্যবান বটে।

৪

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'রিদ্‌মিক প্রোজ'-এর একটি বিশিষ্ট নমুনা এইরূপ। স্বীকার করি, ইহাতে একটা ধ্বনিস্রোত রহিয়াছে,—এবং তাহা কাব্যচ্ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহা কি কবিতা হইয়াছে? এই রচনায় আগাগোড়া একটা আতিশয্য বা জবরদস্তি—'এফেক্ট্‌'-সৃষ্টির প্রাণপণ প্রয়াস—থাকাতে সত্যকার কাব্যপ্রেরণা কোথায়ও স্ফূর্ত্তি পায় নাই। ইহাতে আছে কতকগুলা কথা, কথা, আর কথা। এমনতর কথা আরও সহজ ভঙ্গিতে, বিশুদ্ধতর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলে আরও সরল ও কৃত্রিমতাশূন্য হইত। রবীন্দ্রনাথের মত ভাবুকের চিন্তাগভীর ভাবরাশি অর্থপূর্ণ হইবেই—অর্থগৌরবকে কাব্যগৌরব দান করিবার জন্য কতকগুলি কষ্টকল্পিত তাক্-লাগানো উপমার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। এ সকল বস্তু যে কাব্যবস্তু নয়, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানেন। ভাষা ও সাহিত্যের এই দুর্গতির দিনে কেবলমাত্র ভঙ্গিচাতুর্য্যের লোভে রবীন্দ্রনাথের মত

ঋষিকল্প রসস্রষ্টার এই আধুনিকত্বের মোহ কেন? বাংলা ভাষা ও ছন্দ লইয়া যে কারিগরি তিনি করিয়াছেন তাহা বাঙালীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অসামান্য গীতি-প্রতিভা বলে তিনি বাংলাভাষাকে রূপ-যৌবনের লাস্যলীলায় উর্ব্বশীর মতই মনোহারিণী করিয়াছেন। কিন্তু শেষ বয়সে যখন যৌবন-প্রতিভা আর নাই, তখন তাঁহার কাব্য-অপ্সরী রূপের পরিবর্ত্তে অপ-রূপের সাধনা করিতেছে। ভাব-অর্থ-নিরপেক্ষ চিত্রকলার রেখা-লেখ-বিলাসের মত, অতিশয় তুচ্ছ ও সামান্য বস্তুকে—জীর্ণ ভাব ও জরাগ্রস্ত কল্পনাকে—কেবল ভঙ্গিমার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা কবিকর্ম্ম নহে। এ সকল রচনায় যে 'রিদ্‌ম' আছে, তাহার কোনও বিশিষ্ট গৌরব নাই; টানা সহজ গদ্যে সেটুকু অনায়াসে চলিতে পারে, তার জন্য নূতন পংক্তি-প্রথার প্রয়োজন নাই। হসন্ত ও যুক্তবর্ণের সুবিধা যতই থাকুক, বাংলা ভাষায় 'রিদ্‌ম'কে শ্রুতিগম্য ও সুখশ্রাব্য করিতে হইলে, ছন্দের দৃঢ়বন্ধন চাই। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দেই এই 'রিদ্‌ম্'-রহস্য প্রথম ধরা পড়িয়াছিল—এক দিকে যেমন যতিস্থাপনের স্বাধীনতা, অপর দিকে তেমনই পদ্যের পদবন্ধনকে স্বীকার করিয়া, তিনি বাংলা কাব্যে 'রিদ্‌ম্'-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই 'পৃথিবী' কবিতায় যাহা করিয়াছেন তাহা একটা *tour de force* বা 'পালোয়ানী প্যাঁচ' বলিয়া গণ্য হইতে পারে—তাহার অতিরিক্ত আর কিছু দাবী ইহার নাই।

রবীন্দ্রনাথ জন্ম-মৃত্যুর উর্দ্ধে, তাই একই জীবনে বহু জন্মের সাধনা তিনি করিলেন। এই জীবনেরই কোনও এক পূর্ব্বজন্মে তিনি ভাষা ও ছন্দের যে সাধনা করিয়াছিলেন আজ তাহাকে পায়ের ধূলার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। একদিন তিনিই লিখিয়াছিলেন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি' দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজসম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।

—সেদিনের সে আশ্বাস আজ আর নাই। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাইবার বিধি তিনি অন্যভাবে পালন করিতেছেন। বাংলা-সাহিত্যই অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই অরণ্যে পরমসুখে বাস করিয়া তাহারই বৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। আমরা সেই অরণ্যে বৃথাই রোদন করিতেছি।

[অগ্রহায়ণ ১৩৪৩।]

রবীন্দ্র-কাব্যের কবিপুরুষ

১

যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে—জাতির যুবশক্তির সেই বিরাট বোধন-যজ্ঞে, টাউন-হলের শিবাজী-উৎসব সভায়—নূতন সামচ্ছন্দের উদ্গাতারূপে; সেদিন তিনি শিবাজীর উদ্দেশে রচিত তাঁহার বিখ্যাত কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সভায় যাঁহারা তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং সেই কণ্ঠের সেই আবৃত্তি শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই আজ আর ইহজগতে নাই; থাকিলে স্মরণ করিবেন, সেদিন আমরা রবীন্দ্র-কবিপুরুষের কোন্ রূপ দেখিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের মধ্যাহ্ন তখন অতীতপ্রায়, অথচ সে-যাবৎ উষা ও প্রভাতের রবিরশ্মি ত দূরের কথা—সেই মধ্যাহ্ন-পূর্ব্ব প্রহরের ভাস্বর কিরণচ্ছটাও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই! তখন 'নৈবেদ্যে'র যুগও শেষ হইয়াছে; তাহার অনেক পূর্ব্বেই কবির জীবন-কুঞ্জে বসন্তের যৌবন-উৎসব প্রায় সমাধা হইয়া গিয়াছে, অথচ দেশের মধুব্রতগণ তাহার কোন সংবাদই রাখেন নাই। কবি যখন গাহিতেছিলেন—

> আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
> গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল।
> বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
> নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
> রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
> গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল।

—তখন তাঁহার সেই গান কাহারও রসপিপাসাকে উতলা করে নাই। এত বড় কবির এমন নিঃসঙ্গ কবি-জীবন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, এবং সেই প্রায় অবজ্ঞাত, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মতৃপ্তিমাত্র-সম্বল সাহিত্য-সাধনায় তিনি যে কখনও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হন নাই—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা, ও কবিপ্রাণের স্বরূপ-নির্ণয়ে ইহা মনে রাখিবার প্রয়োজন আছে; এই প্রসঙ্গে আমি, এক অনুরূপ উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি স্মরণ করিতেছি—

সহায়তা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, অনুকূলতা নাই, কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য্য ও উপবাস-সহিষ্ণু অকাতর অনুরাগে চিরজীবন একাকী কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

—বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই যে কথা বলিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের জীবনে তাহা সম্ভব হইয়াছিল আরও একটা কারণে, আমি উপরে তাহারই আভাস দিয়াছি।

কিন্তু আমি যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম তখন তিনি তাঁহার সেই নিভৃত নিঃসঙ্গ সাধনার আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দেরই উত্তরসাধকরূপে, সেই দুই মহাপুরুষের দ্বারা সদ্য-কর্ষিত বাংলার যুবজন-মনোভূমিতে যে ভাব-বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে যে আশু পুষ্পোদ্গম করাইতেছিলেন, তাহাতে আমাদের সেকালের সেই আকাশ বাতাস 'সুরার মত সুরভি' হইয়া উঠিতেছিল—তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। কিন্তু সে পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় নয়; তখন তাঁহার কবি-প্রাণে বাহির হইতে একটা বাতাস লাগিয়াছিল—তাহার সেই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতার কূলে জনতার হৃদয়-তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়িতেছিল। এইরূপ বিচলিত হওয়ার মূলে কবির নিজেরই অস্বস্তির দুইটি কারণ হয়তো ছিল। প্রথমটি—মনুষ্যহৃদয়-সুলভ দুর্ব্বলতা। সকল প্রতিবেশ-প্রভাব জয় করিয়া, দেশ ও কালের সকল অনিত্য প্ররোচনা অস্বীকার করিয়া, তিনি এক নিরুদ্দেশ সাধন-তীর্থের অভিমুখে চলিয়াছিলেন বটে—পথের পথ-সঙ্কট অপেক্ষা দূর দিগন্তবলয়ের রহস্য-সীমা তাঁহাকে অধিকতর আকুল করিত বটে, কিন্তু তিনি যে-দেশে যে-সমাজে জন্মিয়াছিলেন তাহার অশুচি অবস্থা তাঁহার আত্মমর্য্যাদাবোধে আঘাত করিত, তাঁহার সেই অতিশয় দৃপ্ত ও স্বতন্ত্র আত্মিক সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইত, বাংলার সেই নবজাগরণের যে ক্ষণে, এবং যে পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার ভাব-জীবনের স্বাতন্ত্র্যবোধ যতই প্রখর হোক, এ অস্বস্তি হইতে তাঁহার অব্যাহতি ছিল না। তাই যতদিন তাঁহার দেহে ও মনে যৌবনের পূর্ণ আধিপত্য ছিল, ততদিন তাঁহার চিত্তে সেই ব্যথা বাজিত; কখনও অধীর আক্ষেপে গাহিয়া উঠিতেন—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!"

কখনও বা সবলে আত্মসংযম করিয়া মগ্ন-স্বরে গুঞ্জন করিতেন—

এখনো সময় নয়!
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি'
অনিমেষ চোখে পূর্ব্ব-গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এই দুইটি কবিতাকেই তিনি পরে তাঁহার স্বনির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ হইতে বাদ দিয়াছিলেন।

আর একটি যে অস্বস্তি, তাহা তাঁহার কবিচিত্তেরই বিবেক-দংশন। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা যেমন অতিশয় অন্তর্মুখী—আত্মভাবপরায়ণ, তেমনই, তাঁহার কবি-মানস অতিশয় আত্মসচেতন ছিল; তাঁহার প্রকৃতিতে ভাবানুভূতির সূক্ষ্মতা ও তত্ত্বজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এই দুইএরই এক আশ্চর্য্য মিলন ঘটিয়াছিল। তাই নিজ কবি-স্বভাবের বশ্যতা যতই অলঙ্ঘনীয় হোক, তিনি ইহাও জানিতেন যে, তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী অন্তঃপুরচারিণী, আত্ম-বিহারিণী, উচ্চ-অবরোধবাসিনী; তাহার বিচরণ-স্থান সাধারণ মানুষের সমাজ নয়, সে আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বপ্নলোক সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী হইয়া আছে। সেখানে সে আপনাকে আপনি প্রদক্ষিণ করিয়া যে গীত গাহিয়া থাকে, তাহাতে মানুষের হাসি-কান্নার ধ্বনি নাই—প্রতিধ্বনিমাত্র আছে; তাহাতে মানুষের বাস্তব দেহ-দশার প্রতিই সেই সশ্রদ্ধ সহানুভূতি নাই, যাহা না থাকিলে কবিকেও অমানুষ হইতে হয়। ইহাই ভাবিয়া তিনি সময়ে সময়ে বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করিতেন। তাই একবার বড় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী, দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়
রেখোনা বসায়ে!

*

সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুদিন করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন, তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,

বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল। যেদিন জগতে চলি আসি
কেন মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশী ?
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার-সীমা।

কিন্তু সেদিনও এই আবেদনে একটা প্রবল আত্মধিক্কারমূলক বাসনাই ছিল, তাহার বেশী কিছু ছিল না। তখন তাঁহার কবি-স্বভাবেরই উন্মেষকাল, তাই লোকালয়ে ফিরিবার—জাতির জীবনে যুক্ত হইবার—আকুল উৎকণ্ঠার মধ্যেও, তিনি তাঁহার জরা ও যৌবন উভয়েরই সেই এক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর—তাঁহার সেই দিব্যলোকবাসিনী কাব্য-লক্ষ্মীর ধ্যানেই শেষে সকল লজ্জা সকল আক্ষেপ নিবারণ করিয়াছিলেন ; তখনও তিনি গাহিলেন—

"দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি ; তারি মাঝে যাব অভিসারে
তাঁর কাছে, জীবনসর্ব্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।—কে সে ? জানিনা কে, চিনি নাই তারে !
শুধু এইটুকু জানি, তাঁরি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী, যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

এই 'অন্তর-প্রদীপখানি'র কথাই আজ আমি বলিতে বসিয়াছি ; রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে—নিজের জীবনব্যাপী সেই সাধনার মূলমন্ত্র সম্বন্ধে—কখনও কোন কালে ভুল করেন নাই। কবি তাঁহার পূর্ণ যৌবনকালে, কবি-শক্তির উন্মেষের ক্ষণে, একটা স্ববিরোধী প্রেরণার প্রতিক্রিয়া-মুখে অনেকটা আবেশবিহ্বল অবস্থায় এই যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যে কত সত্য তার প্রমাণ—এই কবিতার শেষ কয় পংক্তি আজ যখন আমরা পাঠ করি, তখন স্পষ্টই মনে হয়, কবিজীবনের সুদীর্ঘ সাধনার অবসানে, উহাই যেন রবীন্দ্রনাথের শেষ উক্তি—কবির সদ্য-নীরব কণ্ঠধ্বনি এই শ্লোকগুলির মধ্যেই যেন এখনও শোনা যাইতেছে—

তারপর দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে

উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহারা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন-বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমা-লক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্ম-পরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচির-সঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অন্তিম ক্ষমা। হয় ত' ঘুচিবে দুঃখ-নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেম-তৃষা।

—ইহারই সাধনা কবি সারাজীবন ধরিয়া করিয়াছিলেন! সেদিন ও আজিকার মধ্যে মাত্র এইটুকু তফাৎ যে, কবির মনে শেষে আর কোন সংশয় ছিল না; তিনি এইখানেই তাঁহার সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এই জীবনেই দেবী প্রসন্নবদনে ভক্তের কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই কথাই পরে বলিব।

২

আজ রবীন্দ্র-জীবনের দীর্ঘ যাত্রাশেষে, বিদায়কালীন তাঁহার সেই মূর্ত্তির পাশে, আমার সেই প্রথম-দেখা মূর্ত্তিটিকে স্মরণ করিতেছি। সেই যৌবন আর এই জরা—এই দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে? কালের ব্যবধান আছে, ভাবেরও আছে কি? আমরা জানি, তাঁহার কল্পনা নব নব ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া সেই ব্যক্তিত্বকে বহুরূপী করিয়াছে। তথাপি সে কল্পনা কি চিরদিন ভাবের একটা ভ্রূমধ্য-বিন্দুতে সংবদ্ধ ছিল না? রবীন্দ্রনাথ যখন অনতিকাল পরেই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি- বিশেষ মমত্ব সংবরণ করিয়া নির্ব্বিশেষ মানবপ্রেমের সাধনায় অগ্রসর হইয়া চলিলেন, তখন কি তাঁহার কবিচিত্তে কোন ভাবান্তর ঘটিয়াছিল? ভাবে ভাষায় ছন্দে, রচনার নিত্য-নূতন আদর্শ-সন্ধানে, তাঁহার কবি-মানস যে নিরন্তর বৈচিত্র্য কামনা করিয়াছে, তাহার মূলে কোথায় সেই ঐক্যসূত্র আছে যাহা আবিষ্কার করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিধর্ম্মের মত তাঁহার কবিধর্ম্মও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে? আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা

প্রতিভাকে যে অর্থে নবনবোন্মেষশালিনী বলিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কেবল সেই অর্থেই নবনবোন্মেষশালিনী নহে; কাব্যের অন্তরালে যে কবি-পুরুষ থাকে—রবীন্দ্র-কাব্যের সেই কবিপুরুষও যেন নিত্য নবীনরূপে আমাদিগকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছে। তথাপি রবীন্দ্র-কাব্য তথা সাহিত্যের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলে, এত রূপান্তর সত্ত্বেও, কবির একটি স্থির মূর্ত্তির দর্শন লাভ দুরূহ হইবে না—যৌবন ও জরার মধ্যে কোন ব্যবধান আছে বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু সে কোন্ দিকে, কোথায়?

এ প্রশ্ন প্রায় কেহ করে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখিতা, রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুবিষয়িতার বিস্ময়পূর্ণ আলোচনাই হইয়া থাকে; তাহার সেই নানা ভাব ও নানা রূপের সমন্বয়-চেষ্টাও যেভাবে হইয়াছে তাহার মূলে আছে সেই এক কথা—'বিশ্ব' বা 'ভূমা'; ইহাও আমরা শিখিয়াছি রবীন্দ্রনাথেরই মুখ হইতে, এবং তাহার যে-অর্থে আমরা সন্তুষ্ট হই, রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যাকালে সে অর্থ আমাদের মনে থাকে না। তখন ভূমার যাহা সাক্ষাৎ-বিরোধী, সেই সকল তত্ত্ব ও মতবাদ তাহার উপরে—যেখানে যেমন প্রয়োজন—আরোপ করিয়া, আমরা সেই সাহিত্যের নানাত্বই স্বীকার করি; এক-এক জন এক-এক দিক দেখাইয়া অন্ধের হস্তীদর্শন সম্পন্ন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্ত্তি ও কবি-মানসের অতি নিপুণ দার্শনিক ব্যাখ্যাও আমরা শুনিয়াছি, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু কাব্যরস উবিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কোন দার্শনিক তত্ত্বের কবি-ভাষ্য রচনা করেন নাই; তিনি কবি—কাব্য-রচনাই করিয়াছেন। কাব্যে কবিশিল্পীর পক্ষে রূপচর্য্যাই স্বাভাবিক, সেই রূপ-বৈচিত্র্যই আমাদিগকে উপভোগ করিতে হইবে; তাহার মধ্যে কোন ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করাই ভুল—'একে'র সজ্ঞান তত্ত্বনিষ্ঠা কবির কাব্যপ্রেরণারও অনুকূল নয়। রবীন্দ্রনাথের 'এক' কোন তত্ত্ব নয়, সে তাঁহারই 'আমি'—যে-আমি বাহিরের এই বস্তু-বিশ্ব বা জীবন-দৃশ্যকে জ্ঞানের বিষয় করে নাই, রসাস্বাদনের বিষয় করিয়াছে মাত্র। তাহার নিকটে আত্মজ্ঞান ভিন্ন আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই—এবং সে জ্ঞানও আনন্দের আত্মপ্রত্যয়, কোন ন্যায় বা নীতির—কোন নিয়তি-নিয়মের সংস্কারই তাহাতে নাই। তাই সে সাহিত্যের যত-কিছু জটিলতা ও বৈচিত্র্য, সে জীবনের যত কিছু প্রয়াস-প্রচেষ্টা, সে চিত্তের যত কিছু ভাবান্তর—সকলই একটি অন্তঃস্থির দীপশিখার অস্থির রশ্মি-বিকিরণ

বলিয়া মনে করিতে হইবে; ভিতরে ভাবস্থির আত্মোপলব্ধির আনন্দ, উপরে রূপ-চঞ্চল মানস-রশ্মিপ্রবাহ। রবীন্দ্র-কাব্যের মূল প্রেরণা—এই ভাব ও রূপের সঙ্গতি-সাধন; সেজন্য তাঁহার কবিচিত্ত যেমন আকুল আগ্রহে সর্ব্ববিধ বিরোধ ও বৈচিত্র্যকে বরণ করিয়াছে, তেমনই, সারাজীবন ধরিয়া কবি যে সাধনা করিয়াছেন তাহা এই বিরোধকে—এই বেসুরাকে—বশ করিবার জন্য। বিরোধ থাকুক, তাহাকে মানিব না—এই যাহার সাধন-মন্ত্র, তাহার জীবনে ও তাহার কাব্যে কোনরূপ বিরোধকে গ্রাহ্য করিবার লক্ষণ যে থাকিবে না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কবির সব-চেয়ে বড় আশ্বাস এই যে—বাহিরের এই নানা রঙের নানা রূপের যে বসনখানি তিনি একদা গানের সুরে রচনা করিয়া তাঁহার মনের সজ্জা-সাধ মিটাইয়াছিলেন, তাহাও শেষে আর থাকিবে না—

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ-মন ভূমানন্দময় হবে।
*　　*　　*
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাও তত্ত্বকথার মত হইল; উপায় নাই। যাহা উপলব্ধির বস্তু, যাহা অপরোক্ষ করিবার বিষয়—সজ্ঞান মনের জিজ্ঞাসায় যে দ্বন্দ্বের অবসান নাই, সে দ্বন্দ্ব-নিরসনের চেষ্টাই বৃথা। কবির উৎকৃষ্ট রসচৈতন্যে যাহা নির্দ্বন্দ্ব হইয়া—অর্থাৎ সকল যুক্তি, সকল নীতি-নিয়ম বা ব্যবহারিক সত্যনিষ্ঠার দায় হইতে মুক্ত হইয়া—কেবল অস্তিত্বমাত্রের আনন্দস্বাদ হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাকে বুঝাইবার ভাষা নাই, বুঝাইতে গেলেই তাহা আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরালে যে কবি-পুরুষ রহিয়াছে—যে আপনাকে সেই কাব্যের রূপ-দর্পণে শত ইঙ্গিতে সহস্র ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকেই অপরোক্ষ করিতে হইবে; এবং সেই অপরোক্ষ করার একমাত্র উপায়—সকল দার্শনিক মতবাদ, সামাজিক নীতি বা রাষ্ট্রীয় মঙ্গল-অমঙ্গল সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া, রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরটি বার বার কাণ পাতিয়া শোনা—প্রাণ মনকে অতিশয় ঋজু করিয়া সেই সুরের মুখে স্থাপন করা। রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল ও বিচিত্র বাণী-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার সকল কক্ষ পার হইয়া সেই একটি কক্ষে উপনীত হইতে হইবে—যেখানে কবি তাঁহার মনের সকল অভিমান ও

ঐশ্বর্য্য মোচন করিয়া নিভৃতে আপন হৃদয়-লক্ষ্মীর সহিত কেবলমাত্র সুরের কটাক্ষ বিনিময় করিতেছেন। অথবা, এমন স্থানে এমন অবস্থায় কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, যখন কবির মুখেই শুনিতে পাইব—

> এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
> ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে,
> —এনেছি শুধু বীণা,
> দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

৩

রবীন্দ্রসাহিত্য একটি বহুরূপময় বিচিত্র শিল্পসম্ভার, তাহাতে নব নব রেখা ও বর্ণবিন্যাসের অন্ত নাই। সেই বর্ণ ও রেখার বুনানীতে মানবমানসের অতি সূক্ষ্ম উৎকণ্ঠা এবং সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ানুভূতির ইন্দ্রজাল ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব্ব কৌশলে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও মুখ্যত ভাবাত্মক—সেই ভাষা ও সেই ছন্দ রূপকে বরণ করিয়াও অপরূপেরই আরাধনা করে। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত বা কাব্যপ্রেরণা এতই অভিনব, এতই অনন্যসাধারণ—যে, কোন পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত সাহিত্যিক আদর্শে তাহার বিচার, পরিচয়, বা উৎকর্ষ-প্রমাণ সম্ভব নয়। এ সাহিত্যে ব্যক্তি-সত্তার যে একটি অদ্ভুত প্রকাশ ঘটিয়াছে, যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মন্ত্রের সাধনা ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে—আমাদের দেশে সে সাধনা নূতন নয়, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে সাধনা দেশকালকে অতিক্রম করিবার সাধনা—তাহা কখনও এমন করিয়া দেশ-কালের অবিরাম চলচ্চিত্র-ছায়াকে কাব্যের প্রেক্ষাপটে প্রক্ষিপ্ত করিয়া এমনতর সিদ্ধিলাভ করে নাই। ভারতীয় সাধনার যে বিশিষ্ট ধারায়—যে বহুভাবজটিল ঐতিহ্যের গভীর গহনে—ইহার মূল নিহিত আছে, তাহা হইতেও পূর্ব্বে এ জাতীয় কবিপ্রতিভার উদ্ভব হয় নাই, ইহাই বোধ হয় এ প্রতিভার আধুনিকত্ব। আজ সেই নিঃসঙ্গ নির্জ্জন সাধনার গুহা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; জগৎ ও জীবনকে অন্তরালে রাখিয়া—কালকে অগ্রাহ্য করিয়া—কেবল সর্ব্বরূপরাগবর্জ্জিত শাশ্বতের ধ্যানে বসিলে শাশ্বতকেই যেন সর্ব্বস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা হয়। একালে জীবন-চেতনা এতই বাড়িয়াছে, জগৎ-দৃশ্য মানুষের মনকে এত দিক দিয়া এত

ভাবের আক্রমণ করিয়াছে যে, অনিত্যের আস্ফালনে সেই নিত্যের আসন টলিয়াছে। তাই আজ সেই শাশ্বত-পন্থী ভারতের আত্মাই যেন রূপের আসরে অরূপকে নামাইয়া আপনার সঙ্গে নূতন করিয়া বোঝাপড়া করিবার জন্ম কাব্যকেই সাধন-পন্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা এক অর্থে যেমন প্রাচীন, আর এক অর্থে তেমনই আধুনিক ; সেই প্রাচীন উৎস হইতেই যে ধারা কাব্যরূপে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে আধুনিক জীবনের তটচ্ছায়া ও আধুনিক মানসের খরসূর্য্যালোকিত আকাশ—দুই-ই পূর্ণ-প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তথাপি সেই ছায়া তাহার বুকের উর্ম্মিশোভা বৃদ্ধি করে, পথের উপল-রাশি তাহাকে গীতিমুখর করে মাত্র ; আকাশের সেই সূর্য্যকর তাহার অন্তরের শীতলতাকে আরও মধুর করিয়া তোলে। দেশ ও কালের প্ররোচনা সে কোথাও রোধ করে নাই, কিন্তু তাহার প্রভাবকেও সে এড়াইয়া গিয়াছে। সে স্রোত আপনার গতিবেগেই আপনি মুগ্ধ, আপনাতেই আপনি তৃপ্ত। তাহার আত্মার সেই আনন্দময় নিত্যসত্তা—অস্তিত্বের সেই কালবিজয়ী নির্ম্মল স্রোত-ধারা—কোন চিহ্ন কোন কলঙ্ক কখনও ধারণ করে না ; কিছুই তাহাকে বাঁধিতে পারে না, কারণ তাহার নিকটে সকল বন্ধনই লীলাচ্ছলে আত্মসমর্পণ ; আপনাকে মুগ্ধ করিবার জন্য আপনার দ্বারাই মোহসৃষ্টি।—

> আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
> তোদের আছে ?
> আমি যে বন্দী হ'তে সন্ধি করি
> সবার কাছে॥
> আমারে ধরবি ব'লে মিথ্যা সাধা,
> আমি যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা,
> কেবলি এড়িয়ে-চলার ছন্দে তাহার
> রক্ত নাচে॥

অতএব রবীন্দ্র-কাব্যের একেবারে মূলে—প্রাচীন বা আধুনিক, বিগত বা বর্ত্তমান মানব-সংসারের কোন নিয়তি-নিয়মের প্রেরণা নাই, কোন প্রয়োজন-চেতনাই নাই। ইহার নিজস্ব মূল্য যেমন সংসার সমাজ বা রাষ্ট্রঘটিত কোন ভাবনা—কোন ইজ্‌ম্ (-ism)-এর দ্বারা যাচাই করিয়া লইবার নয়, তেমনই, প্রত্যক্ষ-প্রয়োজনাধীন মানবজীবন সম্বন্ধে কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠাও ইহার দ্বারা সম্ভব

হইবে না। রবীন্দ্রনাথ নামক একটি ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া মানবচৈতন্যের যে এক প্রকাশ সাহিত্যে ঘটিয়াছে, সাহিত্যের ইতিহাসে তেমনটি আর ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। কিন্তু ভাষায় ছন্দে যাহা কখনও এমন রূপময় হইয়া উঠে নাই, মানব-চৈতন্যের সেই নিগূঢ় উপলব্ধি—দূর প্রান্তরপারের অপরূপ গোধূলি-আলোর মত, কত মৌনী সাধকের নিঃসঙ্গ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিয়াছে। এতকাল পরে ভারতবর্ষে এমন এক কবির উদয় হইয়াছে, যিনি সেই সন্ধ্যাকালের নিত্য-বিলীয়মান আলোকচ্ছটাকে ধরণীতলের সর্ব্বত্র, এবং দিবালোকের সকল প্রহরে ব্যাপ্ত ও দীপ্ত করিয়াছেন; সেই আলোর সেই আভাটিকে, সেই স্থির নিস্পন্দ শান্ত জ্যোতিকে, তিনি মধ্যাহ্নের খর-ঝঙ্কার আলোক-বীণায় স্পন্দিত করিয়াছেন।

কিন্তু ইহা সম্ভব হয় কেমন করিয়া? মৌন এমন মুখর, গূঢ় এমন প্রকাশ হয় কেমন করিয়া? আমরা জানি, যাহা প্রকাশ তাহাই সাহিত্য—তাহাই কাব্য, তাহাই সৃষ্টি; কবির আত্ম-দর্পণে বাহিরের রূপের যে ছায়া পড়ে তাহাকেই নূতন কায়া দান করা কবির কাজ। সেই ছায়ার সহিত কবির মনের মায়া জড়িত হইয়া যাহার সৃষ্টি হয় তাহাই বাণীর আকারে একটি নূতন কায়া; কিন্তু যতই নূতন হউক, তাহা ঐ বাহিরের কায়ারই একটা প্রতিরূপ। কাব্যসৃষ্টিতে ইহাই কবিকল্পনার কাজ—বিশেষত, গীতি-কবিতায়। কিন্তু এ কবির কল্পনা আরও স্বরাট, আরও স্ব-তন্ত্র; আমি রবীন্দ্র-কাব্যের মূল-প্রকৃতির কথাই বলিতেছি। এখানে কাব্য অর্থে, কবির চিত্তফলকে প্রতিবিম্বিত ও রূপান্তরিত—জগতেরই একটা প্রতিচ্ছায়া নয়; এ যেন বহিঃসৃষ্টির আধারে কবিরই আত্মার বিসৃষ্টি, বা প্রক্ষেপ। ভিতরে যে 'আমি', বাহিরেও সেই 'আমি'; এক 'আমি' যেন দুই ভাগ হইয়া আপনাকেই আপনি—একটি মধুর ছলনা বা লীলার সাহায্যে—উপভোগ করিতেছে! কেবল এই. উপভোগ করাটাই কিন্তু কবির কাজ নয়; তেমন কাজ অনেক সাধক, অনেক তত্ত্বরস-রসিক (Mystic) করিয়াছেন ও করিবেন। সেই উপভোগের আনন্দকে বাণীর সাহায্যে আমাদিগের অন্তরগোচর করাই কবির কাজ—এবং গানের সুরে তাহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা গীতি-কবির চরম সিদ্ধিলাভ। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যই এইরূপ গান, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা শুধুই 'লিরিক' বা গীতিধর্ম্মী নয়—আরও গভীরতর অর্থে সঙ্গীতাত্মক। কবি-কল্পনার এই প্রবৃত্তি ও পরিণতির

মূলে ভারতীয় ভাব-সাধনার রীতিই সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অনুভূতি অরূপের অনুভূতি, তাহাই এতকাল পরে ভাষায় এমন রূপ পাইয়াছে; যাহা বাক্যবিরহিত, যাহা একক, স্থির, অনুদ্বেল, তাহাই এমন বহু-বিচিত্র, চঞ্চল, পরিবর্ত্তমান প্রবাহের রূপ ধারণ করিয়াছে—রূপের সহিত অরূপের এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে এই অঘটন সংঘটনের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব হয়, সে প্রশ্ন অবান্তর; কারণ, যাহা রহস্য তাহাই কাব্যে যখন রস-রূপ ধারণ করে, তখন আর কোন প্রশ্নই থাকে না—জিজ্ঞাসায় যাহা পরোক্ষ, আস্বাদনে তাহা অপরোক্ষ হয়। তখন কবির ভিতরকার সেই 'আমি' এই রহস্যের স্বপ্নাবেশে গাহিয়া উঠে—

হৃদয় আমার প্রকাশ হ'ল
অনন্ত আকাশে,
বেদন-বাঁশী উঠ্‌ল বেজে
বাতাসে বাতাসে।
এই যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হ'য়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে॥

আবার—

যে-আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে॥
ও-যে সদাই বাইরে আছে
দুঃখে সুখে নিত্য নাচে
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে॥
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে
একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে॥
যে-আমি যায় কেঁদে হেসে
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে
অন্য আমি উঠ্‌তেছি গান গেয়ে॥

কিন্তু তবু—

> এই-যে আমি ঐ আমি নই
> আপন মাঝে আপনি যে রই,
> যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে
> মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
> শান্ত আমি, দীপ্ত আমি,
> ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে॥

—এই দুই আমি তত্ত্বও অতি পুরাতন, ইহাই শ্রুতির সেই—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—দুইটি সুন্দর পক্ষী, দুই সখা, পাশাপাশি একই বৃক্ষে বসতি করে; তাহাদের একজন স্বাদু পিপ্পল-ফল ভক্ষণ করে, আর একজন নিজে না খাইয়া অপরের পানে চাহিয়া থাকে"। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই দুই-আমির আরও নিকট সহযোগিতা ঘটিয়াছে, তাই তিনি ঋষি না হইয়া কবি। এখানেও সেই দেখা আছে বটে, কিন্তু সেই দেখা ভোগ-সম্পর্কশূন্য নয়—সেই দেখারই আনন্দে অপর 'আমি'-পাখীটি গানে গানে দিঙ্‌মণ্ডল প্লাবিত করিয়াছে।

৪

রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরালে এই যে কবিপুরুষ—ইহার সংজ্ঞা কি? ইহা কি আমাদের সাধারণ অর্থের সেই Personality? এই দুই আমির লুকা-চুরির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি-আমি স্পষ্ট হইয়া উঠে? Personality-র যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে নিশ্চয়ই একটা আছে; কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ ছাপাইয়া যে কবি-ব্যক্তি—যাহাকে আমি কবি-পুরুষ বলিয়াছি—তাঁহার কাব্যের মর্ম্মমূলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং যাহা মানুষটি হইতে পৃথক একটি কবি-অভিমান মাত্র নয় (কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা তাঁহার জীবন-সাধনা হইতে স্বতন্ত্র নয়) কবির সেই যে অন্তরঙ্গ সত্তাকে আমরা তাঁহার কাব্যের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুভব করি, তাহাকে কোন্ সাইকলজির দ্বারা চিনিয়া লওয়া যায়? সেই দুই 'আমি'র মিলনক্ষেত্রস্বরূপ এই যে এক ব্যক্তি-চৈতন্য—এখানে এক আমি সর্ব্বদা আর-এক আমির মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া বিলাইয়া দেয়, ব্যক্তি আপনাকে অস্বীকার করিয়াই আপন ব্যক্তিত্বের ঘোষণা

করে। তুই-আমির এই দ্বন্দ্বে মিলন ও বিরহ একই কালে নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র ধ্যানেও যে ব্যক্তিগত অভিমান আছে—পরমুহূর্ত্তেই তাহা বিশ্বদেবতার ধ্যানে লয় পায়—

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুর মেলাতে॥
আমার একতারাটির এই তারে
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে॥

—একথা তিনি বার বার বলিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই।—

বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া;
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার
নুইয়ে দাও॥

কবির কবিতা যখন একেবারে গান হইয়া উঠে নাই—যখন ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে সেই ব্যক্তি-আমি আরও ঘন রূপ-রস পান করিতেছে, তখনও কবির সেই এক কথা—

দেহে আর মনে প্রাণে হ'য়ে একাকার
একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার॥
...একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।...
তোমার মিলন-শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ॥

—এই যে 'আমি', ইহার ব্যক্তিত্বকে কোনও মনস্তত্ত্ব বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির জাল ফেলিয়া ধরা যাইবে না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক্‌ও নহেন—মিষ্টিক হইলে, তাঁহার কবিত্বই নিষ্ফল

হইত ; যাহা কখনও কাব্যে ধরা দেয় নাই তিনি যে তাহাকেই কাব্যে এমন করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন, ইহাই ত' রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যসাধারণ গৌরব। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানকে এতটুকু কোথাও আবৃত হইতে দেন নাই ; তাঁহার সাধনা অতিশয় আত্ম-সচেতন একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, চোখ বুঁজিয়া নয়—

অপরূপকে দেখে গেলেম দুইটি নয়ন মেলে—
পরশ যারে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা।

—বহিরিন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া কোন অচেতন-চেতনায় পাওয়া নয়, 'দুইটি নয়ন মেলে' এবং 'সকল দেহে' তিনি সেই পরম বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতে চান। ইহার মূলে যে আত্মজ্ঞানের আনন্দ আছে—সে জ্ঞানের সাধনা করিতে হইলে মনের সকল দুয়ার খুলিয়া জগৎকে প্রবেশের অধিকার দিতে হয়। এই সদা-জাগ্রত চেতনার বিরাম নাই, তাই ইহা মিষ্টিকের সাধনা নয়—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না,
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে,
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করব যবে
বেচা-কেনা॥

রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরালে যে কবিপুরুষ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম ; ইহা হইতেই, রবীন্দ্র-কাব্য বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের যাহা সৃষ্টি-অংশ তাহার আদর্শ ও প্রেরণা সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা সম্ভব হইবে। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নাই, আমি কেবল সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার অন্য কোন সাহিত্যের মাপকাঠিতে করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয় ; তাহা এমনই অনন্যসাধারণ যে, তাহার জন্য সাহিত্যের একটি নূতন

সংজ্ঞা নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রচলিত আদর্শে যাচাই করিলে, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উদ্যত হইয়া আছে, তাহার অনেকখানিই স্বীকার করিতে হয়। আমি ইতিপূর্ব্বে নানা প্রবন্ধে ও নানা প্রসঙ্গে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এ প্রসঙ্গেও সেই দুই-'আমি'র তত্ত্ব কাজে লাগিবে। জগৎ-দৃশ্যের একান্ত সম্মুখীন সুখ-দুঃখের ভোক্তা যে 'আমি', সাহিত্যে আমরা তাহার যে-রূপ দেখিতে পাই—রবীন্দ্র-কাব্যেও ঢেউয়ের দোলায় দোল-খাওয়া সেই 'আমি'র সকল উৎকণ্ঠা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সুষমায় বিচিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, সুখ-দুঃখের সেই তরঙ্গরাজির কলরোল নয়, তাহার মধ্যে যে 'মৃদঙ্গ-তাল' আছে, কবি তাহারই সহিত তাঁহার গানের সুর মিলাইয়াছেন; ভোক্তা নয়—দ্রষ্টা যে 'আমি', তাহারই রস-দৃষ্টি সে সাহিত্যে মানুষের জীবনকে ভিন্নতর ভাবভূমিতে তুলিয়া ধরিয়াছে। এ সাহিত্য, মানুষের প্রকৃতিগত যে জীবন-চেতনা তাহাকেই গভীর করিয়া তোলে না, সেই দেহগত আকুতিকেই একটি গভীরতর প্রাণধর্ম্মের মহিমা-বোধে চরিতার্থ করে না। ইহার কাজ স্বতন্ত্র; ইহা মানুষের মনকে মুক্ত করে, ক্ষুধাকে শান্ত ও সংযত করে, সুখ-দুঃখবোধকে বহির্মুখী না করিয়া আত্মানুভূতির সহায় করিয়া তোলে; অতি তুচ্ছকেও দুর্ল্লভতার আসনে বসাইয়া জড়ের উপরে চিৎ-এর জয় ঘোষণা করে। সর্ব্বোপরি, ইহা মানুষকে এমন একটি মন্ত্রে দীক্ষিত করে যাহাতে, এই জগৎ—এই মানুষের মেলা—একটি পরম-সুন্দর পরম-পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে হয়। এইজন্য, অপর সাহিত্যকে যদি 'Literature of Power' বা প্রাণমূলে শক্তিস্ফুরণের সাহিত্য বলা সঙ্গত হয়, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে এই অর্থে 'Literature of Culture' বলা যাইতে পারে যে, তাহা কোনরূপ শক্তি নয়—একটি সূক্ষ্ম রসবোধের দ্বারাই চিত্তের এমন উৎকর্ষ সাধন করে যে, আকাশের মতই তাহা মুক্ত ও প্রসারিত হয়; নদীর মত, তটের শাসন মানিয়াই গভীর ও বেগবান হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ করিব। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেরণা যে একান্ত ভারতীয় তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই, বাঙালী ভিন্ন আর কোন কবির পক্ষে ঐরূপ কাব্য-সাধনা যে সম্ভব হইত না, ইহাও অতিশয় সত্য; ইহা জাতিগত অভিমান বা অবুঝ গর্ব্বের কথা নয়: বাঙালী-জাতির ইতিহাস, তাহার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটু জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই আমার ঐ

উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন,—যিনি সে তত্ত্ব অবগত আছেন তিনিই রবীন্দ্র-কাব্য ও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী কবিপুরুষকে উত্তমরূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবেন ; নতুবা, কেবল 'বিশ্বকবি' বলিয়াই অভিহিত করিলে রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ পরিচয়ে বাধা ঘটিবারই সম্ভাবনা।

৫

আমি রবীন্দ্রনাথের বহির্জীবনের যে রূপ প্রথম দেখিয়াছিলাম, এ আলোচনার আরম্ভে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি ; এক্ষণে পুনরায় তাহার কথা কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সেই প্রথম দেখার পরে রবীন্দ্রনাথকে অতি নিকটে ও দূর হইতে দেখিবার বহু সুযোগ আমার হইয়াছিল ; কিন্তু আমি তাঁহার সেদিনের সেই রূপই আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের দেহে পরিণত যৌবনের সেই দীপ্তি উত্তরকালে ম্লান হইয়া আসিলেও, তাঁহার মন সেই দীপ্তির পরিচয় শেষ পর্য্যন্ত বহন করিয়াছে। সে দিনের রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের—বাংলার ও ভারতের—রবীন্দ্রনাথ ; তখন তিনি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ (National Council of Education)-এর একজন প্রধান কর্ম্মী ; পরে তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্ব-ভারতীর রবীন্দ্রনাথরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তথাপি আমার মনে হয়, এ দুই-এর মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা তাঁহার সেই যৌবন, এবং যৌবন-অতিক্রমের পার্থক্য মাত্র ; একটিতে প্রাণের বন্ধন-মোচনের উৎসব, অপরটিতে সেই প্রাণকে বাঁধিয়া ক্ষতিভয়গ্রস্ত মনের সঞ্চয়-কামনা। কিন্তু দুইটিতেই, 'এবার ফিরাও মোরে'—কবির সেই আর্ত্ত আবেদন সমান নিষ্ফল হইয়াছে, ভাবে বা কর্ম্মে—কোথাও তাহা বস্তুর বাস্তবতাকে বরণ করিতে পারে নাই। অতএব, দুইই যখন এক, তখন আমি কবির সেই পূর্ব্বেকার রূপটিকেই অধিকতর বরণীয় মনে করি, কারণ, তাহাতেই তাঁহার কবি-মানস মাটিকে একটু অধিক স্পর্শ করিয়াছিল। সেদিন কোন নিভৃত শান্তিনিকেতনে নয়—রাজধানীর অশান্তি-নিকেতনে, সেই কোলাহলময় জনারণ্যে—কবির যৌবন-শেষের সেই পুরুষমূর্ত্তির ললাটে ও মুখমণ্ডলে যে আকস্মিক দিব্যদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার সেকালের রচনাতে এখনও তাহা অম্লান হইয়া আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তর-গহনের যে কবিরূপের কথা বলিয়াছি—কবি নিজেই যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—তাহার আলোকে সেই

দিকে চাহিলে বুঝা যাইবে, কবির কবি-স্বপ্ন এ সকলের কোনটাতেই বাঁধা পড়ে নাই। নিজের ইষ্ট-দেবতা রবির উদ্দেশে সাবিত্রী-মন্ত্র পাঠ করিয়া কবিই বলিয়াছেন—

তেজের ভাণ্ডার হ'তে কী আমাকে দিয়েছ যে ভরে'
কে-ই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা
মুহূর্ত্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় স'রে।
তেমনি সহজ হোক হাসি কান্না, ভাবনা বেদনা
না বাঁধুক মোরে॥

'না বাঁধুক মোরে'—ইহাই কবির আত্মার নিগূঢ় কামনা। যখন যাহার পালা তখন সেই সঙ্গে থাকুক—

ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডব-লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়—
সঙ্গে যেন থাকে।

কিন্তু—

তার পরে তারা যেন সর্ব্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে॥

ইহার কারণ কি, কবি অকপটে সেই স্বীকারোক্তিও করিয়াছেন—

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্চ্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কি মত্ততায়, কি আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্য পথে হ'য়ে বিবাগিনী
ল'য়ে তার ডালি,
সে কি তব সভাতলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালী॥

এই 'বিবাগিনী রাগিণী'ই রবীন্দ্র-কবিপুরুষের প্রাণের রাগিণী—ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যের আদি ও অন্ত্য সুর। এই রাগিণীই একদা যে অপূর্ব্ব অনুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল তাহা যেমন ভুলি নাই, তেমনই, এই 'আলোর কাঙালী'কে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে না পারিলে তাহার স্বপ্নের নানা বর্ণডোরে-বোনা বাণীর সেই দুকুল-বাস—ভুবনের অঙ্গনে আঁকা রূপ-কল্পনার সেই ইন্দ্রজাল—যাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুছিয়া যায়, তাহার মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিব না।

বাংলার রবীন্দ্রনাথ

আজ রবীন্দ্রনাথের ঊন-অশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে আপনারা যে উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি, এ অনুষ্ঠান যেন সর্ব্বপ্রকারে সার্থক হয়। বড়ই সুখের বিষয় যে, এই অনুষ্ঠানটি বাঙালীর একটি প্রিয় অনুষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছে, পঞ্জিকার পর্ব্বদিনের মত আমরা এই দিনটিরও নিয়মপালন করিতে শিখিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—এক হাজার বৎসরের বাংলা-সাহিত্য, সাধনার সোপান-পরম্পরায়, শেষে যে বাণী-মন্ত্র লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারই সিদ্ধ সাধক। কবি জয়দেব ও বাংলার বৈষ্ণব-মহাজনগণের পদাবলীতে, যে ভাষায় ও যে ছন্দ-গীতে, বাঙালীর হৃদয় মন্থন করিয়া এক অপূর্ব্বরূপা সরস্বতীর উদয় হইল—সেই ভাষা ও সেই সুরের ভাগীরথী-ধারাকে শতমুখে প্রসারিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই সরস্বতীকে বিশ্বের ভাবসাগরসঙ্গমে উপনীত করিয়াছেন ; প্রাচীন ভারতীয় ভারতী ও আধুনিক বিশ্বভারতীকে তিনি এই ভাষারই শব্দে ও ছন্দে তাঁহার অলৌকিক কবি-প্রতিভার বলে সংযুক্ত করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় মহামানবের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; এত বড় গৌরব ভারতের আর কোনও জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে, বৎসরে অন্তত একদিনের জন্যও বাঙালী যেন এই কথা স্মরণ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হয়, এবং ভারতভাগ্যবিধাতাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দেয় যে, ভারতবর্ষের জাতিসকলের মধ্যে তিনি বাঙালীকেই ইহার জন্য বরণ করিয়াছেন।

এই কথাটিই আজ বিশেষ করিয়া আমি আমার জাতিকে স্মরণ করাইতে চাই, তার কারণ, আজ আমরা ভারতের রাষ্ট্রীয় সমাজে পতিত হইয়াছি, ঘরে বাহিরে আজ আমাদের লাঞ্ছনার অবধি নাই। রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব আজ আর শুধুই একটা কবিপূজার উৎসব নয় ; রবীন্দ্রনাথ আজ আমার চক্ষে কেবল বঙ্গসরস্বতীর বরপুত্রই নহেন—তিনি এই অপমানিত, দুর্গত জাতির আত্মমর্য্যাদা ও আত্মপরিচয়ের প্রধান অবলম্বন। বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই

গৌরবময় যুগের সকল নিদর্শন আজ লুপ্ত হইয়াছে; রামমোহন-বিদ্যাসাগর, কেশব-রামকৃষ্ণ, বঙ্কিম-মধুসূদন, বিবেকানন্দ-ব্রহ্মবান্ধব, সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম্ম, ধর্ম্মের এই চতুর্ব্বিধ মার্গে—সেই যুগে এই যে-সব লোকোত্তরচরিত্র বীর-সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহ আজ আর নাই, তাঁহাদের স্থান এখনও কেহ পূরণ করে নাই,—বাঙালী জাতি আজ অসাড় অচৈতন্য হইয়া আছে। এইসকল ক্ষণজন্মা পুরুষ ব্যতীত আরও অনেক শক্তিমান বাঙালী সেকালে দিকে দিকে দেখা দিয়াছিল—সাধারণের মধ্যেও কত অসাধারণের অভ্যাগম হইয়াছে! সমগ্র জাতির মধ্যে সেই যে নবজীবনের স্পন্দন জাগিয়াছিল, তাহার ফলে সারা ভারত মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া সর্ব্বত্র বাঙালীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল। আজ আমরা ধূলায় লুটাইতেছি; দেহে শক্তি নাই, মনে বল নাই, মাথায় বুদ্ধি নাই—প্রতিভা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তথাপি এত অবসাদ ও নিরাশার মধ্যেও সেই পূর্ব্বজীবন ও পূর্ব্বপ্রতিভার নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথ এখনও আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান,—বেদনাবিকৃত মুখে, বাষ্পাকুল নেত্রে, আমরা তাঁহার দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হই—কি ছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের আশা করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের মত কবিপ্রতিভার পূজা আরও কি কারণে কর্ত্তব্য, তাহা বলিব। সাহিত্যেই জাতির জীবন-বহ্নি—তাহার আত্মার আকুতি—অমৃতমন্ত্রে নিত্য দীপ্ত হইয়া থাকে। যে-জাতি তাহার ভাষায় সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে, সে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার রক্ষাকবচ নির্ম্মাণ করিয়াছে,—দেহ-লাঞ্ছনার ঊর্দ্ধে সে আপনার আত্মাকে অক্ষত রাখিবার উপায় করিয়াছে। বাংলাভাষায় সেই অমৃতমন্ত্রের মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-পূর্ব্ব সাহিত্যে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা ভাষার নবজন্ম ও জীবনীশক্তির প্রথম পরিচয় পাই—রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে, আমরা—ভাষার শুধু শক্তি নয়—তাহার আশ্চর্য্য লাবণ্যলীলা দেখিয়াছি; তাহাতে জাতির সর্ব্ববিধ চিন্তা, কামনা ও কল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত ও নিঃসংশয় হইয়াছি। অতঃপর ভাষার আধারে জাতির যে সংস্কৃতি সঞ্চিত ও উপচিত হইতে থাকিবে, তাহারই বলে আমরা শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া যাইব। এইজন্য,

বাঙালীর বাণী-জীবনের পূর্ণতা-সাধন করিয়াছেন যে বিশ্বকর্ম্মা কবি, তাঁহাকে জাতীয় জীবনের একজন প্রধান গঠনকর্ত্তারূপে বন্দনা করিতে আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার যে সার্ব্বভৌমিক আদর্শের দিকে আমরা প্রায়ই দৃষ্টি দিয়া থাকি, তাহাতে কবি-প্রতিভার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ থাকিলেও, জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় সেই অত্যুচ্চ ভাবজগতের লোভ সম্বরণ করাই আমি শ্রেয় মনে করি। কবি যেখানে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে আমরা সকলেই কখনও পৌঁছিতে পারিব না; অথচ কবিকেও আমাদের এই নিম্নভূমিতে ধরিয়া রাখিতে আমরা অবশ্যই চাহিব না। মাটির দীপ হইতে আকাশের তারা পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। নক্ষত্রের পানে চাহিবার অবকাশ আমাদেরও মাঝে মাঝে চাই—আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে সেইরূপ আকাশ-গঙ্গায় স্নান করিবার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু যে মৃৎপ্রদীপের আলোকে এই মাটির উপরেই আমাদের পথ চিনিয়া চলিতে হয়, তাহার শিখা উজ্জ্বল করিবার জন্য কবি আমাদিগকে যে ধনের অধিকারী করিয়াছেন, তাহার জন্যই আমরা তাঁহার কাছে অধিকতর ঋণী। আজ আমরা কবির নিকটে স্বজাতি-প্রেম, স্বদেশানুরাগ, ও স্বধর্ম্মপ্রীতির দীক্ষা নূতন করিয়া পাইতে চাই; কবির গানের সেই মর্ম্মান্তস্পর্শী সুরে বিদ্ধ হইতে চাই, যাহাতে এই দেশের প্রকৃতি ও এই জাতির আত্মা আমাদের সকলকে সর্ব্বসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে এক ভাবের ভাবুক করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা তাহা পাইয়াছি; বাংলার জলমাটি ও বাংলার আকাশ-বাতাসকে তিনি ধ্যানস্বপ্নের সুষমায় বিচিত্রিত করিয়াছেন, বাংলার ঋতুগুলিকে তিনি সকল রঙে ও সকল সুরে তাঁহার গানের ইন্দ্রজালে মূর্ত্তি দিয়াছেন। বাংলার নদ-নদী, বাংলার গ্রাম ও তাহার "অবারিত মাঠ গগন-ললাট"কে তিনি যেমন করিয়া আমাদের চর্ম্মচক্ষে ও মানসনেত্রে, শরীরী ও অশরীরী শোভায় প্রকাশিত করিয়াছেন, বাংলা কাব্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তেমনটি আর কোথাও ঘটে নাই। পুরাণ-ইতিহাসের ঐশ্বর্য্য, নাটকীয় কল্পনার চমকপ্রদ কৌশল, অথবা বিশেষ কোনও ধর্ম্মনৈতিক আদর্শের সাহায্য না লইয়া, তিনিই প্রথম—খাঁটি বাংলাদেশ ও খাঁটি বাঙালী-হৃদয়ের মর্ম্মস্থানকে, বাঙালী-জীবনের অখ্যাত ও অপরিচিত কোণগুলিকে

—অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। এমন করিয়া আমরা আমাদের দেশকে আগে কখনও দেখি নাই; আমাদেরই দেশের নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা ও শিশুর মুখে যে এত সৌন্দর্য্য আছে, আমাদেরই নিভৃত পল্লীকুটীরে, গৃহ-পরিবারের তুচ্ছ জীবনযাত্রায় যে এত গভীর হৃদয়োৎকণ্ঠা, মনের মোহের এমন মাধুরী লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। রবীন্দ্রনাথই তাঁহার কাব্যমুকুরে আমাদের মুখপ্রতিবিম্ব আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, সে মুখে সুন্দর হাসি ও সুন্দরতর অশ্রুর বিকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সকল শ্রেষ্ঠ গানে আমরা বাঙালীসুলভ রসকল্পনার অতি সহজ অথচ গভীর আবেগের পরিচয় পাই। এক কথায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা যেমন বাংলা ভাষার সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য হৃদয়গোচর করিয়াছি, তেমনই তাহার সাহায্যেই বাংলাদেশ ও বাঙালী-জাতির ঘনিষ্ঠতম পরিচয়, অর্থাৎ আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে আর একটা বস্তুকে খুব বড় করিয়া আমাদের চক্ষে ধরিয়াছেন—জাতীয় আত্মমর্য্যাদাবোধ। তাঁহার এই জাতীয়তা-বোধ ভূগোল বা ইতিহাস-সম্পর্কিত নয়—মানুষের সহজ মনুষ্যধর্ম্মের অনুগত। প্রত্যেক মানুষেরই একটা জন্ম বা জাতিগত ধর্ম্ম আছে; আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আমোদ-উৎসবে, ভাষায় ও ভদ্রতায়—সেই জাতিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সে সর্ব্বদা উন্নত রাখিয়া চলিবে, বিজাতির অনুকরণ করিবে না;—বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে এই নীতি লঙ্ঘন করেন নাই, বরং দেশের ইঙ্গবঙ্গসমাজের লজ্জাহীন আচরণের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাই তাঁহার এই মনোভাবের কারণ—অতএব এই দিক দিয়া তিনি শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের প্রতিনিধি। কিন্তু তথাপি আমরা ইহার মধ্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যই প্রত্যক্ষ করি —রবীন্দ্রনাথের বাঙালী-প্রতিভাই ভারতের সংস্কৃতিকে এমন করিয়া অন্তরের সত্য করিয়া তুলিয়াছে; ভারতের আর কোনও জাতি প্রাচীন ভারতের মর্য্যাদাকে এমন করিয়া এ যুগের শিক্ষা-দীক্ষায় উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণবস্তুকে বাঙালীই, রূপে রসে, ধ্যানে ও চিন্তায়, নূতন করিয়া গড়িয়া

তুলিয়াছে; জাতীয়তার সেই আদর্শ বাঙালীর প্রতিভাতেই ধরা দিয়াছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রষ্টা ও প্রচারক—এ দৃষ্টির মূলে বাঙালীর বাঙালীত্বই বিশেষভাবে বিদ্যমান; অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়ে যে দৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয়—কোনও উৎকৃষ্ট ভাব-সত্যকে উপলব্ধি করিবার সেই দৃষ্টি বাঙালী-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ; তাই সেই আদর্শ আর কোনও ভারতীয় জাতিকে তেমনভাবে প্রবুদ্ধ করিল না; নব-জাতীয়তার সেই মন্ত্র প্রায় সকলেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; বোধ হয় সেইজন্যই আজিকার জাতীয় মহাসভায় বাঙালীর স্থান ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

তাই, এই রবীন্দ্র-জন্মতিথির উৎসব-সভায় আমি আজ রবীন্দ্র-প্রতিভার সেই বাঙালীত্বের দিকটাই সকলকে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে বলি। আজ আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথকেই প্রাণের পূজা নিবেদন করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনদেবতার আরাধন-মন্ত্রও গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে,—কবির আত্মা এখন স্বকীয় ইষ্টসাধনার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙালী নহেন ভারতীয় ঋষির সন্তান; কেবল আধুনিক নহেন, সর্ব্বকালের বা কালাতীতের—অমৃতের—পুত্র। কিন্তু এ কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, সাধারণ মানবধর্ম্মও কবির জীবনে অল্প বিকাশলাভ করে নাই, না করিলে তিনি আজ আমাদের মত মানুষের আরাধ্য কবি হইতে পারিতেন না। কৈশোরে, যৌবনে ও প্রৌঢ়বয়সে তিনি এই দেশের সঙ্গে ও জাতির সঙ্গে যেভাবে যুক্ত হইয়া, যে আশা ও নিরাশা—উল্লাস ও বেদনায়—অধীর হইয়াছেন, গল্পে-গাথায়, প্রবন্ধে ও গানে—তাহার দাহ ও দীপ্তি অনির্ব্বাণ হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের বিদেশী ভক্ত ও সমালোচকের দল, তাঁহার বাঙালীত্বের দিকটি অস্বীকার করিয়া দেশজাতিনিরপেক্ষ একটা বিশ্বমানবীয় প্রতিভারূপে তাঁহার সম্মান করিতে চায়; ভারতের অপর প্রদেশেও তাঁহার বাঙালীত্ব বিস্মৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা অল্প নহে। ইহারা ভুলিয়া যায় যে, যে-মানুষ নিজের দেশকে ভালবাসিতে পারে নাই, আপনার জাতিকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে যাহার ইচ্ছা হয় নাই, সে যে মানুষই নয়—এত বড় কবি হওয়া তো দূরের কথা।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ কথা আরও সত্য ; সেই সঙ্গে কেবল এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, দেশ ও জাতির প্রতি তাঁহার সেই মমতা এমন একটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, পরিশেষে সেই সত্যের নিরন্তর সন্ধানে তিনি প্রেমের সকল গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যাহারা বলে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় দেশের প্রভাব বা জাতির জাতিগত প্রেরণা নাই—বাংলাদেশে বাঙালী-জাতির মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব একটা ভিন্নস্তরের প্রাকৃতিক ঘটনা, তাহারা বাঙালীকেও যেমন ঈর্ষা করে, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনই প্রকারান্তরে অসম্মান করে। কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের বংশে বিজাতির রক্ত পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে তৎপর হইয়াছে! ইহার কারণ কি? একটা অর্দ্ধসভ্য ভারতীয় জাতির মধ্যে এত উচ্চ ভাব-কল্পনা, কাব্যসৃষ্টির এমন অনবদ্য কৌশল, এবং জগতের উৎকৃষ্ট ভাবরাশি আত্মসাৎ করিবার এমন মানসশক্তি যে সম্ভব, তাহা কিছুতেই ইহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহারা ঈর্ষায় অথবা নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্বগর্ব্বে অন্ধ, তাহারা দীপ্তসূর্য্যকেও অস্বীকার করে।

কোনও সত্যকার বড় কবি যে স্বয়ম্ভূ বা ভুঁইফোঁড় হইতে পারে না, তাহার একটা বড় প্রমাণ—এ পর্য্যন্ত জগতের কোনও বড় কবি আপন মাতৃভাষায় ভিন্ন অপর কোন ভাষায় কাব্যরচনা করিতে পারেন নাই। এই ভাষার কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি। ভাষাই জাতির জাতীয়তার নিদান, ভাষাই কবির কবিত্বের আদি ও শেষ উপাদান। রবীন্দ্রনাথের ভাষা যদি মূলে খাঁটি বাংলা ভাষা না হয়, যদি তাহা আধুনিক ছোকরা লেখকদের মত ফিরিঙ্গি-ভাষা হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঙালী কবি নহেন, তেমনই তাঁহার কাব্যও উৎকৃষ্ট কাব্য নয়। আর সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল ইহাই ভাল করিয়া বুঝিয়া ও মনের মধ্যে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে যে—জাতি, ভাষা ও সাহিত্য এই তিনের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ যত বড়, তাঁহার ভাষাও তত খাঁটি বাংলা, এবং তিনিও তত বড় বাঙালী। তাঁহার আত্মার যত কিছু উৎকণ্ঠা তিনি যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—সেই ভাষা যাহাদের, তিনি বিশেষ করিয়া তাহাদেরই ; আর সকলে ভাবের দিক দিয়া তাঁহার আত্মীয় হইতে পারে, ভাষার দিক দিয়া নহে। কিন্তু ভাষাই কবির দেহ মন ও আত্মার প্রতীক, অতএব অপর সকলের সেই আত্মীয়তা সহজ ও সুগভীর নয় ; অর্থাৎ, তাঁহার সহিত প্রকৃত রক্তসম্পর্ক

আমাদেরই, অপর সকলের সহিত কেবলমাত্র বন্ধুসম্পর্কই সম্ভব। অতএব, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছে—আমাদের এই বাঙালী জাতির মধ্যেই কত বড় ভাবকল্পনার বীজ নিহিত আছে। যে পর্ব্বতমালার কোন এক শিখর গৌরীশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, তাহার সাধারণ উচ্চতাও সামান্য নহে; ভূপৃষ্ঠের কোথাও এমন একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর দেখা যায় না, যাহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এককভাবে আকাশে উত্থিত হইয়াছে।

এই বৎসরের রবীন্দ্র-জন্মতিথি-বাসরে আমি রবীন্দ্র-বন্দনার আর কোনও মন্ত্র প্রাণের মধ্যে পাইতেছি না; রবীন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া আমি আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির বর্ত্তমান দুর্গতি লাঞ্ছনা ও বিমূঢ়তার কথাই ভাবিতেছি, শোকে দুঃখে লজ্জায় ধিক্কারে অবসন্ন হইতেছি। ভারতে ইংরেজ-অধিকারের যুগ, প্রধানত যে জাতির মনীষায় ও আত্মোৎসর্গে, দাসত্বের অগৌরব হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে, সমগ্র এশিয়াখণ্ডের যে একমাত্র জাতি জগতের আধুনিক সাহিত্যে একটি রঙিন রেখা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে, যে জাতির প্রতিভায় নব্যভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলাশিল্প, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি নূতন রূপে সঞ্জীবিত হইয়াছে, আজ সেই জাতির কি নিদারুণ মূর্চ্ছা ও মোহের অবস্থা! তাই এখনও জীবিত ঐ রবীন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া মনে হয়—এ কি স্বপ্ন! বিগত যুগের বাংলার সেই গৌরব-সৌধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে; চারিদিকে ভগ্নস্তূপ—সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে ভগ্ন-পূজামণ্ডপের স্বর্ণকারুখচিত ঐ যে স্তম্ভটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে, উহার সাক্ষ্য কি মিথ্যা? কিছুকাল ধরিয়া আমাদের মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে, ভাবে চিন্তায় ভাষায় ও সাহিত্যে আমরা বড় অনাচার করিতেছি; আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি। এখন তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে—আসন্ন বিনাশের মহাভয় আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে। আজিকার দিনে আমাদের সেই নষ্টগৌরবের নিদর্শন চাই—কি ছিলাম, কি হইয়াছি, তাহাই বুঝিবার পক্ষে চাক্ষুষ প্রমাণ চাই। একদিন এমনই অবস্থা স্মরণ করিয়া মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"যাহার নষ্টসুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী, তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী।"

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সেই বিগত বৈভবের চাক্ষুষ জীবন্ত নিদর্শন; তাহার সুখ গিয়াছে, কিন্তু সুখের নিদর্শন এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই; চাহিবার স্থান এখনও আছে।*

*নারায়ণগঞ্জ সাহিত্যসমিতির রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির অভিভাবণ।

কবি করুণানিধানের কবিতা

কবি করুণানিধানের কাব্য আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। কিছুকাল হইল কবির কবি-জীবন প্রায় অবসিত হইয়াছে, এজন্য তাঁহার কবিমানস ও কাব্যকীর্ত্তিকে সমগ্রভাবে বুঝিয়া লইবার পক্ষে এখন আর কোন সংশয়ের হেতু নাই। ইতিমধ্যে 'শতনরী' নামে কবির একখানি সুনির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহও প্রকাশিত হইয়াছে; এজন্য পাঠক-সাধারণের পক্ষেও এবিষয়ে সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু করুণানিধানের কাব্য-আলোচনার ভূমিকা-স্বরূপ—আমি এইরূপ আলোচনার প্রয়োজন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে—সাধারণভাবে দুইচারি কথা বলিয়া লইতে চাই।

আমাদের দেশে সাহিত্য-সৃষ্টির একটা যুগ শেষ হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার কোনও একটা আদর্শ বা পদ্ধতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ অবস্থায় সমালোচকের নিজ সমালোচনা-পদ্ধতির একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনায় নানা কারণে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। কাব্য বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি, সমালোচনা অর্থেই বা ঠিক কি বুঝায়, তাহার একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা ভালো। কবির নিকটে আমরা ন্যূনতম কি প্রত্যাশা করি—কবি যত বড় বা ছোট কবি হউন, তাঁহার কাব্যে সত্যকার কবিত্ব আছে কি না, তিনি আদৌ কবি কিনা —তাহার নির্ণয় হয় কিসে, এ সম্বন্ধে একটা ভূমিকার প্রয়োজন আমাদের দেশে এখনও আছে। আমাদের দেশে এ যুগে কাব্য ও কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু কবিতা-লেখক হইলেই কবি হয় না,—বড় কবি, মাঝারি কবি, ছোট কবি বলিয়া একটা শ্রেণীবিভাগ করিয়া এই সকল লেখককে যে কোনও একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া কবি-নামে অভিহিত করিলেই এ সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, একথা ভুলিলে চলিবে না, কোনও লেখকের পক্ষে কবিপদবাচ্য হওয়াটাই তাঁহার প্রতিভার প্রথম ও প্রধান পরিচয়; এ বিষয়ে যদি ভুল হয়, তবে গোড়ায় গলদ ঘটিবে। আশা করি, করুণানিধানের কাব্য-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি সে ভুল করি নাই।

রসিকসমাজেও কাব্য-রস-আস্বাদনে একটা বিঘ্ন আছে; ব্যক্তিগত রুচি বা মানস-প্রকৃতির পক্ষপাত, বিশিষ্ট চিন্তা বা বিশ্বাসের প্রভাব, কাব্যরস-আস্বাদন কালেও অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। কাব্যরস-আস্বাদনে এই ব্যক্তিগত রুচিভেদে হয় ত' আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু কাব্য-সমালোচকের পক্ষে উদার ও অসাম্প্রদায়িক রসবোধের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক কবির কল্পনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে; তাই বলিয়া যদি কবিবিশেষের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের পক্ষপাতী হইতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে—যে সাধারণ রস-প্রমাণ সকল কাব্যেই বিদ্যমান থাকে, সমালোচক সেই বস্তুর সন্ধান রাখেন না। এইখানে কবির কবিত্ব সম্বন্ধে ধারণাটা একটু স্পষ্ট করিয়া তোলা ভালো। কাব্যমাত্রেরই যে সাধারণ রস-প্রমাণের কথা বলিয়াছি—যাহা কোনো বিশেষ কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাহাকে যখন 'কবিত্ব'রূপে উপলব্ধি করি, তখন একটা কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই,—এই রস নির্ব্বিশেষ বলিয়াই, প্রত্যেক কবির কাব্যে ইহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যই কবিবিশেষের 'কবিত্ব'। অতএব কোনও বিশেষ ধরণের কবিত্বের পক্ষপাতী হইলে, এই রসকেই অস্বীকার করিতে হয়। সত্যকার রসিক ব্যক্তির চিত্তে এই রসজ্ঞান আছে বলিয়াই তিনি সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যের অনুরাগী। এই দিক দিয়া আর একটু অগ্রসর হইলেই এই 'কবিত্বের' প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িবে। কবির এই যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, ইহাই কাব্যের মৌলিকতার কারণ; এই মৌলিকতাই যে কবি-শক্তির প্রধান লক্ষণ ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই মৌলিকতা অনুভব করিলেও, বিচারকালে আমরা একটা ভুল করিয়া বসি। এ মৌলিকতা কবিতার ভাববস্তুর উপর নির্ভর করে না—ওই ভাবানুভূতির যে ব্যক্তিগত ভঙ্গি, কবিতার ভাষায়, ছন্দে, শব্দযোজনায়—কাব্যের আকারে ও প্রকারে ধরা পড়ে, তাহাই তাঁহার মৌলিকতা। অতি-সাধারণ বহু-পরিচিত ভাব-বস্তুকে আশ্রয় করিয়াও যে একটি বিশিষ্ট প্রাণ-মনের পরিচয়, রঙে ও রূপে, ভাষায় ও ছন্দে মূর্ত্তি ধারণ করে—কাব্যের diction ও technique-এর অন্তর্গত সেই personality, সেই style-ই—কবিত্ব-রস-আস্বাদনের প্রধান সহায়। এই অনুভূতি যে কাব্যে যত গভীর ও ব্যাপক হয়—জীবনের যতখানি একসঙ্গে ধরা দেয় ও তাহার জটিল বিস্তার একটি

ভাবৈকরস বাণীরূপে প্রকাশ পায়—সে কাব্য তত বড়। কিন্তু কবিত্বের আলোচনায় এই বড়ত্বের কথাই প্রথমে আসে না। কারণ অনুভূতি যেমনই হউক্, তাহাকে যথাযথ প্রকাশ করিতে পারাই কবি-প্রতিভা; এবং অনুভূতির আবেগ সত্য ও সুগভীর না হইলে ভাষায় ও ছন্দে সেই বস্তু ফুটিয়া উঠে না, যাহাকে আমরা 'কবিত্ব' বলি। যে কাব্যে সেই বাণীরূপ নাই তাহাতে ওই অনুভূতির সত্যও নাই; সে রচনায় যদি কোনও ভাব-চিন্তার সমাবেশ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তাহা লেখকের নিজস্ব নয়; সে ভাববস্তু লেখকের কবিজনোচিত অনুভূতি-প্রসূত নয়। অতএব, কবির ভাব-গৌরব বা চিন্তাশীলতাই কবিত্ব নয়—সে ভাব, সে চিন্তা যত গভীর, সূক্ষ্ম বা উচ্চ হউক, এমন কি, মৌলিক হউক—তাহা কবিত্ব নয়। এই কথাটি বুঝিয়া লইলে, কাব্য-আলোচনায় কোনও অবান্তর আদর্শ প্রশ্রয় পাইবে না। অবান্তর আদর্শের উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, অনেকে যেমন সঙ্গীত উপভোগ করিতে বসিয়া, সুর অপেক্ষা কথার কবিত্ব প্রত্যাশা করেন, তেমনই অনেক তথা-কথিত কাব্য-রসিক কবিতায় ভাবের বাণী-রূপ অপেক্ষা—ভাবের ভাবুকতা, তত্ত্বজ্ঞানের ভাবাবেশ, অথবা সূক্ষ্মচিন্তাশক্তির বাহাদুরী প্রত্যাশা করেন।

কাব্য আস্বাদনের বস্তু, আলোচনার সামগ্রী নয়—একথা সত্য; তথাপি কাব্য-আলোচনা অন্যবিধ আলোচনার মত নয়, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বিদেশী সমালোচকের একটি উপমা কাজে লাগিবে। আকাশে ইন্দ্রধনুর পাশে যেমন আর একটি ছায়া-ইন্দ্রধনু দেখা যায়—তাহা দ্বারা প্রধান ধনুটি দ্বিগুণিত হইয়া যেমন আরও বেশী করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কাব্যের পাশে কাব্য-সমালোচনাও সেইরূপ। কাব্যসৃষ্টির পাশে পাশে সমালোচকের রসবোধ—কাব্যগত কবি-প্রেরণার সাহায্যেই—তাহার যে প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করে, এবং তাহার দ্বারা মূল কাব্যসৃষ্টিকে আরও ভাস্বর করিয়া তোলে—তাহারই নাম কাব্য-সমালোচনা। এইরূপ আলোচনায়, কাব্যে ঠিক যতটুকু যেখানে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অধিক কিছু অনুমান করা—যাহা কবি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, সমালোচকের নিজ কল্পনাবলে সেটুকু পূরণ করিয়া কবিকে একটা অতিরিক্ত গৌরবের অধিকারী করাও যেমন অন্যায়, তেমনই, কবি যেটুকু যে ভাবে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন তাহার অধিক রস-প্রেরণা দাবী করাও অসঙ্গত।

করুণানিধানের কাব্যে আমরা তাঁহার সেই কবিত্বের সন্ধান করিব। যে ভাষা ও ছন্দ-সৌষ্ঠবে বাণীর রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, ভাব শরীরী হয়—যাহার অভাবে একের অনুভূতি অপরের নিজস্ব হইয়া উঠে না, করুণানিধানের কাব্যে ভাষা ও ছন্দের সেই অমোঘ সৌষ্ঠব সর্ব্বাগ্রে পাঠকের হৃদয়গোচর হয়। কবি যেন মূর্ত্তিমতী বাগ্‌দেবতার আরাধনায় তন্ময় হইয়া, প্রকৃতির রূপ-ভাণ্ডার হইতে বর্ণালোক আহরণ করিয়া, অতি ধীরে সংযত হস্তে সুনিপুণ তুলিকাক্ষেপে বাগ্‌দেবতার বেদী-পট্ট অলঙ্কৃত করিতেছেন। বাক্য ও ছন্দের এই সৌন্দর্য্যস্পৃহা তাঁহার কবিহৃদয়ের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যানুভূতির পক্ষে যতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কাব্যের রস-প্রমাণ। আমরা প্রথমেই করুণা-নিধানের এই বাণী-সাধনার পরিচয় দিব। তাঁহার কবিতায়, ভাষার এই নির্ম্মাণ-কৌশলে যেন তিনটি ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে—ফুলের ন্যায় কোমল নির্ম্মল, পরিপক্ক ফলের ন্যায় নিটোল ও রসোচ্ছল, এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহত দীপ্তিমান্। এই তিনেরই কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) স্বপ্নসম তার কাহিনী
আজ্‌কে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে—
সোনা-আতার সোনার গায়ে
রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে;
দূর্ব্বা-শ্যামল নিম্বতল,
দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙে
গাঙের বুকে স্তরে স্তরে!

('দ্বিপ্রহরে'—শতনরী, পৃঃ ২-৩)

মেয়েটি মোর আগ, বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে র'বে দ্বারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে'
সাঁঝের আঁধিয়ারে;
কাজল-দেওয়া চক্ষুদুটি
আদর-দোলে উঠবে ফুটি,
'ফণী-মনসা'র বেড়ার-ঘেরা
'দুর্গাদীঘি'র ধারে।

শিউলি-ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে',
জ্যোৎস্না-ধারা পড়বে ঝরে'
দূর দেউলের 'পরে ;
অঙ্গ মাজি' দুধের সরে
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে'
সই-এর সাথে গৃহিনী মোর
আসবে ফিরে ঘরে।

('বাসনা'—শতনরী, পৃঃ ৯-১০)।

(২) কোটি বন-ফুল অঙ্গে দোদুল,
কত রঙ শোভা আলো ;
দ্বিপ্রহরের ঝিল্লীর তান
শুনিছে পাষাণ কালো !
স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জ-বনানী
সবুজ টোপর পরি',
ঝর্ণা-তলায় ঝরিছে কাহার
রতনের শতনরী।

('হিমাদ্রি'—শতনরী, পৃঃ ৯৩)

(৩) কার আলিঙ্গন-আশে অনুরাগ-রসোল্লাসে
হে বরবর্ণিনী,
ধাও রঙ্গে কলস্বরা পারাবার-স্বয়ম্বরা
বিন্ধ্যের নন্দিনী ?
কোথা মাহীষ্মতী পুরী ?— মর্ম্মর-সোপানোপরি
রাজ-অঙ্গনার
বিলাসের মৃগমদে দৃপ্ত পদ-কোকনদে
চকিত-ঝঙ্কার !
পৌর্ণমাসী অর্দ্ধরাতে, জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে
অলিন্দের 'পরে—
দ্রাক্ষারসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব
চুম্বিত অধরে !

আবর্ত্ত-শোভন নাভি, অলঙ্কৃত কটি-তট
হংস মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবন-বিভায় ?
('রেবা'—শতনরী, পৃঃ ১১৬)

উপরে যে বিচ্ছিন্ন শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা দ্বারা, আমি করুণানিধানের ভাষায়—তাঁহার diction-এর মধ্যে—যে শব্দ ও ছন্দ-গত রূপোল্লাস সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়, তাহারই আভাস দিয়াছি। এই শ্লোকগুলিকে যে তিনভাগে ভাগ করিয়াছি তাহার সবগুলিতে ষ্টাইল একই, কিন্তু শব্দ-যোজনার রীতি এক নয়, এবং ছন্দও ত্রিবিধ। কিন্তু সর্ব্বত্র বাণীকে সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রয়াস, এবং বিষয়ভেদে ভাবানুভূতির বিশিষ্ট আবেগকে অনুরূপ ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করিবার প্রেরণা সার্থক হইয়াছে। সকল কাব্যে ইহাই কবিত্বের লক্ষণ; কিন্তু করুণানিধানের কাব্যে ভাষার এই সৌষ্ঠব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কাব্য-পাঠকালে মনে হয়, শব্দের অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত বর্ণে ও গন্ধে তাঁহাকে মুগ্ধ করে। ভাষা সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত সচেতনতার জন্য তাঁহার কাব্যে ভাবের—প্রাবল্য অপেক্ষা, সৌকুমার্য্য ও কোমলতাই সমধিক সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু কবি এই যে ভাষা নির্ম্মাণ করিয়াছেন—শব্দের বর্ণ, গন্ধ ও স্বর, এই তিন উপাদানকেই তিনি যে কৌশলে বশ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল বাণী-চর্য্যার ফল? তাঁহার ভাষার এই অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য—কল্পনা ও আবেগবিরহিত শব্দচাতুরীই নয়; ইহা একরূপ রস-বিলাস হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাব্য-বিরোধী নয়। কারণ, কোন ভাষাই সুন্দর হইতে পারে না, যদি তাহার মূলে ভাবাবেগ না থাকে; যদি ছন্দই এ ভাষার সর্ব্বস্ব হইত, তবে সে সন্দেহের কারণ থাকিত; কিন্তু যে-রচনার ছন্দ ও ভাষা, এমন সুসঙ্গত, তাহার অন্তরালে যে একটা কবি-মানস আছে—একটা mode of perception আছে, তাহা অস্বীকার করিলে রসবোধকেই সঙ্কুচিত করিতে হয়। করুণানিধানের ভাষার এই অনবদ্য চারুতা তাঁহার কবি-প্রকৃতির কোন্ গুণে ঘটিয়াছে এইবার তাহাই দেখাইব। তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ, কোথাও প্রকৃতির রূপরাশি—শব্দচিত্রে, কোথাও বা সেই রূপ-সম্ভোগের আনন্দ—ছন্দলীলায়,

উৎসারিত হইয়াছে। প্রথমে ইহারই আলোচনা করিয়া পরে, তাঁহার কাব্যে এই প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া-মূলক যে পরিণতির আভাস আছে, সে সম্বন্ধে বলিব। তাঁহার কবিতার যে মূল প্রেরণার কথা বলিয়াছি, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(১) যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
হেথা-হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক,
মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক!
(শতনরী, পৃঃ ১)

(২) নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে
(শতনরী, পৃঃ ১৩)

(৩) হের সখি সেই দিনান্ত-তারা
তেমনি জ্বলে—
ডালিম-ফুলের রঙ্‌টি ফলানো
মেঘের কোলে!
(শতনরী পৃঃ ২৫)

(৪) শ্বেত বিজুলী নিথর হয়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্ত্তি লয়ে—
শিথানে তার উজল ঢেউএর সারি;
ছাড়িয়ে ঐ উষার তারা
সাম্‌নে নেমে আস্‌ছে কারা?—
কটাক্ষেতে স্ফটিক হ'ল বারি!

হেরব রূপের নীলাম্বরে
বিরাট শিখী কলাপ ধরে,
তারায় তারায় বরণ-শোভা জাগে!
('কাঞ্চনজঙ্ঘা'—শতনরী, পৃঃ ১০২-৪)

(২) সামনে হেরি সুনীল বারি
তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া-রঙ্ ভাঙা মাটি
চালু পথের বাঁকে ;
ঝর্ণা-ঝালর পড়ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে।

('ওয়ালটেয়ারে'—শতনরী, পৃঃ ১১৯)

—এরূপ অনেক আছে। এ সব পড়িতে পড়িতে কার না মনে হয়, যে এই ভাষা ও ছন্দ কবির অন্তরের আনন্দকে মূর্ত্তি দিবার প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছে? ইহা কেবল বস্তু-বর্ণনা নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর যথাযথ অনুচিত্রণ নয়,—ইহা প্রকৃতি-প্রেমিক কবির প্রিয়া-রূপ-বন্দনা। এক প্রসিদ্ধ ইংরাজ-সমালোচকের ভাষায় —"It is love of this kind that gives true significance to the poetry of nature, for only by its alchemy can the thing seen become the symbol of the thing felt." এই ধরণের প্রকৃতি-প্রেম বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নূতন। প্রকৃতির রূপ-সম্ভোগে কবির যে আবেগ এই সকল চিত্ররচনা করিয়াছে, সেই আবেগ-মূলক কল্পনা কয়েকটি কবিতায় সৌন্দর্য্যের যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছে, এখানে তাহারও কিছু পরিচয় আবশ্যক। 'শেফালী'-শীর্ষক কবিতায়, একটি বালিকার মৃত্যুতে কবি যে শোক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও এই প্রকৃতিরই মাধুরী করুণ-সুন্দর হইয়া যে রস সঞ্চার করিয়াছে, তাহা ইংরেজী যে কোনও উৎকৃষ্ট Dirge-কবিতার অনুরূপ।—

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত
স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী
লুকায়েছে বালুকায়।

একেকটি করে' তারা জ্বলে জলে,
চাঁদের রূপালি হাসি পড়ে ঢলে',
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল-ছলে
অফুরাণ বেদনায়।

('শেফালী'—শতনরী, পৃঃ ১২)

'স্বপ্নলোকে' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না—

হেথায় তারা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যোৎস্না-মাঝে,
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সিঁথির তটে—
অস্ফুট-ভাবে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।

তাদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ, বেলা—
কে অপ্সরী সারঙ্ বাজায়,
কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে,
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;
তন্দ্রা ভেঙে দেখে তাদের—
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়,
পাখায় ঝরে সোনার রেণু
জ্যোৎস্না-মাখা মেঘের গায়।

আর একটি কবিতায় করুণানিধানের কবি-প্রেরণার অতি সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে। কবিতাটির নাম 'সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি'। নাম শুনিয়া অনেকেরই ইংরেজ কবি Collins-এর বিখ্যাত Ode to Evening কবিতাটি মনে পড়িবে। কিন্তু করুণানিধানের 'সন্ধ্যালক্ষ্মী' তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীরই প্রতিচ্ছবি; ইহাতে Collins-এর মত কল্পনার প্রসার নাই, সন্ধ্যার বিচিত্র ভাবোদ্বোধনী চিত্র-পরম্পরা ইহাতে নাই। ঊর্দ্ধে সন্ধ্যা-রঙ্গীন নভস্তল, ও নিম্নে ধরণীর কানন-শোভা—ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সন্ধ্যা তাহার 'রঙের ইন্দ্রজালে' কবির নয়ন ভরিয়া দিয়াছে। করুণানিধানের প্রকৃতি-প্রেম ও রূপ-রসাবেশের মধ্যে যে সরল

প্রীতিপিপাসু কবি-প্রাণের আকুতি আছে, এই কবিতার নির্ম্মল গীতি-স্রোতে তাহাই উৎসারিত হইয়াছে। কবিতাটির কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।—

তোমার আলো সব ভুলালো,
লো অমরী বালা!
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি,
চুলের তারার মালা।

* * *

অলক-ঢাকা কোমল পলক,
নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি।
কোহিনূরের টীপটি ভালে,
কাণে রতন-দুল—
বরণ-কালের তরুণ বধূ
রে দুলালী ফুল!
এস নেমে আমার ঘরে
তালী-বনের তলে,
এস মানস-নন্দিনি মোর,
এস আমার কোলে!

'স্বপ্নলোকে' কবিতাটির গঠন আরও অনবদ্য, তাহাতে ভাবের রূপটি কয়েক পংক্তির মধ্যেই সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ কবিতায় আমরা, ভাবের সূক্ষ্ম তন্তুজালের উপরে, রূপ-লক্ষ্মীর অতিপেলব ক্ষণ-বিলীয়মান বর্ণ-সুষমাকে সন্ধ্যালক্ষ্মীর চুলের তারার মত 'চঞ্চলিয়া' উঠিতে দেখি। এখানে রূপের পরিস্ফুটতা নাই, কিন্তু চিত্রার্পিত আলো-ছায়ার মোহিনী আছে। এই প্রসঙ্গে কবির রূপসন্ধানী দৃষ্টির উদাহরণস্বরূপ সন্ধ্যালক্ষ্মীর 'চেলীর ঝিলিমিলি' লক্ষ্য করিতে বলি। কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

সোনার শলাকা বুনিত গগনে রেশ্‌মী বসন-স্তর—
অস্ত-তপন মুদিত নয়ন মহুয়া-বীথির 'পর। (শতনরী, পৃঃ ১৪৩)

গোধূলি-আকাশের স্তিমিত অথচ তরলোজ্জ্বল আলোক-নিশান যাঁহাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহারা এই বর্ণনার সূক্ষ্মতা ও যথার্থতা উপলব্ধি করিবেন।

এই সকল কবিতায় কবির অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে স্বপ্নাবেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—মনে হয়, তাহাই আর একটু ঘোরালো হইয়া তাঁহার কাব্যে একটা অস্পষ্ট রহস্য-লোকের ছায়াপাত করিয়াছে। সেখানে কবিতার ভাষা স্পষ্ট নয়; কেবল একটা ভাবের সুর আছে—রঙ, রূপ, সব যেন একাকার হইয়া গেছে। সে যেন কবি-প্রাণের নিশুতি-নিশীথের অস্ফুট গুঞ্জরণ; যে প্রকৃতি-প্রেয়সী তাঁহাকে রূপের কুহকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর এক মূর্ত্তি যেন ইন্দ্রিয়-জগতের ওপার হইতে আর এক ভঙ্গিতে তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। এই আলো-ছায়ার পারে, জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত-দেশে, অকূল-অচিহ্নিতের মোহানায় তাঁহার প্রাণ যেন থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, রূপ-সৌন্দর্য্যের সুস্পষ্ট অনুভূতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়—'পথের জ্যোছনা ভুলায় আমারে, কাঁপে প্রাণ-পারাবত'। উদাহরণ স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

এইখানে সে কখন এসে
 স্মৃতির লিপি গেছে ফেলে—
অন্ধকারের আল্‌পনাতে
 জ্বল্‌জ্বলে তার নয়ন মেলে।
শেষ মিনতি শেষ-তৃষাতে
পাইনি নাগাল আকুল হাতে;—
রূপ হারালো রূপের লীলা
 বন-পলাশে আলোক ঢেলে।

(শতনরী, পৃঃ ৫৮)

* * *

নেহারিলাম পাষাণ হ'য়ে যায় সে তনু,
নিক্ষেপিছে কটাক্ষ-শর ভুরুর ধনু।
ননী-কোমল বক্ষ গেছে মাণিক হয়ে,
হীরার গুঁড়া পড়ছে ঝরি' কপোল ব'য়ে!
চল্‌তে নারি অচিন-পথে,—তরুর শাখে
জড়িয়ে বসন বাঁধ্‌নু মোরে শতেক পাকে।

(শতনরী, পৃঃ ২২০)

কারা যেন আসে সরে'
অশ্রুকণা বিদ্ধ করে'—
চোখে পড়ে মুখের আদল ;
নিবন্ত চাঁদের কালি,
গলে' পড়ে জ্যোৎস্না-কালি,
প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

পূর্ণিমার কোন্ পারে
ডাকে যেন কে আমারে
লুপ্ত অজগর রাত্রি-রূপ ;
মৃত্যু সে চুমকি-প্রায়
ঝিকিমিকি' নিবে যায়,—
প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।
—('শেষ'—ধানদূর্ব্বা)

এই সকল কবিতায় কবির স্বভাবসিদ্ধ রূপপিপাসা যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, একটা প্রশ্ন-কাতর উৎকণ্ঠা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। ইহাতে মিষ্টিক্-ভাব নাই, বরং প্রাণের একটা জ্ঞান-সঙ্কটের পরিচয় আছে ; করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির পক্ষে মিষ্টিক-ভাবাবেশ অসম্ভব বলিয়াই, রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বে শেষে তাঁহার কাব্য-প্রেরণা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এই কবিতাগুলিতে তাহারই সূচনা আছে। আমি পরে কবিমানসের এই দিকটির আলোচনা করিব।

এইবার করুণানিধানের কাব্য-প্রেরণার যে অপর ভঙ্গি তাহার পরিচয় দিব। এই ভঙ্গি পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার কবিতার ছন্দ-লীলায়। এখানে কবিতার ভাষা ও ছন্দের কথা কিছু বলিব। সঙ্গীতের ভাব রূপ পায় সুরে ; সঙ্গীত নির্ব্বাক, কাব্যের বাহন ছন্দোবদ্ধ বাণী। কবির আনন্দ গীতিকারের আনন্দ হইতে ভিন্ন ; সঙ্গীতে অতল অসীম অরূপকে ভাবের নিরাকারেই হৃদয়-গোচর করা হয় ; ইন্দ্রিয় সেখানে মন-বুদ্ধির স্পর্শ-শূন্য হইয়াই চরিতার্থ হয়, সুরই রস-সৃষ্টি করে। কাব্যের ছন্দ বাণী হইতে পৃথক নহে ; বর্ণের অন্তরালে আলোকের মত—অনুভূতির মূলে যে আবেগ আছে, বাণীর একটি অঙ্গরূপে ছন্দ তাহারই দ্যোতনা করে।

কাব্য-সরস্বতীর এক চরণ যেমন বাণীর উপরে, অপর চরণ তেমনই ছন্দের উপরে স্থাপিত। এই জন্য সঙ্গীতের সুর এবং কবিতার ছন্দ ঠিক এক নহে; সুর আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না, ছন্দ বাণীর অনুগত,—ভাবকে রূপ দিবার পক্ষে বাণীর সহায়তা করে। কাব্য ও সঙ্গীতকলার মধ্যে এই পার্থক্য আছে বলিয়াই এমনও দেখা যায় যে, যে কবি উৎকৃষ্ট ছন্দ-বোধের অধিকারী, সঙ্গীতকলায় তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমাদের মধুসূদন যে ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের চরম বলিলেও হয়; কিন্তু সঙ্গীতকলায় তাঁহার কোনও অধিকার ছিল বলিয়া আমরা জানি না। ইংরেজ কবি শেলীর মত ছন্দ-প্রতিভা অল্প কবিরই দেখা যায়, কিন্তু শেলীর সঙ্গীত-কলায় অধিকার থাকা দূরের কথা—অনুরাগ-ও ছিল না। অতএব, ছন্দকে যাঁহারা, সঙ্গীতের সুরের মত মনে করিয়া, কাব্য হইতে পৃথক করিয়া তাহার বিচার করেন, অথবা, ছন্দ-গৌরবকেই কাব্য-গৌরব হিসাবে উপভোগ করেন, তাঁহারা এই দুই বিভিন্ন কলার মধ্যে গোল বাধাইয়া কোনটারই মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। ছন্দ কবিতার প্রসাধন বা অলঙ্কার নয়—ছন্দ কাব্যেরই অঙ্গ; বাণী ও ছন্দ উভয়ে মিলিয়া প্রত্যেক কবিতাকে তাহার ভাবানুযায়ী রূপ-বৈশিষ্ট্য দান করে। ছন্দ যেখানে বাণীর অঙ্গ হইয়া উঠে নাই, সেইখানেই আমরা কাব্যের কৃত্রিমতা অনুভব করি। যেখানে ভাষা ও ছন্দের এই একাত্মতা ঘটে নাই, সেইখানেই সত্যকার কবি-প্রেরণার অভাব ধরা পড়ে। এই দুইএর মিলন না হইলে রচনা 'কাব্য' হইয়া উঠে না।

কিন্তু কাব্যে ছন্দের স্থান এইরূপ নিরূপিত হইলেও, গীতিকাব্যে ছন্দের অধিকার কিছু অধিক হইতে পারে। আবেগ যেখানে অধিক, অনুভূতির মূলে আবেগ যেখানে প্রবল, সেখানে সেই নিছক আবেগ ছন্দ-লীলায় কতকটা মুক্তি পাইতে চায়। ভাব যেখানে গদগদ-কলভাষা আশ্রয় না করিয়া পারে না, সেখানে ভাবের রূপ কিছু অধিক পরিমাণে ছন্দের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সেখানেও দেখা যাইবে যে, শব্দ-যোজনায় ছন্দের আধিপত্য থাকিলেও ভাষাই যেন ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখা যাইবে যে, যে ভাবাবস্থা চিন্তালেশহীন প্রীতি-বিহ্বলতার ফল, কেবল সেই ভাবাবস্থাই এইরূপ ছন্দ-লীলায় সার্থক হইতে পারে। এরূপ অনেক কবিতা পাঠকের স্মরণ হইবে, যাহা ছন্দ-হিল্লোলে শ্রুতিমধুর হইলেও চিত্ত জয় করে না; তার কারণ সে গুলিতে কবির ভাবাবেশ অপেক্ষা ছন্দ-নিষ্ঠাই

প্রবল। হৃদয় যেখানে ভাবের আবেশে নৃত্য করে, সেখানেই কবিতার এই ছন্দ-লীলা সার্থক হয়।

করুণানিধানের যে কবিপ্রকৃতির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কাব্যে এইরূপ ছন্দলীলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ছন্দের উচ্ছলতা তাঁহার প্রায় সকল কবিতায় আছে, তথাপি কতকগুলি কবিতায় বিশেষ করিয়া এই ছন্দের উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। আমি উপরে গীতি-কবিতার ছন্দ-প্রাধান্য যে হিসাবে সমর্থন করিয়াছি, সেই হিসাবে সর্ব্বত্র এই ছন্দ-লীলা সার্থক না হইলেও, অনেক স্থলে ছন্দই কবির ভাবাবেগের বাহন হইয়াছে—কাব্যলক্ষ্মীই যেন 'আনন্দ-কাঁকন' বাজাইয়াছেন।

(১) আমি, পড়িনু আদি-কাব্য খানি তার সে বাহু-ইঙ্গিতে,
ফোটে স্বর্ণ-ভাতি তার শ্রীমুখের ভঙ্গীতে;
কাঁপে লক্ষ যুগের পদ্ম-ফোটা ঠোঁট দুখানি থরথরি'—
সে যে চুম দিল রে পঞ্চশরে জয় করি'!

(শতনরী, পৃঃ ৫৭)

(২) ওরে, খোল্ অর্দ্ধেক উন্মীল চোখ, অঞ্জন আর কাজ নেই,—
ওলো আল্তায় লাল পা'র তল তোর, মঞ্জীর ঠিক বোলবেই।
এল উৎসব-লগ্ন,
আধ'-তন্দ্রায় মগ্ন
জাগে বল্লভ তোর বক্ষের ঠাঁই—ধ্যান-সুন্দর আজ সেই।

(শতনরী, পৃঃ ৪৮)

(৩) দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে—
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
তর্জ্জনীতে জড়িয়েছে।
এক মনে সে শুনতেছিল
কানুর গানের অন্তরা—
ব্রজবধূর দীর্ঘশ্বাসে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

সে যে আমার গানের মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী।
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে
কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী!

('মনোহারিকা', ঝরাফুল)

(৪) নাগ কেশরের গন্ধে পাগল
সান্ধ্য ফাগুন-হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার—
কোন্ সুরে যায় গাওয়া?
বন্-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা,
কুঙ্কুম ভাঙে রঙ্গন;
'জল-তরঙ্গ'-ঝঙ্কার তুলে'
বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।

(শতনরী—পৃঃ ২৭)

(৫) দোল-দোলনে ঢিলা হ'য়ে সোহাগ-বেণী যাক্ খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্‌নে মুখ, তাকা তোরা চোখ তুলে'।
মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ-বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যুঁই-বেলাতে দখিন্-হাওয়া যায় বুলে'—
তাকা তোরা চোখ তুলে'।
চৈত্র-রাতি, আকুল রতি ফুল্-শরে!
ঘর ছেড়ে চল্ তমাল-বীথির পথ ধরে'।
কোন্ পুলিনে নীল সলিলে
খেল্‌বি খেলা সবাই মিলে',
মন্ত্র নিবি বন্-বিহারীর মন্তরে—
সে যে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধরে'!

(শতনরী—পৃঃ ৪৪)

এই শেষের কবিতাটিতে কবির ছন্দলীলা কোন কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে নাই; সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ কবি-দরবেশের প্রাণের নৃত্য এই কবিতায় শরীরী হইয়া উঠিয়াছে—ছন্দ এখানে 'বন-বিহারীর মন্তরে' পরিণত হইয়াছে। এই কবিতাটি এই হিসাবে করুণানিধানের একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

করুণানিধানের কাব্যে যে ধরণের রসমাধুরী যতটুকু আছে, তাহার আস্বাদনে আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিলাম। করুণানিধান যে কবি-শিল্পী, নিজ প্রাণের রস-সংবেদনা তিনি যে অনুরূপ ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করিতে পারেন, আশা করি, তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। কোনও কবির নিকটে তাহার অধিক কিছু দাবী করা চলে না। কবিকর্ম্ম পুরুষকার-সাপেক্ষ নয়, তাহা দৈবী প্রেরণার অধীন। কবির প্রাণে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—যাহা তাঁহার ভাব-প্রকৃতির অনুবন্ধী, তিনি তাহাই সৃষ্টি করেন, সমালোচকের ইচ্ছানুরূপ দাবী মিটাইতে পারেন না। প্রত্যেক কবির অনুভূতি-ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, কিন্তু সেই অনুভূতি যখন শব্দে ও ছন্দে রূপ পায়, তখনই বুঝি, কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে; এবং তাহাই যথেষ্ট। করুণানিধানের সেই অনুভূতি-ক্ষেত্র কিরূপ, তাহার সীমাই বা কোথায়—সমালোচক সেইটুকু ধরাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহার বক্তব্য শেষ হয়। আমরা দেখিয়াছি, করুণা-নিধানের কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রূপ-রেখা শব্দ-বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠে, এবং সে চিত্র কবি-চিত্তের মাধুরীতে আলিম্পিত হয়। এই রূপ-মোহ একরূপ ইন্দ্রিয়োল্লাসের আনন্দে কবিকে বিভোর করিয়া তোলে; সেই তড়িৎস্পর্শবৎ রূপরেখাবলী কবি আবিষ্টের মত শব্দপটের উপরে মেলিয়া ধরিয়া ঐকান্তিক তৃপ্তি লাভ করেন; এ জন্য কবির অনুভূতি চিন্তা-গভীর হইতে পায় না। তাঁহার অনুভূতিক্ষেত্রে রুদ্র কঠিন বীভৎস বস্তুর স্থান নাই; তার কারণ, তাঁহার প্রাণ প্রকৃতির নিকটে মাধুরী-ভিক্ষাই করে,—তাহাকে কল্পনা-বলে জয় করিয়া আত্ম-চেতনার প্রসার কামনা করে না। কবি শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব; যে নিশ্চিন্ত আত্ম-নিবেদন, অবশ ভাবাতিরেক ও প্রীতিবিহ্বল সৌন্দর্য্য-কল্পনা মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া, তাহার বিচার-বৃত্তি অলস করিয়া, বৃন্দাবন-স্বপ্নের সহায়তা করে, করুণানিধানের চিত্তে সেই বৈষ্ণব-ভাব প্রবল। এই সূত্র ধরিয়া এইবার তাঁহার কাব্যে ভাবের যেমন আলোচনা করিয়াছি, সেইরূপ অভাবের দিকটাও আলোচনা করিব। কোনও কবির কাব্যে যাহা যে কারণে আছে, যাহা

নাই তাহারও কারণ যে সেই একই,—একথাটা বুঝিয়া না লইলে কাব্য-পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

করুণানিধানের কাব্যে একটা প্রধান অভাব এই যে, কবি তাঁহার অনুভূতি-গুলি লইয়া এতই অধীর যে, সেগুলিকে কবিতায় একটা ভাবের ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার দিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই নাই—সামান্য যত্নে অনায়াসে যাহা করিতে পারিতেন, তাহাও করিতে তিনি যেন পরাঙ্মুখ। 'হিমাদ্রি' কবিতাটিতে এই দোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইয়াছে—এই সুদীর্ঘ কবিতার পংক্তি-বিভাগেও অযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ তাঁহার কবি-প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে প্রকৃতি-প্রেমের ফলে তাঁহার রচনায় "the thing seen becomes the thing felt—transformed from a cause into a symbol of delight"—সেই আবেগের ফলেই করুণানিধানের অধীর রূপ-সৃষ্টির আগ্রহ কোনখানে স্থির থাকিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের ভাষায়—"It lacks that endorsement from a centre of disciplined experience which is the mark of the poetic imagination at the highest." উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকল্পনার মধ্যে যে বিচারশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করে, করুণানিধানের কল্পনায় সেই বৃত্তির অভাবই তাহার কারণ। এই জন্যই জীবন ও জগতের বাস্তব-রূপের মধ্যে Ideal ও Real-এর যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহাকে তাঁহার বৈষ্ণবভাব-বিভোর প্রাণ একেবারে পাশ কাটাইয়াছে—সে দিকটা তিনি যেন ক্ষণমাত্রও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার কবি-প্রকৃতির এই লক্ষণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার গাথা-কবিতাগুলিতে। এখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রূপস্বপ্নময় কল্পনা কোনও ঘটনা-কাহিনী বা চরিত্রকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এ সকল কবিতায় —বিশেষতঃ 'চণ্ডীদাস', 'জয়দেব' ও 'বাদ্‌শাজাদী'তে—কবি তাঁহার ভাষার বর্ণচ্ছটা ও ধ্বনিসম্পদ উজাড় করিয়া দিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে—"There are moments when the emotion seems to rise in a sudden fountain and change the thing he sees into a jewel"; কিন্তু তাহাতে গাথা-কবিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। Keats-এর 'St Agnes' Eve' অথবা 'Isabella'-র মত কবিতায় কবির চিত্রাঙ্কনী শক্তি ও রূপপিপাসার আবেগ যেমন একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বা কাহিনীকে ঘেরিয়া অখণ্ড রসরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

করুণানিধানের কবিতায় তাহা হয় নাই; তার কারণ, Keats-এর সৃষ্টিকল্পনায় যাহা ছিল, করুণানিধানের তাহা নাই—"endorsement from a centre of disciplined experience"। করুণানিধানের কল্পনায় ভাবানুভূতির মুহূর্ত্তগুলি (moments of experience) রূপে ও রূপকে মূর্ত্তি গ্রহণ করে; এই মুহূর্ত্তগুলি, কার্য্যকারণ-সূত্রে, একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-পথে প্রবাহিত হয় না। এই জন্যই তাঁহার গাথা-কবিতাগুলি গাথা-হিসাবে সার্থক হয় নাই। 'চণ্ডীদাসে' এইরূপ কতকগুলি মুহূর্ত্ত মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে; সে মুহূর্ত্তগুলি এতই ভাবঘন, তাহার বাণীরূপ এতই অপূর্ব্ব, যে মনে হয়, সেগুলিকে চণ্ডীদাসের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না করিয়া 'রজকিনী রামী'কে মাত্র কেন্দ্র করিয়া, চণ্ডীদাসের প্রেমারতির স্তোত্ররূপে গাঁথিয়া তুলিলে রসসৃষ্টি আরও সার্থক হইত; আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতাম—

> ঘিরিল তাহার অলকপ্রান্ত
> অপরূপতম জ্যোতি,
> তারকা-খচিত আকাশের তলে
> দাঁড়ায়ে রহিল সতী।

—ইহার পরের অংশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। 'জয়দেব' কবিতায় কবি-শিল্পীর ভাষা ও চিত্র-রচনা অন্যদিক দিয়া সার্থক হইয়াছে। এ কবিতায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা unity of atmosphere আছে, এবং সে atmosphere সৃষ্টি করিয়াছে—'বিরাট মন্দিরচূড়া ছায়া যার পড়ে না ভূতলে', 'মরুৎ-ডম্বরু-মন্দ্রে উতরোল অম্বুধি-গর্জ্জন'; সমস্ত কাহিনীকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া এক বিরাট গম্ভীর ভাব-দেবতার আরতি-শঙ্খ এই কবিতায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু 'বাদশাজাদী'র কাহিনী রূপ-রসে টলমল করিলেও সুসম্বদ্ধ আকার লাভ করে নাই। তিনটি গাথার মধ্যে এইটির মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশের অবকাশ ছিল। এ কাহিনীকে চিত্ররূপে আয়ত্ত করা যায় না। ইহার মধ্যে ঘটনা-পরম্পরার গতিবেগ কবির রূপসম্ভোগ-স্পৃহাকে যেন বারবার ব্যাহত করিয়া ছন্দকে আরও বেগবান করিয়াছে। বাদ্‌শাজাদীর এই ছন্দ খাঁটি ballad-এর উপযোগী; এই ছন্দের দ্বারাই প্রমাণ হয়, এই কাহিনীর মূল-প্রেরণা কবিচিত্তে ঠিকই ধরা দিয়াছে, তথাপি ইহার গঠনে কবির কল্পনাশৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

এই গাথাগুলির সঙ্গে একটি কবিতা আছে, তাহার নাম 'চিরকুমার'; এই কবিতাটি পড়িলে করুণানিধানের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিবে,—গাথাই হৌক্ আর যাহাই হৌক, কবিতাটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত করুণানিধানী কাব্যরসের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

করুণানিধানের কাব্যে এই যে অভাবের দিকটার আলোচনা করিলাম, ইহার জন্ম তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে দায়ী করি না; তাঁহার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য যদি বুঝিয়া থাকি, তবে এ আলোচনায় কবির সেই পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া মনে করি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কাব্যে যে একটা অস্পষ্ট প্রশ্নকাতর উৎকণ্ঠার সুর আমরা লক্ষ্য করিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তাঁহার কাব্যের এই ভঙ্গি নিতান্ত হেঁয়ালি-রচনার খেয়াল নয়, এই সুর আর এক ভঙ্গিতে তাঁহার কাব্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার কল্পনার স্বাস্থ্যহানি করিয়াছে। কারণ, আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, করুণানিধানের মত সৌন্দর্য্য-বিভোর রূপরস-পিপাসুর কাব্যবীণায় একটা তার বড় বেসুরা বাজিয়াছে—একটা কাতর ভীতি-বিহ্বল বৈরাগ্যের সুর অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কতকগুলি কবিতায় বার বার দেখা দিয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক বলিলাম এই জন্য যে, যে-কবিতার মূল-প্রেরণাই বৈরাগ্য, সে কবিতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই; কিন্তু যে সকল কবিতার মূল-প্রেরণাই সৌন্দর্য্য-বিভোরতা—সেখানে সেই অবস্থাতেই এই সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে 'চিরন্তন ধ্রুবে'র নিকটে আত্ম-সমর্পণের ভাব, পৌরাণিক ভক্তিভাবের ঔদাসীন্য, বা আধ্যাত্মিক সত্যপিপাসার বেদনা—এই সকল কবিতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'হরিদ্বার' 'হিমাদ্রি' বা 'শ্রীক্ষেত্রে'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যতটুকু তীর্থ-মাহাত্ম্য বা পৌরাণিক স্মৃতি জড়িত আছে, এই কবিতাগুলিতে সেই তীর্থ-মাহাত্ম্যই তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতিকে খর্ব্ব করিয়াছে—প্রাকৃতিক শোভায় তন্ময় হইতে গিয়া কবিকে যেন আত্ম-সম্বরণ করিতে হইয়াছে। তাই, 'ওয়ালটেয়ারে'-শীর্ষক কবিতায় কবির যে আশ্চর্য্য প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় পাই, তাহাতেও এই পুরাণ-কথার আকস্মিক অবতারণায় রসভঙ্গ হইয়াছে। কেবল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কবিতায় কবির রূপ-পিপাসা সকল রূপের সীমায় পৌঁছিতে চাহিয়াই কাঞ্চনজঙ্ঘার অলোক-সম্ভব রূপ-জ্যোতির সম্মান রক্ষা করিয়াছে। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এইরূপ

ভক্তিভাব বা আধ্যাত্মিক পিপাসার বিরোধী; রূপ হইতে অরূপে পৌঁছিবার একটা সহজ মানস-সেতু আছে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সকল কবিতায় যে আধ্যাত্মিকতার প্রয়াস আছে তাহা করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির পক্ষে একটা কৃচ্ছ্রসাধন—ইহা তাঁহার কাব্য-প্রেরণার পরিণতি নয়, বরং একরূপ বিপরীত গতি বলিয়াই মনে হয়। "সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি" কবিতায় কবি যাঁহার আবাহন করিয়াছিলেন, এই সকল কবিতার অংশবিশেষ পড়িবার পর, তাঁহার সেই কাব্যলক্ষ্মীকে বলিতে ইচ্ছা হয়—'বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে!'

করুণানিধানের কবিজীবনে একটা অকাল-বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাঁহার কবিমানস অতি দ্রুত অবসাদ-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কবির ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ইতিহাসে বোধ হয় মিলিবে। তথাপি যে-কবি বিশেষ করিয়া সৌন্দর্য্যের মোহিনী মায়ার এমন বশীভূত—তাঁহার চিত্তেও এ বৈরাগ্য-পিপাসা কেন? সকল সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা নশ্বরতার ছায়া জড়িত আছে সত্য, এজন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা গভীরতর বেদনার অনুভূতি আছে; তথাপি, সৌন্দর্য্য সর্ব্বজয়ী। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ লেখক যথার্থই বলিয়াছেন—

"The faith in it endures : for the discernment of beauty is a mode of perception that is adequate to all the fates can bring. Disillusion has no power against it ; it cannot merely conquer, but make part of itself its regret for its own impotence ;...and the lovers of beauty are perhaps more fortunate than the lovers of justice, or love."

কিন্তু সৌন্দর্য্যের এই impotence—এই নশ্বরতার ছায়াই করুণানিধানের সৌন্দর্য্য-মোহকে বিচলিত করিয়াছে; তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—করুণানিধান শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব। সৌন্দর্য্য-পিপাসার সঙ্গে যে ভাবুকতা-শক্তি থাকিলে এই ক্ষণ-সুন্দরকেই চির-সুন্দরের রূপে বরণ করিয়া—

And some win peace who spend
The skill of words to sweeten despair
Of finding consolation where
Life has but one dark end ;
Who, in rapt solitude, tell o'er
A tale as lovely as forlore,
Into the midnight air.

—সেই শক্তি তাঁহার নাই ; তাই, বার বার এই ক্ষণ-সুন্দরের মোহই তাঁহাকে চির-সুন্দরের দুয়ারে হাহাকার করাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবিপ্রাণ সে সান্ত্বনা আজিও পায় নাই—এ দ্বন্দ্বের অবসান ইহজীবনে হইবে না। তাই, মনে হয়, 'উদ্দেশে'-শীর্ষক কবিতায় বিয়োগ-বিধুর কবির সান্ত্বনালাভের প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া অতি নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-দেবতাও হাস্য সম্বরণ করিবে।*

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইংরাজী উক্তিগুলি J. Middleton Murry-প্রণীত 'Countries of the Mind' নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি—লেখক।

রবীন্দ্র মৈত্র

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমি দেখিয়াছিলাম ; যাহারা দেখে নাই তাহারা তাহাকে চিনিবে না। বাংলাদেশের আধুনিক 'সাহিত্যিক' সম্প্রদায়ের পরিচয় ছাপার হরফেই ভালো কারণ তাহারা মানুষ নয়, কেতাব। কিন্তু যে মানুষের জীবন-তথ্য তাহার আকৃতিতে, চলনে বলনে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে চাক্ষুষ হইয়া উঠে,—যাহার ব্যক্তিত্ব যেন সর্ব্ব অঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, তাহার পরিচয় কেবল কথায় দেওয়া যায় না ; রবীন্দ্র মৈত্র নামক মানুষটি বাহিরে ধরা দিয়াছিল আর দুইটি রূপে —তাহার কর্ম্মে ও তাহার সাহিত্য-সাধনায়। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির মিল ঘটে নাই ; এই উভয়ের মধ্যে যেখানে সামঞ্জস্য ছিল সেখানটিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই—অর্থাৎ নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মধ্যে আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গিয়াছে। এই সামঞ্জস্য-সাধনে সে প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—দ্বিদল চণকের সন্ধিস্থলে অঙ্কুর-উদ্গম হইতেছিল ; আশা-বিস্ময়ে উন্মুখ হইয়াছিলাম, বাংলাসাহিত্যে এক প্রাণবান শক্তিমান রসিক লেখকের অভ্যুদয় সুনিশ্চিত মনে করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম।

সে তাহার জীবনের প্রথম ভাগ নিয়োজিত করিয়াছিল কর্ম্মে, সে কর্ম্মের প্রেরণা ছিল তাহার হৃদয়ে। বর্ত্তমান যুগের বাংলাদেশ তাহাকে 'নিশির ডাকে'র মত ডাক দিয়াছিল—তাহার প্রাণ স্বপ্নবিভোর, দেহ ছিল জাগ্রত ; কর্ম্মের পশ্চাতে ছিল দুরন্ত হৃদয়াবেগ, বাস্তবের ভাবনা ছিল প্রেমের আশায় ও প্রেমের বিশ্বাসে প্রদীপ্ত। এই হৃদয়াবেগের সঙ্গে ছিল বলিষ্ঠ মনন-শক্তি,—সে একজন উৎকৃষ্ট বক্তা ছিল। তাহার চোখ দুইটি ছিল আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, আবেগে বিস্ফারিত ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। এই সব লইয়া সে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এত বড় অস্থির মানুষ আমি আর দেখি নাই, তাহার দেহ-মনে সর্ব্বদা একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইত। একই মানুষের মধ্যে, একই কালে, এমন ভাবগভীর আন্তরিকতা ও ব্যঙ্গকুশল রঙ্গরসিকতা আমি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সময় নাই অসময় নাই, ঝড়ের মত সে আসিয়া পড়িত ;

হয় ত অনাহারেই আছে, ভ্রূক্ষেপ নাই; দুই তিন ঘণ্টা তর্ক করিয়া, যুক্তি ও আবেগের অদ্ভুত ঝড় বহাইয়া, নিজের রচনা শুনাইয়া সে আবার ঝড়ের মত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল; কারণ, আর দাঁড়াইবার সময় নাই,—রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত তাহার কাজ আছে, ভূতের বেগার আছে, মুচি-মেথরের বস্তিতে পাঠশালার কাজ আছে, আরও কত কি আছে। তথাপি তাহার চোখ সর্ব্বদা হাসিতেছে, ক্লান্তি বা অবসাদের লেশমাত্র তাহার দেহে মনে কোথাও নাই।

এই ব্যক্তি ছিল লেখক, বাংলার বাণী-মন্দিরে ভক্তসাধক! লেখাও কম নয়, একদিকে সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি; অপরদিকে ব্যঙ্গ-কৌতুক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ও সর্ব্বশেষে নাটক। এই অজস্রতা ও অবাধ প্রবাহের শক্তি দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতাম। তথাপি মানুষটার মধ্যে যে শক্তির আভাস পাইতাম, সাহিত্যরচনায় তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইত। অনুকৃতিমূলক ব্যঙ্গ-রচনায় তাহার সৃজনীশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম, কয়েকটি ছোটগল্পে তাহার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু এ সকলের মধ্যে, কল্পনার মৌলিকতা, দৃষ্টিশক্তি, ও ভাবুকের অনুকম্পা থাকিলেও, ভাষায় ও রচনাভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট শিল্পীমনের বিশিষ্ট ছাপ তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। বুঝিতাম, এই শক্তিমান পুরুষ এখনও আত্মস্থ হয় নাই; নিজশক্তিকে ঠিক মত প্রয়োগ করিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লইবার অবকাশ তখনও হয় নাই। সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার জন্মগত সম্পদ হইলেও অনন্যমনা হইয়া তার সাধনায় ব্রতী হইতে সে এখনও পারে নাই—তাহার সাধন-মন্ত্র এখনও দ্বিধাযুক্ত হইয়া আছে। তাহার যে সকল রচনা তখন পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি তাহার বৈচিত্র্যে ও বলিষ্ঠতায় একটি সদাজাগ্রত হৃদয়, সাহসী মন, ও তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টির পরিচয় ছিল। যে ঝড়ের মত জীবন সে যাপন করিত, সেই ঝড়ের একটা লীলার দিক এই সকল রচনায় প্রকাশ পাইত—শক্তি আছে, বেগ আছে, যথেচ্ছ বিচরণের যোগ্যতা আছে, কিন্তু সে কোথায়ও দাঁড়ায় না, বসে না; ফলটি ফুলটি যাহা পথে পড়ে তাহাই কুড়াইয়া লইয়া আসে, ছড়াইয়া যায়; যাহা পায় তাহাকে ধ্যানের বস্তু করিয়া, অখণ্ড মানস-সূত্রে গাঁথিয়া, শিল্পী মনের গভীরতর পিপাসা উদ্রেক ও নিবৃত্তি করিবার অবসর যেন তাহার নাই। তাই তাহার রচনা-শক্তির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহাতে সেই সুর লাগে নাই, যাহা শিল্পীর আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মদর্শনের সুর—যে সুর রচনায় একবার বাজিয়া উঠিলে কাহারো

প্রতিভা সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। তথাপি, রবির কর্মজীবন ও সাহিত্য-চর্চ্চা—এই দুই দিকেই দৃষ্টি রাখায়, আমি আধুনিক সাহিত্যসম্বন্ধে একটা নূতন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

সকল যুগ সাহিত্য-সৃষ্টির যুগ নয়, কবি-প্রতিভার অধিকারী হইয়াও যুগ-প্রভাবের বশে কত লেখক পথভ্রষ্ট হইয়াছেন—কাব্য লিখিতে গিয়া বক্তৃতা লিখিয়াছেন, অথবা ভাবপ্রধান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কোন যুগে হয়ত মানুষের মনের পিপাসা রসপিপাসাকে অতিক্রম না করিয়া পারে নাই—সে যুগের কাব্যে ছন্দ-সঙ্গীত আছে, লিপিচাতুর্য্য আছে, আশ্চর্য্য উপমা-সমুচ্চয় আছে, ভাবের মৌলিকতাও হয়ত আছে—কিন্তু কল্পনা বা সৃষ্টিশক্তি পাণ্ডিত্য-প্রয়াসের দ্বারা আচ্ছন্ন। আমাদের সাহিত্যে গত যুগের কবিদিগের মধ্যে এমনই একজনকে দেখিতে পাই, যাঁহার উপর সে যুগের একটি প্রধান প্রবৃত্তি বিশেষ করিয়া ভর করিয়াছিল—ইনি 'মহিলা কাব্যে'র কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাঝে রবীন্দ্রনাথের যুগ গিয়াছে, সে যুগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক। তারপর আজ আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহাতে ভাব বা চিন্তার সমস্যা নয়—জীবনের সমস্যাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; এখন পাণ্ডিত্যও নয়, নিরুদ্বেগ সৌন্দর্য্যচর্চ্চাও নয়—এ যুগের প্রধান প্রবৃত্তি কর্ম্মপথে জীবন-জিজ্ঞাসা। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে এই কর্ম্মও স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না; কর্ম্ম অর্থে অতি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সন্ধান, এবং জীবন-জিজ্ঞাসার নাম কাম-প্রবৃত্তির উদ্দাম অধ্যবসায়। অতএব এ যুগও সাহিত্যসৃষ্টির যুগ নয় বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে যেমন চিন্তা ও ভাবুকতার অবকাশ নাই, আর একদিকে তেমনই জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহস নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এই অধঃপতিত সমাজে একাধিক মহাপুরুষের জীবন ও বাণী জাতির হৃদয়-গোচরে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীমূর্ত্তি—তাঁর সেই দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতিশ্চর্য্যা,—আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সে বাণী ব্যর্থ হয় নাই, হইবার নয়। মনুষ্য-দেহে দিব্য-আত্মার প্রকাশ ক্বচিৎ হয়; যখন হয়, তখন জগতে মন্বন্তর আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিবেকানন্দকে আজও আমরা চিনি নাই, তার কারণ, আমরা যুক্তিবাদী ও 'প্রগতি'-বাদীর আখড়ায় পরধর্ম্মের উচ্ছিষ্টভোজে এখনও লালায়িত; প্রাণধর্ম্মের দিব্যমন্ত্রে এখনও সাড়া দিতে পারি নাই; দেশ ও জাতির শত জন্মের চেতনা-

গহনে যে বিরাট আত্মা পথ হারাইয়া পথ খুঁজিতেছিল, তাহার সেই আকস্মিক পথ-প্রাপ্তির দৈব-ঘটনাকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই—এখনও সূর্য্যকে অস্বীকার করিয়া আলেয়ার অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু বিবেকানন্দ আমাদিগকে চিনিয়াছিলেন, তাই বিংশশতকের আরম্ভ হইতেই অচল-চক্র চলিতে সুরু করিয়াছে, সে চালনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে। দ্বিতীয় মহাপুরুষের বাণী শেষ হয় নাই, সে বাণীমূর্ত্তি আমরা এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্ত্তমান যুগে এই দুই বীর-মানব মন্বন্তরের মহাপ্লাবন রোধ করিয়া মৃত্যুস্রোতের উপরে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকে আরোহণ করিতেছে, সেই জাঙ্গাল ধরিয়াই জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে এ জাতির মধ্যে যেখানে যেটুকু জীবন-স্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আছে এই দুই মহাপুরুষের প্রেরণা—এ বিষয়ে এ যুগে ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই নাই; একথা অস্বীকার করিয়া—সাম্প্রদায়িকতার মোহে, কোনও মিথ্যাকে এখনও খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টা শুধুই নিরর্থক নহে, তাহা নীচতা ও শঠতার পরিচায়ক।

অতএব আজিকার সমাজে জীবন যে কোথায়ও নাই এমন কথা আর বলা চলে না। কিন্তু এই জীবন-চর্য্যা কি সাহিত্যচর্চ্চার অনুকূল? প্রশ্নটা কিছুকাল যাবৎ আমার মনে নূতন করিয়া জাগিয়াছে। জাতির মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে—একদিকে যে অতিরিক্ত ভাবাবেগ, আত্মভ্রষ্টতা ও অসংযম, এবং অপরদিকে যে ধরণের কর্ম্মোন্মাদ, আত্ম-উৎসর্জ্জনের অধীরতা—তাহাতে সাহিত্যিক প্রেরণা বা কবিকার্য্যের অবকাশ কোথায়? বিংশশতাব্দীর এই মন্বন্তরমুখে আমরা আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে বিশেষ বড় কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি? যাহা কিছু উৎপন্ন ও স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহা গত যুগের আদর্শ বা প্যাটার্ণের উপর সূক্ষ্মতর সূচীকর্ম্ম মাত্র—স্রোতোহীন বদ্ধ জলরাশি যতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ততই তাহা অগভীর হইয়াছে। ইহার কারণ, জীবনে যে বান ডাকিয়াছে তাহার গতি ভিন্নমুখী; সাহিত্যের যে আদর্শে আমরা দীক্ষিত হইয়াছিলাম তাহা ভাবাকুল আত্মপ্রসাদের আদর্শ; জীবনকে ফাঁকি দিয়া, মনুষ্যত্ব ও পৌরুষকে উপেক্ষা করিয়া, জীবিতের জীবনধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া, আমরা এক অতিসুন্দর মিথ্যার উপাসনা করিয়াছিলাম। এই মানস-আদর্শের দম্ভও কম ছিল না; ইহার পশ্চাতে ছিল উপনিষদের ব্রহ্মবাদ; কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের

আস্ফালন; সুরুচি, শুচিতা ও বিবেকের নামে আত্মসুখস্বাধীনতার জয়ঘোষণা; কুৎসিত কুরূপ ও কর্দ্দমাক্ত বলিয়া জাতি সাধারণের স্পর্শ বাঁচাইয়া একটা নূতন ধরণের কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা। সমগ্র শিক্ষিতসমাজে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মনোবৃত্তির প্রসার-কল্পে সাহিত্য কম সাহায্য করে নাই। এ আদর্শের প্রভাব এখনও সাহিত্যে প্রবল; অথচ জীবনে যেটুকু সত্যের সাড়া জাগিয়াছে, তাহা এ আদর্শের প্রতিকূল। এ যুগে জীবনের গভীরতর প্রবৃত্তির সঙ্গে এই স্বয়ুষ্ঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যধর্ম্মের বিরোধ আরও প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে; এককালে সাহিত্য যেমন জীবনের সত্যকে পরাভূত করিয়াছিল, এখন তেমনই, জীবনের সত্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু জীবনে এখনও সে দৃষ্টি আসে নাই—জীবনের অন্তস্তল হইতে যে সত্যসুন্দরের অভ্যুদয় হইবে, তাহারই দিব্য-প্রতিভায় অতঃপর সাহিত্যের নবকলেবর নির্ম্মাণের সময় আসিতেছে।

সময় এখনও আসে নাই—আসিতেছে। অতি-আধুনিক সাহিত্যের যেরূপ দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি, উহাতে কোনও নূতন প্রবৃত্তির প্রেরণা নাই; জীবনাবেগ-বর্জ্জিত, পৌরুষ ও মনুষ্যত্বদ্রোহী যে কুৎসিত মানস-ব্যভিচারকে আমরা উচ্চাঙ্গের সত্য বা স্বাতন্ত্র্যসাধনা বলিয়া আশ্বস্ত হইতে চাই —তাহা পূর্ব্বতন সাহিত্য-ধর্ম্মেরই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক পরিণাম; আধুনিক কালে জাতির যে জীবন-সমস্যা কাপুরুষ মানস-বিলাসীর আত্মপ্রসাদ বিঘ্নিত করিয়াছে, ইহা তাহাকেই অস্বীকার করিবার চেষ্টা। ইহা যে নূতন নয়, পুরাতনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহার প্রমাণ—এই আধুনিক সাহিত্য-ব্যভিচারের প্রতি সে যুগের সাহিত্যনায়ক মহাকবির অদ্ভুত মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত, অস্বীকার করিতেও অসমর্থ—কোথায় যেন একটা মমতাবন্ধন আছে। ইহারা যে বাস্তব জীবন-নীতি, দেশ ও জাতিধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত নয়, ইহারা যে কোনও সংস্কারের দাসত্ব করে না—সূক্ষ্ম মানসিকতা বা ভাব-বিলাসের পক্ষপাতী; ইহাদের রুচি ও রসিকতা যে অতি-আধুনিক য়ুরোপ বা 'বিশ্বের' আদর্শে সুসংস্কৃত, ইহাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসের কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষোভ ও লজ্জার কারণ এই যে, ইহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বা আর্টের আদর্শ খুব বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন নহে, ইহাদের মানস-বিলাসে

একটা রুচির শৈথিল্য আছে, মনের সাজসজ্জায় দুই রঙের তালি-দেওয়ার মত ইতরামি আছে ; এইখানে বাধে, মানস-বিলাসের সত্য-শিব-সুন্দর এইখানে ক্ষুণ্ণ হয়। তাই দেখিতে পাই, গত যুগের সাহিত্যাবতার এ যুগে বড়ই অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন, দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন, কাব্য ছাড়িয়া চিত্রকলার আশ্রয় লইতেছেন, জাতি ও সমাজের পরিবর্ত্তে 'বিশ্ব,' এবং সুন্দরের পরিবর্ত্তে মহামানব-বিগ্রহের সেবায় রত হইয়াছেন।

যতই দিন যাইতেছে ততই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এযুগে সাহিত্যের সে আদর্শ অচল ; কারণ, সত্য ও সুন্দরকে এখন আর মানস-বিলাসের সামগ্রী করা চলে না। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের ডাক পড়িয়াছে ; সেবায় ও ত্যাগে, মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের মহিমায় সত্য-সুন্দরের অভিনব প্রকাশ মানুষের চোখ ধাঁধিয়া দিতেছে। অন্তরের গভীরতম আবেগ আজ ভিন্নমুখী ; সেই মুখে সাহিত্য যদি আজ আপনাকে স্থাপিত করিতে পারে, তবেই এযুগে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব। নতুবা সাহিত্যক্ষেত্রে বানরের ব্যভিচারই প্রশ্রয় পাইবে।

কিন্তু জীবন-বন্যার এই অতি বেগবান স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহারই গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যাহারা সিন্ধুসন্ধানে চলিয়াছে—যাহারা বৃহৎ ও মহৎকে, সত্য ও সুন্দরকে, কর্ম্মের মধ্যে উপলব্ধি করিবার বাসনায় অধীর হইয়াছে তাহারা কি সাহিত্যধর্ম্মী ? রস-চর্চ্চা, আর্টের মর্য্যাদা-রক্ষা, খাঁটি কবিকল্পনার আবেগ কি তাহাদের পক্ষে সম্ভব ?—সাক্ষাৎভাবে হয়ত নয়। কিন্তু যাহারা সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে, এ যুগের এই প্রবলতম প্রবৃত্তি তাহাদের সেই প্রতিভাকে প্রভাবিত করিবে না ? য়ুরোপীয় বহু কবি-সাহিত্যিকের জীবনেতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা এমন সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যাইতে পারে যে, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, প্রত্যক্ষ-বাস্তবের ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির সাধনা—সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় নহে ; বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াই কবিকল্পনা শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে এই ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপ না দিলেও, যাহাদের ভাবনা ও কল্পনাশক্তি সুন্দর ও সতেজ—জাতির জীবন-ধর্ম্ম-সাধনা, যুগ বিশেষের সমষ্টিগত প্রেরণা, তাহাদের ব্যক্তি-চেতনায় সাড়া পাইয়াছে, রস-সঞ্চারের অনুকূল হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কাব্য-সংস্কার ও কবি-প্রবৃত্তি রসের যে আদর্শকে চিরদিন বরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার মতে, কাব্য-জগৎ বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্র

হইতে এতই দূরে যে, এ দুইএর মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিলে কাব্যের রসহানি অনিবার্য্য। তার কারণ, আমরা কবিত্বকে মনুষ্যত্ব হইতে পৃথকরূপে ধারণা করি, আমাদের কাব্যসাধনা একরূপ বানপ্রস্থ। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আমরা কখনও স্বীকার করি নাই, আমাদের সাহিত্যিক আদর্শ চিরদিনই অসম্পূর্ণ। তাই আজ জীবন যখন এমন করিয়া আমাদের সর্ব্ব-চেতনাকে গ্রাস করিয়াছে, তখন আমরা সাহিত্য-ধর্ম্ম বজায় রাখিবার কোনও উপায় আর দেখিতেছি না। পুরাতন আদর্শবাদীরা আজ চমকিত, বিভ্রান্ত; নূতন আদর্শের নূতন প্রেরণা এখনও নূতন রস-রূপের সন্ধান পায় নাই।

একই কালে জীবনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত নিজ বক্ষপঞ্জরে ধারণ করা, এবং তাহারই মধ্যে ধ্যাননিবিষ্ট দৃষ্টিতে রস-রূপের সাক্ষাৎকার—আজিকার সাহিত্য-সাধনায় কবিপ্রতিভার এই দুরূহ পরীক্ষা উপস্থিত। ভবিষ্যৎ কবি-শিল্পী হয় ত কল্পনার সাহায্যে তাহাকে আয়ত্ত করিবে; কারণ, তখন জীবনে ও সাহিত্যে বিরোধ ঘুচিয়া, উভয়ের মধ্যে রসের সংক্রমণ-সেতু নির্ম্মিত হইয়া যাইবে। কিন্তু আজিকার সাহিত্যসেবী এই দ্বন্দ্বের দ্বারা নিরতিশয় বিক্ষিপ্ত—আজ তাহাকে ভাব ও কর্ম্মের বিরোধ নিজের জীবনেই মিটাইয়া, সাহিত্যে নূতন রসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

রবীন্দ্র মৈত্রকে দেখিয়া ইহাই মনে হইয়াছিল। তাহার মত আরও অনেকে এই দ্বন্দ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভার সম্যক অবকাশ পাইতেছে না। কেহ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন একজনকে অন্ততঃ জানি, যাহার শিল্পী-মনের পরিচয় বহুপূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম; তাহার রচনায় কবি-শক্তির নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে; চিত্রকলার সাধনাও সে করিয়াছে; কিন্তু যুগ-দেবতার আহ্বান সে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই—ধ্যানের আসন ত্যাগ করিয়া সে অবশেষে প্রাণের তাড়নায় গৃহত্যাগী হইয়াছে। রবি জীবনের ডাক শুনিয়াছিল আগে, কর্ম্মোৎসাহই তাহার জীবনের আদি-প্রবৃত্তি। তাই, প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তাহাকে চিনিতে পারি নাই, তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার বিশেষ কোন উন্মেষ তখন লক্ষ্য করি নাই। পরে যখন তাহার রচনাশক্তির নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখনও তাহার শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইলেও, প্রতিভায় বিশ্বাস করি নাই। গত বৎসর সে যখন আমাকে তাহার কয়েকখানি পুস্তক দিয়া অভিমত

জানিতে চাহিল, তখন তাহার জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে আমি অধিকতর সচেতন হইয়াছি—লেখাগুলি আবার পড়িলাম, কিন্তু কোনও মন্তব্য করিলাম না। এবার যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, সে নিজ শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, আত্মপ্রত্যয়ের বিপুল সাহস তাহার চোখমুখে প্রতিভাত হইতেছে। সে তখন 'ঘৃতকুম্ভ' নামক উপন্যাস-রচনায় মশগুল; পরে সহসা বিষম কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেই 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' লিখিয়া 'শনিবারের চিঠি' ভরিয়া দিল। এই সময়েই আমি তাহাকে শেষ দেখি, এবং সেই দেখাতেই বুঝিয়াছিলাম, সাহিত্যে তাহার পথ সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। লেখাও পড়ি, মানুষটিকেও দেখি—একই বস্তু চোখে ঠেকে,—সত্যকার শক্তিচেতনার একটি সপ্রতিভ দৃঢ়তা, ও পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব উভয়ত্রই বিদ্যমান।

'ঘৃতকুম্ভ' অসমাপ্ত রহিয়া গেল। এই উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথম তাহার রসদৃষ্টির নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলাম। কেবল আবেগ বা অনুকম্পামূলক কাহিনী-রচনা নয়—এ রচনায় লেখক আত্মস্থ; জীবন ও চরিত্রের গভীরতর প্রদেশে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া অনাসক্তভাবে সেই রহস্য ধ্যান করিবার যে ভঙ্গি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহার গৌরব। ভাববাদ বা বাস্তববাদ,—সর্ব্ব বাদ-বিসম্বাদের সংস্কার উত্তীর্ণ হইয়া, কেবল জীবনের আবরণ উন্মোচন করিবার যে স্পৃহা, তাহাই এই উপন্যাসে লেখকের কল্পনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। কথাবস্তু বা ঘটনাসংস্থানে যেমন কোনও সংস্কারবশ্যতা নাই—নায়ক ও নায়িকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ প্রথাবিরুদ্ধ, তেমনই চরিত্র-চিত্রণে, মানবীয় প্রকৃতি অথবা সামাজিক সংস্কার—কোনটাই লঙ্ঘন করিবার সজ্ঞান অধ্যবসায় নাই; মোটের উপর কোথাও কোনও অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি নাই; আছে কেবল আধুনিক জীবন-যাত্রার রঙ্গমঞ্চে চিরন্তন মনুষ্য-হৃদয় লইয়া এক অভিনব রস-রহস্যের অভিনয়। এই উপন্যাসে নায়িকার যে চরিত্র কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেই লেখকের মৌলিকতার পরিচয় আছে; এই চরিত্রের রহস্যই কাহিনীকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। রবির প্রতিভার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই উপন্যাসে।

'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন—লেখক দেখেন নাই; দেখিলে নাটকখানির সম্বন্ধে আরও নিশ্চিতভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিতাম। অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে

আকৃষ্ট করিয়াছে—এই রচনার উৎকৃষ্ট হাস্যরস। উপন্যাসে ও গল্পে যেমন হউক, বাংলা নাটকে আমরা সাধারণতঃ যে হাস্যরসে অভ্যস্ত—তাহা রঙ্গরস মাত্র। যে হাসির অন্তরালে অতি গভীর criticism of life আছে, অর্থাৎ, যে হাস্যরস উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কোনও মর্ম্মস্থল উদ্‌ঘাটিত হয়—তাহাই কাব্য, তাহাই উৎকৃষ্ট রস। 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী' এই দুইটি রচনায় লেখকের অকৃত্রিম জীবন-প্রীতি বা জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় রহিয়াছে। এই মানস-ভঙ্গি অতিশয় দুর্লভ; যে দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতে জানিলে, একই কালে অধর হাস্যরঞ্জিত ও নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে, তাহাই রসিকের দিব্যদৃষ্টি। রবি এ দৃষ্টি পাইল কোথায়? সে ত' আজীবন দুরন্ত আবেগে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে; কখন কেমন করিয়া সে এই স্থির রসদৃষ্টি লাভ করিল!

আজ যে তাহাকে স্মরণ করিয়া এত কথা বলিতেছি, তাহার মূলে আছে এই বিস্ময়। রবি তাহার সাহিত্য-সাধনায় যে সিদ্ধির পথে পা দিয়াছিল, আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে যে-সিদ্ধিলাভ সে নিশ্চয় করিত, তাহা হইতে একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়াছি। আমি সাহিত্যের যে যুগোচিত আদর্শ ও সাধনার কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রবির সাহিত্য-সাধনায় তাহার একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাইতেছি। রবির জীবনে ছিল একটা প্রচণ্ড আবেগের তাড়না, তাহারই বশে সে তটভূমি ত্যাগ করিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল—এক মুহূর্ত্ত কর্ম্মের উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি ছিল না; যুগধর্ম্ম তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। জাতির জীবন-সঙ্কট, ধর্ম্ম ও সমাজ-রক্ষার দুরূহ সমস্যা, বর্ত্তমানের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রাচীনের ভিত্তিমূল একেবারে ভাসিয়া যাওয়ার উপক্রম, ব্যক্তির আত্ম-সাধনায় সত্য-মিথ্যার অনিশ্চয়তা,—এ সকল তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল; নূতন ও পুরাতন, ব্যক্তি ও সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও মানব-সেবা—সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ-বাস্তবের প্রতি এই আসক্তি সত্ত্বেও তাহার সহজাত রস-পিপাসা সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল, ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও স্থিরবিন্দুটিকে ধরিবার সাধ ও সাধনা সে কখনও ত্যাগ করে নাই। মনে হইয়াছিল, বুঝি এই দ্বন্দ্ব সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না, তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা হার মানিবে—তাহার শক্তি, জীবনকে দেখা অপেক্ষা জীবনকে জয় করার দিকেই ব্যয়িত হইবে। কিন্তু শেষ দুইটি রচনা পড়িয়া সন্দেহ দূর হইল; বিশ্বাস হইল,

সে জীবন ও সাহিত্যের সুগভীর রস-সঙ্গতি প্রাণের মধ্যে লাভ করিয়াছে—সহসা সে এমন একটি স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, যেখানে জীবনের খরস্রোত নিঃশব্দ-গভীর, অতিচঞ্চল জ্যোতিঃপ্রবাহ স্থিরশিখায় দীপ্যমান। জীবনকে এমন করিয়া জয় করিবার সাধনা যে না করিবে, এ যুগে তাহার দ্বারা উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হইবে না। বাস্তব-বাধাহীন নিরঙ্কুশ কল্পনার দিন গিয়াছে, সোনার স্বপন দেখিবার কাল আর নাই,—লোহাকেই বক্ষ-শোণিতের রসায়নে সোনা করিয়া তুলিতে হইবে, জীবনের বাস্তব সুখদুঃখের তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়া এই দেহের শুক্তি-গর্ভে মুক্তা ফলাইতে হইবে; ইহাই এ যুগের কাব্যসাধনা। রবির অসমাপ্ত সাহিত্য-সাধনা ইহারই ইঙ্গিত করিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যুগ-প্রভাব প্রতিকূল হইতে পারে, যুগ-প্রভাবের প্রবল শাসনে কবিপ্রকৃতিও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে; অথচ যুগকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া কবি-মানসের যে স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা, তাহাও সত্য নহে—কল্পনার সে স্বাতন্ত্র্য যতই ব্যক্তিত্ব-মহিমায় মণ্ডিত হৌক, তাহাতে কাব্যের উৎকর্ষহানি হয়। কাব্য যতই সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বভৌমিক হৌক—যুগ, জাতি, ও দেশের ভাব-চৈতন্যের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এইজন্য, যদি সে সকলের প্রবৃত্তি কাব্যসৃষ্টির অনুকূল না হয়, তাহা হইলে রসিকচিত্তও নিগৃহীত হয়, সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে যে যুগ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে তাহা কাব্যসাধনার অনুকূল না হইলেও, তাহার মূলে ভাবাতিরেক আছে—অতিদৃঢ় কর্ম্মব্রত-উদ্‌যাপনের মধ্যেও প্রবল হৃদয়াবেগ আছে। জীবনের গুরুতর সমস্যা অনুধাবন করিয়াই যাহারা কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহারাও কর্ম্মবুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের আদর্শকেই আশ্রয় করিয়াছে; এই ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালীর চরিত্রে বদ্ধমূল। কর্ম্মের কামারশালে অতিতপ্ত লৌহপিণ্ড হাতুড়ির আঘাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, তাহাতে শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গ-রাশিই যে সাহিত্যের দীপপাত্রে আলোকশিখায় পরিণত হইতে পারে, রবির জীবনে তাহারই আভাস আছে; অর্থাৎ, 'through literature to life' একদিক দিয়া যেমন সম্ভব, তেমনই, 'through life to literature' আমাদের পক্ষে এযুগে শুধুই সম্ভব নয়, ইহা ভিন্ন সাহিত্যের গত্যন্তর নাই। যুগধর্ম্মের যে প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে বর্ত্তমানে সাহিত্যের সম্বন্ধে নিরাশ্বাস হইয়াছিলাম; কিন্তু

এইরূপ দৃষ্টান্তে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে, মনে হইতেছে—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এযুগে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু ভাবপ্রবণ রস-পিপাসু বাঙ্গালী, জীবনের বন্যাবেগ বক্ষে ধারণ করিয়াই সাহিত্যে নূতন রস-রূপের প্রতিষ্ঠা করিবে; ভাব-চৈতন্যের গহন-অতলে, জীবন ও মৃত্যুর প্রচণ্ড সংঘর্ষে যে ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তাহারই মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে আত্মার রস-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অভয়প্রাপ্ত হইবে,—বাঙ্গালীর জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণবের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এতদিনে এক অপূর্ব্ব জীবন-সঙ্গীতে লয় পাইবে। রবির অসমাপ্ত সাহিত্য-সাধনায় যে সিদ্ধির আভাস পাইয়াছি, তাহাতেই এত কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

রবির জীবনে এযুগের মূল প্রবৃত্তি—সর্ব্বদ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের উৎকণ্ঠা—সর্ব্বাঙ্গীণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহারই অন্তর্গত-রূপে সাহিত্যের সমস্যাও সমাধানের পথ খুঁজিতেছিল। আধুনিক জীবনযাত্রার যত কিছু বৈসাদৃশ্য, তাহার মধ্যেই 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী'র লেখক একটা গভীরতর রস-সত্যের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব ও আশান্বিত হইয়াছিল। 'ঘৃতকুম্ভ' নামে যে উপন্যাস সে ফাঁদিয়াছিল, তাহাতে একটা উদ্ভট ঘটনা-সংস্থানে ট্রাজেডির ছায়াপাত হইয়াছে; নীতি ও দুর্নীতি উভয়কে সবলে পাশ কাটাইয়া তাহার কল্পনা যে পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহার গন্তব্য ছিল মানুষের হৃদয়-রহস্যের শাশ্বত তীর্থমন্দির। উপন্যাস অসমাপ্ত রহিয়া গেল, তথাপি তাহার কল্পনার যে ভঙ্গি ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার পূর্ণ পরিণতি এই প্রথম রচনাতেই দৃষ্টিগোচর না হইলেও, সে ভঙ্গি যে কালে অপরূপ সাফল্যে মণ্ডিত হইত, সে অনুমান মিথ্যা নহে। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' রচনাহিসাবে সার্থক হইলেও, খুব বড় কিছু নয় সত্য; কিন্তু ইহার মধ্যেও জীবন-রস-রসিকতার যে ভঙ্গি চোখে পড়ে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অল্প ছিল না। ঘটনাবস্তু সামান্য হইলেও, এবং তাহাতে কল্পনার গভীরতা ও অবকাশ যথেষ্ট না থাকিলেও, লেখকের সৃষ্টিশক্তি ও রসদৃষ্টির প্রচুর প্রমাণ ইহাতে আছে। নবযুগের নূতন ভাবপ্রেরণাও ইহাতে লক্ষিত হইবে; অতিশয় বিরুদ্ধ সংস্কারসম্পন্ন নরনারীর একটি সহজ আত্মীয়তা—উদার প্রীতির সম্ভাব্যতা—যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে, অতিশয় প্রাচীনভাবাপন্ন পাত্র-পাত্রীর মনে অতি আধুনিক আদর্শও অজ্ঞাতসারে যে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে, তাহাই নাটকখানিকে এমন হাস্য-

মধুর করিয়া তুলিয়াছে ; কল্পনার এই প্রবৃত্তিই ঘটনা ও চরিত্রগুলির উদ্ভাবন করিয়াছে। সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের উপরে মানুষের হৃদয় যে চিরজয়ী হইয়া আছে—সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতির সমস্যা যেমনই হোক, ধরণীর মহারাসে রসিক-শেখরের রাসলীলা কিছুতেই বাধা মানে না—এই দিব্য-উপলব্ধি রবীন্দ্র মৈত্রকে কর্ম্মী হইতে কবিপদবীতে তুলিয়া ধরিতেছিল। জীবনের আবর্ত্তসঙ্কুল স্রোতে যে নির্ভাবনায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পক্ষেই এই রসদৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল ; কারণ, বাস্তবকে যে সত্য করিয়া দেখিতে পারে, সুন্দর তাহার কাছেই ধরা দেয়। রবির সাহিত্য-প্রতিভা যে শেষে নাটকের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল এবং তাহাতেই স্ফূর্ত্তি পাইত বলিয়া মনে হয়—ইহাও আশ্চর্য্য নহে। যে কল্পনা জীবনের গতিবেগ ও কর্ম্মোন্মাদনা হইতে আপন পুষ্টি সংগ্রহ করে, তাহার প্রকাশ-ভঙ্গি নাটক হওয়াই স্বাভাবিক। এই নাটকের অভাব আমাদের সাহিত্যে এখনও ঘুচে নাই। খাঁটি নাটকীয় প্রতিভা এদেশে এত দুর্লভ কেন, এবং আগামী বাংলা-সাহিত্যে নাটক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে কি না—সে প্রশ্নের উত্তর রবির জীবন ও তাহার সাহিত্য-সাধনার কাহিনী হইতে মিলিতে পারে।

রবির সম্বন্ধে আজ আমার যাহা মনে হইতেছে তাহার প্রায় সবটাই বলিয়া রাখিলাম। তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার সময় আসে নাই, তাই এতদিন কিছুই বলি নাই। কিন্তু তাহার বলা সে শেষ করিয়া গিয়াছে, সকল আশা, সকল কামনার অন্ত হইয়াছে ; তাই, একদিন যাহা সম্পূর্ণ প্রমাণসহকারে, অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিবার আশা করিয়াছিলাম, আজ তাহাই দ্বিধাকম্পিত কণ্ঠে সসঙ্কোচে বলিলাম। একদিন সে বড় আব্দার করিয়া নিজের রচনাসম্বন্ধে আমার অভিমত চাহিয়াছিল, সেদিন তাহার সে আব্দার রক্ষা করিতে পারি নাই। আজ সে নাই, আমার অভিমতের মূল্যও আর নাই ; বাঁচিয়া থাকিলে কামনা করিতাম কাহারও অভিমতের প্রয়োজন যেন তাহার না থাকে। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে নবযুগের কর্ষণ চলিতেছে ; যে দুই চারিটি বীজ ইতিমধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে তাহাদের একটি ; প্রার্থনা করি, অপরগুলি শাখা-পল্লবে ফলে-ফুলে নিজ নিজ আকার ও আয়তন লাভ করুক, কিন্তু রবির সাধনার প্রায় সবটুকুই ভূমিতলে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল। অকাল-মৃত্যু আরও অনেকের হইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া ফুটিবার মুহূর্ত্তেই কেহ ঝরিয়া

পড়ে না। মৃত্যুকে অনেকরূপেই দেখিলাম—মোহ আর নাই, শোক করিতেও লজ্জা হয়। মহাকাল আপনার প্রয়োজন বোঝে—লাভের অঙ্ক তাহারই, ক্ষতির হিসাবও সেই পূরণ করিবে; আমরা দিন-মজুরীর মজুর মাত্র, নালিশ করিবার কে?

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা

১

সম্প্রতি বাংলা কাব্যে একটি নূতন ছন্দের আমদানি হইয়াছে, এবং সাহিত্যের নূতন-বাজারে তাহার বিজ্ঞাপনের পটহ-নাদ শুনা যাইতেছে। এই ছন্দের নাম হইয়াছে 'গদ্যচ্ছন্দ'। নাম হইতেই বুঝা যায় ইহার জাতি-নির্ণয় এখনও ঠিক মত হয় নাই। কারণ 'গদ্যচ্ছন্দ' ও 'সোনার পাথর-বাটি' একই ধরণের কথা। ছন্দ শব্দটির শাস্ত্রসম্মত অর্থ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'মেজার' (measure)। গদ্যের একটা 'রিদ্‌ম্‌' (rhythm) থাকিতে পারে, কিন্তু 'মেজার' নাই। গদ্যের বাক্য-রচনায় অন্বয়-সম্ভূত ধ্বনিপ্রবাহ আছে, কিন্তু তাহা ছন্দ নয়; একজন সমালোচক তাহাকে 'দি আদার হার্মনি' বলিয়াছেন। এই 'হার্মনি' গদ্যের জন্মদিন হইতে ক্রম-পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু 'গদ্যচ্ছন্দ' নামে আধুনিক কালে যাহা ঘোষিত হইতেছে তাহা ছন্দ তো নয়ই—অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রিদ্‌ম্‌'ও নয়।

তবে উহা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আধুনিক বিনি-ছন্দের কবিতার একেবারে গোড়া ধরিয়া টান দিতে হয়। এই সাহিত্যের প্রেরণা যে খাঁটি কাব্যরসের প্রেরণা নয়, একথা এই যুগেরই রসিকসমাজ বার বার বলিয়াছেন। কিন্তু শোনে কে? যাঁহারা আধুনিকত্বের দাবী করেন, তাঁহারা বলেন,—প্রাচীন কালে (অর্থাৎ, ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে) মানুষ যাহা ছিল আজ সে আর তাহা নয়। সে-যুগের সুখ-দুঃখ, আশা-বিশ্বাস এ-যুগের তুলনায় বালকোচিত ও হাস্যকর; তাহারা সারাজীবন—পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের বেত্রাধীন পড়ুয়ার মত—ধর্ম্ম, পরকাল ও ভগবানের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। আজ মানুষ সাবালক হইয়াছে, তাহার চোখ খুলিয়াছে—কাল্পনিক নরকের মত কাল্পনিক স্বর্গও আজ উবিয়া গিয়াছে। ভূত, ভগবান ও প্রেম—একই পর্য্যায়ের কুসংস্কার; ধ্রুবত্ব বা পূর্ণতার কোনও মনঃকল্পিত আদর্শ তাহাকে আর প্রবঞ্চিত করিবে না। যাহা গোচর তাহার অন্তরালে কোনও অগোচর, যাহা বাস্তব তাহার অতিরিক্ত কোনও তত্ত্বঘটিত অবাস্তব, যাহা তথ্য তাহার ইঙ্গিতস্বরূপ

কোনও বৃহৎ সত্য, যাহা খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট তাহারই আশ্রিত কোনও অখণ্ড-মণ্ডল—সে আর স্বীকার করিবে না। সৃষ্টির অন্তরালে কোনও রহস্য নাই; অর্থাৎ এমন কিছু নাই যাহা থাকিয়াও দুর্জ্ঞেয়। যাহা আছে তাহা সম্মুখেই আছে, এবং তাহা মানুষের মনকে উত্তেজিত করে মাত্র (মন ছাড়া আর কিছু নাই); তাহাকে প্রশ্নকাতর ও সংশয়াকুল করিয়া তোলে; সে প্রশ্নের—সে সমস্যার সমাধান নাই,—কেবল আছে একটা আদি-অন্তহীন, অর্থহীন, ন্যায়নীতি ও আদর্শহীন মহাকোলাহল। মানুষ কেবল প্রশ্ন করিবে, জবাব প্রত্যাশা করিবে না—অসংলগ্ন তথ্যরাশি স্তূপাকার করিয়া প্রত্যেকটির উপরে একটি প্রশ্ন-চিহ্ন আঁকিয়া দিবে।

এই অতি-আধুনিক জীবন-চেতনাকে জীবন-রস-রসিকতা বলিলে ভুল করা হইবে; কারণ, রসিকতার লক্ষণ ইহা নহে। মানুষ বাস্তবকে কখনও অস্বীকার করে নাই। বস্তু-জিজ্ঞাসা ও বাস্তব-বাদ মানুষের রক্তমাংসেরই ধর্ম্ম; অতএব এ ধর্ম্ম পৃথিবীতে নূতন নয়,—বরং শাশ্বত সনাতন। ইহাই জীবধর্ম্মের নিদান। এই ধর্ম্মেরই প্ররোচনায় মানুষের চরিত্রে ও জীবনযাত্রার আদর্শে মোটামুটি তিনটি রূপ ভেদ দেখা যায়—জ্ঞানশক্তির বৈরাগ্য, প্রেম-শক্তির রস-পিপাসা ও কর্ম্মশক্তির ভোগ লিপ্সা, এই তিনের অবশ্যই নানা রূপ-সঙ্কর আছে, তাহারও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। কিন্তু শক্তি ও স্বাস্থ্য যেখানে অটুট, সেখানে এই তিনের রূপভেদ স্পষ্ট চোখে পড়ে, আধুনিক মানুষ শক্তি ও স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, তাই শক্তিহীন জ্ঞান, শক্তিহীন প্রেম, ও শক্তিহীন কর্ম্ম তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছে। কোনও একটার প্রাবল্য না থাকায়, এই তিনেরই নিম্নভূমির সাম্যাবস্থা তাহার আত্মচেতনাকে দুর্ব্বল করিয়া সংশয়-বিমূঢ় ও নাস্তিক করিয়া তুলিয়াছে। সে পৃথিবীকে—জীবনকে ভালবাসে; কিন্তু সে-ভালবাসায় রসিকের সংশয়মুক্তি নাই, কারণ তাহার প্রেম শক্তিহীন; তাহার জ্ঞানও মস্তিষ্কপীড়া মাত্র—আত্মচেতনার সহায় নয়, তাই তাহার প্রেমও ব্যাধি হইয়া দাঁড়ায়। আবার, ইহার সঙ্গে যদি ভোগস্পৃহার কর্ম্মশক্তি দুর্ব্বল কামনায় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে—ভোগ্য বহির্বস্তুকে কর্ম্মপ্রতিভা বা সবল অহংচেতনার দ্বারা স্ববশে আনিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে অবিশ্বাসের আত্ম-দ্রোহ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক কালে মানুষের এই অবস্থা—অর্থাৎ

ওই তিন শক্তির নিম্নতলের তামসিক সাম্যাবস্থা ঘটিবার বহু কারণ আছে। এ-যুগে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত নরনারীর সংখ্যাই অধিক, তাই এইরূপ মনোবৃত্তিই আধুনিকতার একটি লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, ইহা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য মাত্র,—নতুবা, ইহা নূতনও নয়, অসাধারণও নয়। আজ ইহা যে-ভাবে ও যতদিকে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাই নূতন, এবং তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সকল যুগের মত এ যুগেও প্রকৃত রসিকের সংখ্যা খুবই অল্প,—কিন্তু শ্রোতা বা পাঠকের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় তাহাদের মনোমত লেখকের সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে।

সত্যকার রসপ্রেরণা জীবন-চেতনাকে আশ্রয় করিয়াও তাহাকে উত্তীর্ণ হইয়া বিরাজ করে। রস-পিপাসার যে প্রেম তাহা সকল বিরোধ, সকল স্বার্থ ও সকল সমস্যাকে জয় করিতে পারে বলিয়াই—মানুষের সে একটি দিব্যশক্তি; তাহা বন্ধনমুক্তি নয়—বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি। এইরূপ মুক্ত হইবার শক্তি যাহার নাই সে কবিই নয়। সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয় বলিয়া—নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে কবিত্বঞ্চ সুদুর্ল্লভং। এ-যুগের কবিযশঃপ্রার্থী যাঁহারা তাঁহারা কবিত্বের উপরে নরত্বকে স্থান দিবার পক্ষপাতী; কিন্তু নরত্বের মহিমা উপলব্ধি করা এবং নরমাত্রকেই দেবত্বের আসনে স্থাপিত করা এক বস্তু নহে। জগতের যাঁহারা শ্রেষ্ঠকবি, তাঁহারা নরত্বের অগাধ অসীম মহিমাসাগরে স্নান করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছেন; কিন্তু সে-সাগর বিচ্ছিন্ন কূপ-পল্বলের সমষ্টি নয়। তাহার উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-চূড়া হইতে নিম্নতম গহ্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদের রসদৃষ্টি সমান সঞ্চরণ করিয়াছে—নরলীলার অনন্ত বিচিত্র রূপ তাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা মানুষকে অবস্থার দাসরূপে দেখেন নাই—সর্ব্ব অবস্থায় মানুষকেই দেখিয়াছেন। দেখিবার এই ভঙ্গিই কবিশক্তি, ইহাই কবি ও কাব্যকে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ববাদের অধীন করিয়াছে। এই তত্ত্বকে আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেও অস্বীকার করিতে পারে নাই।

আজ সাহিত্যে যে নব-আদর্শের ঘোষণা হইতেছে তাহা এই তত্ত্বকেই স্বীকার করে না। অতি-আধুনিক সাহিত্যে যে-বস্তুর আত্যন্তিক অভাব লক্ষ্য করা যায়—তাহা মানুষের নিজেরই সৃষ্টি-শক্তির অভাব। সৃষ্টিকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে জেরা করা, তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া আত্ম-অপরাধ-

স্খলন, অথবা, কাহারও অপরাধ নয় বলিয়া আত্ম-অপরাধও অস্বীকার করা—ইহাই যেন এ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। ইহাতে স্বীকার করা হয়, মানুষ প্রকৃতিরই অধীন, এবং যেহেতু জড়প্রকৃতির মূক ওষ্ঠে কোন কিছুর জবাব মেলে না—সেই হেতু মানুষেরও কোন প্রকার জবাবদিহি নাই। অতএব প্রকৃতি-শাসিত জীবনের অমীমাংসিত সমস্যাই সাহিত্যের উপজীব্য! এতকাল এই সৃষ্টির উপরেও মানুষ যে সৃষ্টি করিয়াছে—যে-সৃষ্টিতে জড়ের উপরে চিৎ জয়ী হইয়াছে, সে সৃষ্টি যে-শক্তির দ্বারা সম্ভব, তাহা ইহাদের অজ্ঞাত। ইহা কোনও মতবাদের কথা নয়, অপরোক্ষ উপলব্ধির বিষয়; ইহা যে-ধরণের কালচার বা চিত্তশুদ্ধির ফল, আজিকার দিনে তাহা যদি দুর্লভ বা অসম্ভব হয়, এবং সেই কারণে কাব্যরচনাও যদি ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু অশক্তিকে শক্তি বলিব কেন? যাহা কাব্য নয় তাহাকে জোর করিয়া কাব্য বলি কেন?

২

উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি অতি-আধুনিক সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখকের লেখা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। সাহিত্যে এরূপ রচনারও স্থান আছে—মানুষের মনের ইতিহাসের উপকরণ-হিসাবে। মানব-মহানাটকের কোন বিশিষ্ট রসরূপ ইহাতে নাই, বরং সেই নাটকের অন্তর্গত পাত্রবিশেষের মুখনিঃসৃত খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বাক্যহিসাবে এগুলির কিছু মূল্য থাকিতে পারে। কথাগুলি এই—

মানুষের মানে চাই—
পোটা মানুষের মানে!
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে,
নইলে সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা হয় না!

* * *

মানুষের মানে চাই!
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর মোছা চলেছে?

লেখক মানে চান—সৃষ্টির মানে চাই, তাই মানুষের মানেটা আগে দরকার। কিন্তু মানুষ বিধাতার নিজেরই একটি জিজ্ঞাসা—মহাকালের পাতায় তার অর্থ লেখা আর মোছা হইতেছে, অর্থাৎ, সে অর্থ কখনও সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এ ব্যাপার কাব্যের পক্ষে অব্যাপার ; এ জিজ্ঞাসা দর্শনের, কাব্যের কোন জিজ্ঞাসা নাই ; তাই কাব্যপ্রেরণা-হিসাবে ইহা মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। আবার, লেখকের দার্শনিকতা কাব্যের ভঙ্গি করিতে গিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি 'গোটা মানুষে'র অর্থ চান—শুধুই 'কাফ্রী ক্রীতদাস', 'হারেমের খোজা', 'ল্যাংড়া তৈমুর', 'হূন আত্তিলা', বা বুদ্ধ-খৃষ্টের মানে নয়,—চাই গোটা মানুষের মানে। এই 'গোটা মানুষ' কি ?—যে-মানুষ একাধারে ব্যক্তি এবং ব্যক্তি নয়, তাহার ব্যক্তি-সত্তার তুচ্ছতাই সর্ব্বব্যক্তি-মহিমায় উজ্জ্বল হওয়া চাই। ইহার অবশ্য কোনও অর্থ হয় না—তবু অর্থ চাই !

যে-'মানে' হয় না, সেই 'মানে'-চাওয়ার অর্থ এই যে, কোনও 'মানে'তেই তাঁহার রুচি নাই। কারণ, জীবনকে কোনও নীতি বা তত্ত্বের বাঁধনে বাঁধিয়া লইতে তিনি নারাজ। অতি-আধুনিক পথের পথিক যাহারা, তাহারা জীবনের কোনও অর্থ জানিতে চায় না ; তাহাদের কোনও গুরুমশাই নাই, এবং অর্থহীন বলিয়া কোনও কিছুকে তাহারা অপকৃষ্ট মনে করে না। তাহারা মানে চায় না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে কিছু বুঝে—এমন স্পর্দ্ধাও তাহাদের নাই। লেখক বলেন—

"আমরা স্বীকার করব না কি যে, সে উপলব্ধি আমাদের কত ক্ষীণ ! নিজেকে অপরকে আমরা কতটুকু বুঝি ? তবে যেটুকু চিনি আমরা অকপটচিত্তে বলি।* * আর সমস্ত বলার আড়ালে থাকবে একটি প্রচ্ছন্ন বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এটুকু আমাদের দুর্ব্বলতা, আমরা যে মানুষ।"

"আমরা নব-উন্মীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যাত্রা দেখব, আর বলে' যাব।"

সে দেখা আর বলা এই রকম—

ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে একটা ঘাসের গুছি অনেকদিন
জীবনের জন্ত যুঝেছিল—
প্রতিদিন দেখতাম কী তার প্রাণান্ত প্রয়াস একটা পুষ্পিত
প্রশাখা প্রসারিত করবার জন্তে !
একদিন বুঝি একটি ফিকে বেগুনিরঙের ছোট্ট ফুল ফুটেছিল,
কিন্তু মূল তখন দেউলে হয়ে গেছে ;—সব শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেল।

পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নিষ্কলঙ্ক শিশুর দল
ক'টা ইঁদুর ছানা ধরে'
তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে—কি সরল পৈশাচিকতা!
সৃষ্টির মূলেই যে নির্ব্বিকার নির্ম্মমতা!
দেখি, মৃত্যুর-শিয়রে-নেওয়া চির-বিলাপের শপথ শাপ হয়ে ওঠে,
শুনি, বৃদ্ধ তার যৌবনের প্রেম নিয়ে পরিহাস করছে!
জীবনকে ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।
চীৎকার ক'রে বলি,
ভগবান যদি না থাকে ত' সৃষ্টি হোক্, আমি অভিসম্পাত দেব!"
হায় দুর্ব্বল মানবক!

উপরের এই সকল বচন হইতেই আধুনিক মনের ভঙ্গি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র অতি-আধুনিক সাহিত্যের একজন মনস্বী লেখক ও সমর্থনকারী apologist, তাঁহার কথাগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছি; এগুলি ১৩৩৩ সালের 'কালিকলম'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যেমন অর্থের উপর আস্থাহীন, তেমনই তাঁহার কথাগুলির অর্থও খুব স্পষ্ট নয়। এই যে মনোবৃত্তি, ইহা কবি-মনোবৃত্তি নহে; কারণ, কোন-কিছুর মানে করিতে না চাহিলেও—জিজ্ঞাসা ইহাতে আছে; নাস্তিক্য-বাদও একটা সিদ্ধান্ত—একটা বিচারবিতর্কমূলক তত্ত্ব। এই 'অর্থ চাইনা' যদি রসাবেশ-মূলক হইত, তবে ইহাকে কবিধর্ম্ম বলা যাইত। কারণ, জিজ্ঞাসা যেখানে উন্মুখ নয়, একেবারে স্তম্ভিত,—অর্থ-অনর্থের দ্বন্দ্ব যেখানে এক অপূর্ব্ব চেতনায় লয় হইয়া যায়, সেইখানেই কাব্য-সৃষ্টি হয়; এবং কাব্য অপরা সৃষ্টি, সে সৃষ্টির যিনি বিধাতা তাঁহার কোনও কৈফিয়ৎ থাকে না। অর্থ চাই না, অথচ মানস-বৃত্তি খুবই সজাগ—এ অবস্থা সুস্থ অবস্থা নয়। শেষের উদ্ধৃত পংক্তি-কয়টিতে লেখক উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন—সে কথা গদ্য-কবিতার আকারে নূতন বটে, কিন্তু কথাহিসাবে অতি পুরাতন। তথাপি, সৃষ্টির এই 'সরল পৈশাচিকতা' ও 'নির্ব্বিকার নির্ম্মমতা' মানুষকে অপদস্থ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এই নিদারুণ নির্ম্মমতাকেই রসরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন—জীবনের সুখ-দুঃখের তিনিও কোন অর্থ করেন নাই। মানুষ যে কত দুর্ব্বল, 'গোটা মানুষে'র চেহারা যে কি, তাহা তিনি দুই চক্ষু পূর্ণ-উন্মীলিত করিয়াই

দেখিয়াছেন ;—'মানুষের মানে' তিনি চান নাই, কারণ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু প্রকৃতি-পীড়িত মানুষের এই অসহায়, নিরুপায় অবস্থা সত্ত্বেও তিনি মানুষের আত্মাকে অবিশ্বাস বা অসম্মান করেন নাই। ভগবানকেও দায়ী করেন নাই, 'দুর্ব্বল মানবক' বলিয়া মানুষকেও কৃপা করেন নাই, কারণ তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা,—ভগবানের দোসর এবং শয়তানেরও সখা। আমাদের দেশেও এই 'সরল পৈশাচিকতা' উচ্চ সাধন-মার্গের সহায় হইয়াছে ; মানুষ ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই।

কিন্তু অতি-আধুনিক সাহিত্যের মতবাদী লেখক এ কথায় সন্তুষ্ট হইবেন না ; কারণ—কবি, সাধক বা বীর হইলেই চলিবে না—তাঁহার 'গোটা মানুষ' চাই। এই 'গোটা মানুষে'র অখণ্ড অধিকারে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষকে বসাইতে হইবে ; অথচ, এইরূপ ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন মনুষ্য-জীবনে কেবল খণ্ডতাই আছে, অখণ্ডতা নাই—এবং তাহাই একমাত্র বাস্তব সত্য ; অতএব, জীবনের কোনও অর্থ হইতে পারে না, উহা একান্তই দুর্ব্বোধ এবং জটিল। এ অবস্থায় কবি-সাহিত্যিকেরা কি করিবেন ?—তাঁহারা কেবল দেখিবেন ও বলিয়া যাইবেন ; এবং সেই বলার আড়ালে একটি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকিবে। একখানা খাতায় কেবল যাহা ঘটিতেছে তাহাই নোট করিয়া লইবেন—তথ্যের সত্যনিষ্ঠা থাকিবে, এবং তাহা কেবল তথ্যসমষ্টি বলিয়াই তাহাতে একটা মহা-শূন্যবাদের হাহাকার ও নৈরাশ্য—উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম, উদ্‌ভ্রান্ত-জ্ঞান ও উদ্‌ভ্রান্ত-চরিত্র-নীতি প্রকট হইয়া উঠিবে। ইহাই অতি-আধুনিক কাব্য।

৩

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহারা কি বাহিরে কি ভিতরে—কোথায়ও সৃষ্টির তত্ত্বকে স্বীকার করে না। মানুষের অন্তরে যে একটি আদর্শ আছে, যেখানে প্রতিফলিত হইয়া বাহিরের সব-কিছু অর্থবান বা মণ্ডলাকার হইয়া উঠে—আত্মার শক্তিতে বাহিরের অনাত্মা বশীভূত হইয়া একটি অখণ্ড চিন্ময় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হয়—সে বিষয়ে ইহারা নাস্তিক। "আমরা জীবনের যাত্রা দেখব আর বলে যাব"—অর্থাৎ, ইহাদের অন্তরে কোনও সৃষ্টিক্রিয়া থাকিবে না ; ইহারা কেবল দেখিবে, বাহির নিজেকে যেমন দেখাইবে তেমনই

দেখিবে, সে দেখায় কোন অন্তরের দৃষ্টি থাকিবে না। যে-দৃষ্টিতে সর্ব্ব দ্বন্দ্ব দূর হয়—আত্ম ও অনাত্মের মহাযোগ-সাধন হওয়ায়, বিশেষ (particular) বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই এক মহা নির্ব্বিশেষের (Universal-এর) অপরোক্ষ উপলব্ধিতে সত্য-সুন্দর হইয়া উঠে—সেই কবিদৃষ্টির কোনও ধারণাই ইহাদের নাই। অতএব ইহারা কাব্য-বিদ্বেষী, ইহারা রসের ব্যাপারী নহে।

এই দৃষ্টি ইহাদের নাই বলিয়াই ইহাদের ভাষাও যেমন বস্তুগত, তেমনই ইহাদের রচনায় কাব্যের সুবলয়িত ছন্দ-সুষমারও প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ ইহাদের লেখায় ছন্দ থাকিলেই তাহা মিথ্যাচার হইত। "To see deep enough is to see musically"—সেই দৃষ্টি যেখানে নাই, সেখানে ছন্দ আসিবে কোথা হইতে? সুস্পষ্ট রূপসৃষ্টিতে ছন্দ কখনও অবান্তর হইতে পারে না। গাছের যে-ফুলটির পাপড়ি-পরিবেশ নিখুঁত মণ্ডলাকারে সুসম্পূর্ণ, সেইটির মধ্যেই তাহার পুষ্প-প্রাণ যেমন পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে, তেমনই, কবির অন্তরে কোনও রসবস্তু যদি সম্যক ধরা দিয়া থাকে তবে তাহার বাণী-সুষমা ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া নিখুঁত হইতে পারে না। তাই বলিয়া এ কথাও সত্য নয় যে, ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতা। ছন্দ শুধুই বাক্যের অলঙ্কার নহে, নির্ভুল মাত্রাবিন্যাসের ধ্বনিসৌষ্ঠবই কাব্য নয়। রস যখন বাক্যে রূপ-পরিগ্রহ করে তখন সেই রূপের অন্তরঙ্গ উপাদানরূপেই ছন্দের আবির্ভাব হয়; কবির চিত্তে যাহা একবৃন্তধৃত শতদলের মত প্রকাশিত হইয়াছে, বাক্যেও তাহা বৃন্তধৃত, অর্থাৎ ছন্দোময় হইয়া উঠে। এই জন্য গদ্য যতই কাব্য-ঘেঁসা হউক, তাহার রস কাব্যরস হইতে স্বতন্ত্র। গদ্য-কাব্য, কাব্য, ও সঙ্গীত, এই তিনের মধ্যে রসসৃষ্টির পার্থক্য আছে। গদ্যে রস থাকিলেও তাহা বাক্য-প্রধান। ভাষা-মাত্রই বস্তুবিজ্ঞানমূলক শব্দসমষ্টি। গদ্য যতই ভাবময় হউক, তাহাতে বস্তুর প্রতি পক্ষপাত আছে, তাই গদ্যকাব্যে ভাবের সুর ছন্দ-সুষমায় সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বস্তু ও ভাবের মধ্যে রসের একাত্মতাই কাব্যসৃষ্টির কারণ—ভাব ও রূপের ঐকান্তিক মিলনেই ছন্দের জন্ম হয়। আবার ভাব যখন একেবারে বস্তুবর্জ্জিত হইয়া প্রাণের অতি-সূক্ষ্ম উৎকণ্ঠারূপে অবস্থান করে, তখন তাহা ভাষাকেও ত্যাগ করিয়া সঙ্গীত-রূপ ধারণ করে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, রসের রূপসৃষ্টিহিসাবে কাব্যের স্থান সকলের উপরে।

কিন্তু ভাবোদ্দীপনার সুরময় গদ্যও নয়—যেহেতু ইহাতে রস-দৃষ্টির বালাই নাই, এবং ভাষাও সর্ব্বশ্রী-বর্জ্জিত—'রিদ্‌ম্‌'ও নয়, ছন্দও নয়,—অতএব এই সকল রচনা যে কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিবে কে? আমি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রমিত্রের গদ্য-কবিতার কথাই বলিতেছি না, তাঁহার রচনা শক্তিহীনের রচনা নয়, যদিও তাহাকে কাব্য বলিব না; আমি অতি-আধুনিক কবিদের কথাও বলিতেছি। তাঁহাদের কবিতার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ কবিতাকে একজন বিলাতী সমালোচক 'cup and saucer'-কবিতা বলিয়াছেন, বাংলায় আরও ভাল নাম দেওয়া যাইতে পারে, ইহাকে 'বিড়ি ও দেশলাই' কবিতা বলিলে ইহার স্বরূপ ও ভঙ্গি আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাষার জাতি ও গোত্র, অভিধান, ব্যাকরণ, গদ্য ও পদ্য, ছন্দ ও মিল প্রভৃতি যত দুর্দ্দৈব ছিল—তাহা আর কাব্যরচনার বাধা হইতে পারিবে না। এ কবিতার ভাষাবস্তু অতিশয় সুলভ ও সার্ব্বজনীন—একটা বিড়ি মাত্র; উদ্দীপনাও অতি সহজে হইয়া থাকে—একটা দেশলাই-কাঠির ওয়াস্তা। আগে কাব্যরস সকলে উপভোগ করিতে পারিত না, এজন্য রসিক ও বেরসিক—ভেদ ছিল। এখন, যেমন লেখকমাত্রেই কবি, তেমনই পাঠকমাত্রেই রসিক—রসের এক মহাযান-সম্প্রদায়ে সকলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আধুনিক ইউনিভার্সিটির কল্যাণে এখন যেমন সকলেই গ্র্যাজুয়েট, কাহাকেও মূর্খ বলিবার জো নাই, তেমনই আজ দেশে রসিক নয় কে? এ যুগে যে কারণে 'মর‍্যালিটি' একটা কুসংস্কার মাত্র, কাব্যরসও ঠিক সেই কারণে একটা সার্ব্বজনীন সহজিয়া-সংস্কার।

বাংলার প্রগতিবাদী সা-ত্যিক

আধুনিক যুগ সাহিত্য-রসের যুগ নহে; কেন নহে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহা লইয়া দুঃখ করিবার কারণ থাকিলেও তাহাতে লাভ নাই। দেহের পক্ষে পথ্যাভাব, এবং মনের পক্ষেও নানা কুপথ্যের প্রাচুর্য্যে, এ যুগে যে-সকল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে সাহিত্য মাথায় উঠিয়াছে,—বুকের কাছে আর টিকিয়া থাকিবার জো নাই। যাঁহারা, 'Render unto Cæser what is Cæser's due'—এই আশ্বাস-বাক্যে বাস্তবের সহিত রফা করিয়াই রসের স্বর্গরাজ্যে বাস করিবার আশা রাখেন, তাঁহারা হয়তো এখন সংখ্যায় আরও অল্প; এবং বোধ হয় সেই কারণেই, যাহারা 'শিশ্নোদর' ছাড়া আর কিছুই মানিবে না, এবং যাহাদের সংখ্যা এ যুগে ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহারা এই রসব্রহ্মের পূজারীদিগকে কেবলমাত্র ভোটের জোরে পিষিয়া শেষ করিতে চায়। সত্য কোন্ পক্ষে, ন্যায় কোন্ পক্ষে, ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে—আজিকার রাষ্ট্রনীতিতেও সে-প্রশ্নের মীমাংসা যে-ভাবে হইয়া থাকে—অর্থাৎ, একমাত্র দেখিবার বিষয় কোন্ পক্ষ সংখ্যায় বা জড়শক্তিতে প্রবল, তেমনই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিকের কথা গ্রাহ্য নয়; যাহারা সংখ্যায় অধিক সেই শিশ্নোদরপরায়ণ জনমণ্ডলী রসের যে নূতন অর্থ করিবে, তাহাই পণ্ডিত-মূর্খ রসিক-বেরসিক-নির্ব্বিশেষে সকলকে মানিয়া লইতে হইবে, এবং ব্যাস-বাল্মীকি হইতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ—বেদ-উপনিষদের ঋষি হইতে আধুনিক মন্ত্রদ্রষ্টা পর্য্যন্ত—সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া, 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্ব্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে।

যুগধর্ম্ম তাহাই বটে, এবং তজ্জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। জীবনের সহিত রসের যে আত্মিক সম্বন্ধ, তাহা এ কালে রক্ষা করা বড়ই দুরূহ; এমন কি, রসিকজনের পক্ষে যেখানে-সেখানে সেই রস নিবেদন করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। কিন্তু একটা বিষয় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; রসকে যাহারা

স্বীকার করে না, তাহার সেই ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে শিবির-সন্নিবেশ করিতে তাহারা এতই অনিচ্ছুক কেন? গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর রসিক-সমাজ যে-বস্তুকে যে-নামে ও যে-রূপে সাক্ষাৎ করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে, এবং উপভোগ করিয়াছে, তাহা যদি একালে একান্তই অচল হয়, তবে এই নূতন দেশ এবং কালের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন নামে একটা নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলে তো আর কোনও বাদ-বিসম্বাদের কারণ থাকে না। কিন্তু 'প্রগতি'র মতলব তাহা নয়,—সেই সাহিত্যেরই বুকের উপরে বসিয়া, সেই রসেরই জাত মারিয়া, আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে হইবে, নতুবা ভুঁইফোঁড় হওয়ার একটা অসুবিধা আছে। অতএব জোর গলায় ঘোষণা করা চাই যে, 'প্রগতি'ও রসের প্রগতি; রস এতদিন বদ্ধ অবস্থায় ছিল, আমরা তাহাকে 'every aspect of life' জুড়িয়া—অর্থাৎ নালা-নর্দ্দমা পর্য্যন্ত—মুক্ত-ধারায় বহাইয়া দিয়াছি। যাহারা অতীতকালের অপ্রগতি-জনিত মধুদুগ্ধ-পিপাসাকেই রসপিপাসা বলিয়া মনে করে, তাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে নাই—চা খাইতে শেখে নাই। আড়াই হাজার বৎসরেও মানুষের যে যৌবনলাভ ঘটে নাই, বিংশশতাব্দীর একপাদ পূর্ণ না হইতেই সেই যৌবন উপস্থিত হইয়াছে; এত যুগ, এত জাতি, ও এত বিভিন্ন ভঙ্গির কাব্যসাহিত্যে যে-রসের শাশ্বত ভিত্তি টলে নাই, আজ সহসা তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে। যদি ফুরাইয়াই থাকে, তবে তাহা লইয়া এত লাফালাফি কেন?

পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে স্থির হইয়া নাই, এই প্রগতিতত্ত্ব তো বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হইয়াছে। স্থির-পরিণাম অপেক্ষা গতিই যে শ্রেষ্ঠতর, রূপের জড়-সমাপ্তি অপেক্ষা ভাবের অনিয়ত চিৎ-প্রেরণাই যে মহত্তর,—এইরূপ চিন্তা, বা দার্শনিক মতবাদ তো বহুকাল প্রচলিত আছে। তথাপি এইরূপ মতবাদ সত্ত্বেও সেই প্রাচীন রসবাদ কাব্যে ও কলা-শিল্পে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চিরদিন সকল-নিয়মের উর্দ্ধে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আধুনিক প্রগতিবাদীর দল এমন কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এমন কোন্ অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান দিয়াছে, যাহার ফলে মানুষের আত্মা একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইবে?

আসল কথা, এই 'প্রগতি'র ধ্বজাধারিগণ এতদিন এই ভূমগুলেই অন্য নামে

পরিচিত ছিলেন; বিদগ্ধ রসিক-সমাজও যেমন সকল দেশে সকল কালেই ছিল ও আছে, এই পণ্ডিতম্মন্য অসভ্য বর্ব্বরেরাও তেমনই সকল যুগে সকল সমাজে বিদ্যমান ছিল। আজ যুগধর্ম্মের সুযোগে—মানব-সভ্যতার এই অতিশয় সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে, ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল সুরু করিয়াছে। যাহাদের রসবোধের অভাব জন্মগত, রস কি বস্তু সেই চৈতন্যই যাহাদের নাই, তাহারাই আজ রসের অধিকার দাবি করিয়া সাহিত্যিক হইতে চায়। ইহারাই রস-ব্রহ্মের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া আপনাদের শূদ্রতারই জয় ঘোষণা করিতেছে। কাল তাহাদের অনুকূল; আজ দিকে দিকে মানবাত্মার দুর্গতি, মানবজাতির সুদীর্ঘ সাধনার পরম ধনের অপচয়, যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাহারই ধূলিধূসর পরিণাম—জ্ঞানী ভক্ত ও রসিকের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে; এ হেন সময়ে, যাহারা পৃথিবীর ব্রাহ্মণ-সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই ইতর মানুষেরা মহাসুযোগ লাভ করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

২

'প্রগতি' শব্দটির যাহা অর্থ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজিতে 'progress' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শব্দের মোহ ও মাহাত্ম্য কম নয়, তাই এই বিশেষ শব্দটিকেই আশ্রয় করিয়া ক্রমশ ইহার অর্থগত বিদেশী ভাব আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের বড় কাজে লাগিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা নিখিল-ভারতীয় প্রগতি-কোম্পানির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাদের এই উপবঙ্গীয় প্রগতিবাদকে বঙ্গবাসীর চক্ষে—প্রীতিপ্রদ না হউক—ভীতিপ্রদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সাহিত্যে প্রগতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রে, সমাজে এবং জাতির জীবনঘটিত নানা সমস্যায় প্রগতিতত্ত্বের অবকাশ আছে; এবং সেই সকল ব্যাপারে তাহার আলোচনা ও প্রচারমূলক গ্রন্থরাজিকে প্রগতিবাদী সাহিত্য বলিতে কাহারও আপত্তি নাই; কারণ, ইংরাজিতেও 'literature' শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়,—ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণও 'literature' আখ্যা পাইয়া থাকে। কিন্তু সাহিত্যের নামেই এই যে প্রগতির

দাবী, ইহা সত্যকার সাহিত্যকেই অস্বীকার করা—ইহার মূলে আছে রসের বিরুদ্ধে বেরসিকের আক্রোশ। এই প্রগতিবাদ হইতে সাহিত্যের আদর্শকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য, ইদানীন্তন কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যাচার্য্যগণ কাব্যরসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। যাহারা এইরূপ প্রগতিবাদী তাহাদের সহিত সাহিত্যের কোনও সম্পর্কই নাই, বরং সম্পর্ক অস্বীকার করাই উভয় পক্ষে মঙ্গলকর। ওদেশে সে চেষ্টা যথেষ্টই হইতেছে; আমাদের দেশে এ কাজ করিবার কেহ নাই, তাই অপর পক্ষের অনাচার এত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রগতিবাদীর দল সাহিত্যের অর্থান্তর করিতে চায়, কিন্তু নামান্তর করিতে রাজি নহে। জীবনকে ইহারা যন্ত্ররূপেই ভাবনা করে; যন্ত্রের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন আছে,—নূতন অংশের যোজনা ও পুরাতন অঙ্গসংস্কার অবশ্যম্ভাবী। এবং যেহেতু যন্ত্রের ক্রিয়াও তদনুরূপ হইতে বাধ্য, অতএব সে বিষয়ে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না,—সাহিত্যও যে সেই জীবন-যন্ত্রেরই একটা ক্রিয়াবিশেষ! মানব-সমাজের গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জীবন-যন্ত্রও জটিলতর হইতেছে, সেই জটিলতাই তাহার গৌরব। অভাব যতই বাড়িতেছে, ততই যন্ত্রও চক্রবহুল হইয়া উঠিতেছে; এই সকল চক্রের মিলিত ঘর্ঘরধ্বনি চক্রবৃদ্ধির হারে কালক্রমে বিশালতর হইতেছে; সাহিত্যও তাই চক্রমুখরতায় পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর ঘোরনাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহাই সাহিত্যের প্রগতি, এই নাদের উগ্রতাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ! সাহিত্যও সৃষ্টিধর্ম্মী নয়, যন্ত্রধর্ম্মী; ইহাতে কেবল যুগের গতিধর্ম্মই আছে, কোনও শাশ্বত আদি-অন্তের স্থিতিধর্ম্ম নাই। আমাদের দেশের প্রগতিবাদী যাঁহারা, তাঁহাদের মত এতখানি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ, সেই মত কোন মূলতত্ত্বের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি যে-তত্ত্বকে তাহারা অতিশয় স্থূলভ বিদ্যায় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া, আপনাদের রিপুবিশেষকে চরিতার্থ করিতেছে, তাহার মূলে এইরূপ ধারণাই আছে। সাহিত্য সৃষ্টিধর্ম্মী অর্থাৎ প্রাণধর্ম্মী,—তাহা যে যন্ত্রধর্ম্মী নয়, তাহার প্রমাণ, কোনও উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বাতিল হইয়া যায় নাই; বাতিল হওয়া দূরের কথা, সেই কাব্যের অন্তর্নিহিত রসরূপ কালে কালে নবনবোন্মেষিত হইয়া উঠে, সে রসের বিকাশধারার শেষ নাই। এই বিকাশ আর ঐ যান্ত্রিক বিবর্ত্তন এক নয়; যাহা একবার সত্যকার সৃষ্টিপদবী লাভ করিয়াছে,

রসের জগতে তাহার আর মৃত্যু নাই, মৃত্যুনির্জ্জিত মানুষও তাহার প্রসাদে অমর হইয়া উঠে। অতএব সাহিত্যের প্রগতি বলিতে যদি ইহাই বুঝিতে হয় যে, এককালের সাহিত্য অন্যকালে অচল,—যাহা অগ্রবর্ত্তী তাহাই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তবে তাহা প্রগতি হইতে পারে, কিন্তু কদাপি সাহিত্য নহে। যতই প্রাচীন হউক, কোন কাব্য যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, সে সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ কবি-রসিকের এই উক্তি রসিকসমাজকে আশ্বস্ত করিবে—

All high poetry is infinite, it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after veil may be withdrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight ; and after one person and one age has exhausted its divine effluence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and an unconceived delight.

—কিন্তু প্রগতিবাদীরা, বিশেষত আমাদের দেশের ইহারা একথা স্বীকার করিবেন না ; তাহার কারণ, তাঁহাদের যে সাহিত্য তাহাতে poetry-র বালাই নাই —'high poetry' আবার কি ? ওদেশের নব্যসম্প্রদায় এ সকল কথা নিত্য শুনিতেছে, এবং শুনিয়া তাহার পাল্‌টা জবাব দিতে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিতেছে ; কারণ, তাহারা আমাদের এই ধনুর্দ্ধরদের মত এতটা নিরঙ্কুশ নহে। তাই যখন তাহারা শোনে—

I quite freely admit, that to a man hesitating between socialism and anarchy, or between polygamy and eugenics, or between overhead and underground connexions for tramways, *The Tempest* or *Macbeth* would have very little to say of any profit.

—তখন তাহারা বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যও চুপ করিয়া থাকে।

৩

...

আমাদের প্রগতিওয়ালারা সেদিন সভা করিয়া, যে ভাষায় ও যে অর্থে, সাহিত্যের সদ্‌গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে ওদেশের গুরুভাইয়েরা লজ্জা পাইত, সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের দিন যে গত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাঁহাদের দিন আসিয়াছে, ইহা কি আর কাহাকেও ডাকিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে ? সেই জন্যই তো দেশে যে কয়জন ভদ্র সাধু সজ্জন অবশিষ্ট আছে, তাহারা ঘটি-বাটি

সামলাইতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে যেমন ক্রমাগতই মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ এবং অধিকতর দুঃসাহসী বিপ্লববাদী ব্যক্তিসংঘের মন্ত্রিপদলাভ রাজনৈতিক প্রগতির লক্ষণ, তেমনই, রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ সাহিত্যনায়কগণের পরাজয়, ও এইরূপ ধ্বজাধারীদের অভ্যুদয় সাহিত্যিক প্রগতির অকাট্য প্রমাণ। তুলনাটা আদৌ অসঙ্গত নয়; এই সকল বাহ্বাস্ফোটসম্বল বীরগণ, আর কোনও ক্ষেত্রে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অগত্যা বাংলাদেশের নির্ব্বিকার ও নির্জ্জীব সাহিত্যসমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য হাঁকডাক করিতেছেন। উপরে উদ্ধৃত উক্তির সেই 'profit'ই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য, সাহিত্যের দোহাই দিয়া কিছু profit করিয়া লইবার জন্যই ইহারা এই অপেক্ষাকৃত নরম মাটিতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করিয়াছেন। সাহিত্যহিসাবেই সাহিত্যের ভাবনা করিতে ইহারা অক্ষম; কিন্তু সাহিত্য যাঁহাদের ধর্ম্ম ও সাধনার ধন, তাঁহাদের একজন এই ম্লেচ্ছদের সম্বন্ধে বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

It is an awful truth, that there neither is, nor can be, any genuine enjoyment of poetry among nineteen out of twenty of those persons who live or wish to live, in the broad light of the world—among those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society. This is a truth and an awful one, because to be incapable of a feeling of poetry, in my sense of the word, is to be without love of human nature and reverence of God.

—ইহাই উদ্ধৃত করিয়া অপর এক মনীষী বলিতেছেন—"That is an emphatic answer"।

কিন্তু শুনিবে কে? 'Love of human nature' এবং 'reverence of God'—মানবপ্রীতি ও ভগবদ্ভক্তিকে—যে কাব্যরস-রসিকতার ভিত্তি বলিয়া একজন ঋষিকবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক প্রগতির ধাপ্পাবাজি যাহাদের রসিকতার চরম পরিণাম, তাহাদের অভিধানে সেই প্রেম-ভক্তির বিন্দুবিসর্গও নাই। Human nature বা humanity বলিতে ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্র, আত্মগত অভিমান, বা অহংচর্চ্চা, এবং শিশ্নোদরসাধন বুদ্ধিবৃত্তিই বোঝে। যত বড় বড় কথা তাহারা বলুক, এবং যত বড় পাণ্ডিত্য ও পৌরুষই তাহাতে থাকুক, মূল বক্তব্য সেই একই; অর্থাৎ, আমরা যাহা-খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব; এই যাহা খুশিকে 'আহা-মরি' করাইতে না পারিয়াই তাহারা রাগিয়া

কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছে। নিজেদের নিদারুণ অক্ষমতা ও অহং[illegible] [illegible] গৌরবান্বিত করিতে হইবে ; তাই, [illegible] যুগ আর নাই—ইহাই চীৎকার করিয়া বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মত আক্ষেপ করিতেছে, আমাদের লেখা কেহ পড়িতেছে না! ইহাতে যেমন অকালপক্কের [illegible] আছে, তেমনই একপ্রকার করুণরসের নাকি-কান্নাও আছে। কিন্তু বিকাল-পক্ক প্রবীণ যিনি, যাঁহার পাণ্ডিত্য-দম্ভের সীমা নাই, তাঁহার আস্ফালন কৃত্তিবাসী অঙ্গদ-রায়বারকেও লজ্জা দিয়াছে, তাঁহার বাণীতে সত্যকার বীরত্ব আছে—

Croakers are not wanting to tell you—with sighing glances fixed on the past these men would tell you...

—এই 'tell you' যে কি, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ এই প্রবন্ধই তো তাহাই—কত বড় croakers আমরা! কিন্তু—

To these gloomy judgments I take the liberty respectfully to demur, and I claim that despite the wailings of these defeatists...the literature produced by lesser personalities today, is neither lacking in art, nor in any of the qualities that make high class literature. This literature, I claim, can, as pure works of art, hold its own against any literature in the rest of India, and perhaps of the world outside.

সেই দামু আর চামু! বাংলা-সাহিত্যে ইহারা আর মরিল না, অমর হইয়াই রহিল! কি ওজস্বিনী ভাষা, রসনার কি দিগন্তবিসর্পী লেলিহতা! "I claim" —অবশ্যই! সেইটাই যে আসল কথা ; কারণ, বাংলার এই প্রগতি-সাহিত্যের অনেকখানিই তিনি যে নিজের অংশে দাবি করেন! "High class literature" "pure works of art"—এ সব যে তাঁহার নিজেরই কীর্তির জয়গান! এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের তাহাদেরই সম্বন্ধে ঋষি-কবির সেই উক্তি স্মরণ করিতে হইবে —"those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society"। ইহারা যে কস্মিন্‌কালে কোন জন্মে সাহিত্যরসের ধার ধারে না, ইহাদের রচিত সাহিত্য পড়িলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? পণ্ডিত হইয়াও এমন অপণ্ডিতের মত কথা বলে, ইহার কারণ কি? কারণ—যে দেশ ও যে সমাজ হইতে ইহারা সাহিত্যিক অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, সে সমাজে রসবোধের বালাই বা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা কোনকালেই ছিল না ; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই উক্তি যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত

নয়, তাহা যে অতিশয় সত্য, আজ এই প্রগতি-সম্প্রদায়ের মনোভাব ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না।

বাংলাদেশের প্রগতি-সাহিত্যের এই নেতা সাহিত্যের উপরে প্রগতির শাসন প্রচার করিয়াছেন এই বলিয়া যে—

No writing deserves the name of literature unless it marks some progress beyond the literature of the past.

The name of literature! ইংরেজীর জোর কম নয়! Name of literature-এর সংজ্ঞা দিন দিন যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমরা তো ইহাই বুঝি যে, যে-কোনও writing—এমন কি কবিরাজী মোদকগুলির বিজ্ঞাপনও—literature-নামের দাবি করিতে পারে। তাহাই যদি না হইবে, তবে এই সিনিয়র প্রগতি-মহাশয় সাহিত্যের বিধানদাতা হইলেন কি করিয়া? সে কোন্ সাহিত্য? সেকালের কথা ছাড়িয়া দিই,—একালে পৃথিবীর সাহিত্যিক সমাজে যাঁহারা সাহিত্যরস ও তাহার তত্ত্ব-আলোচনায় নিখিল রসিকসমাজকে বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছেন, তাঁহাদেরও কেহ সাহিত্যের এমন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই; সেই জন্যই কি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত, ও পরিশেষে ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের এই বাঙালী সাহিত্য-বীর সাহিত্য সম্বন্ধে এত বড় একটা সত্য 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য' এমনভাবে ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন? রসজ্ঞান না হয় নাই থাকিল—সকলের তাহা থাকে না; কিন্তু এমন বুদ্ধিনাশ হইবার কারণ কি? সাহিত্য পড়িতে পড়িতে বুড়া হইয়া গেলাম; এত কবি, এত ক্রিটিক, এত মনীষী —প্রাচীন ও আধুনিক এত পণ্ডিতের এত কথাই শুনিলাম, কিন্তু এমন মগজভেদী উক্তি আর কোথায়ও শুনি নাই! হোমার-শেক্সপীয়রকে লইয়া এখনও যাহারা খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির গবেষণা করে, ব্যাস-বাল্মীকির মধ্যে এখনও যাহারা কাব্যরসের অন্ত পাইল না—তাহারা তো এই "some progress beyond the literature of the past"-এর কথা কখনও ভাবিল না! সাহিত্যের রসটাই বড় কথা নয়, বড় কথা ওই 'progress'? প্রগতি—প্রগতি—প্রগতি! Progressive literature-বাক্যটিও একটি tautology! কোন সাহিত্যই সাহিত্যপদবাচ্য নয়, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই; অন্তার্থ—সাহিত্য ক্রমাগতই সাবালক হইতেছে; তারিখ যতই আগাইয়া যাইতেছে, ততই তাহা

সেয়ানা হইয়া উঠিতেছে; অতএব যতই আধুনিক হইতেছে, ততই তাহার দাবি বাড়িতেছে,—পূর্ব্বের বইগুলিকে পিজরাপোলে অর্থাৎ মিউজিয়মে রাখিয়া দিতে হইবে! এই নব-অভিনবগুপ্তের মাপকাঠিতে আজিকার সাহিত্য আগামী-কল্যের সাহিত্যের কাছে হাত-পা ভাঙিয়া পড়িয়া থাকিবে,—কেন না progress চাই; সাহিত্যরস, ও রামা-শ্যামার দল-বাঁধিয়া 'হাম-বড়ামি'র হল্লোড়—এই দুইই যে এক পদার্থ! প্রগতি অর্থাৎ আপনাদের কীর্ত্তির কৃতিত্ব ঘোষণার জন্য পূর্ব্বযুগের সকল কবি-মহাকবিকে হটাইয়া দিতে হইবে,—যাহারা কবিকুলপুঙ্গব তাহারা এই মূষিকের দলকে প্রণাম করিবে! তার কারণ—

By a long course of evolution we have reached an ampler synthesis which embraces equal freedom for all and freedom in every aspect of life; and social organisations till yesterday were striving to achieve this freedom in as full measure as possible.

—অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্য শ্রেষ্ঠ না হইবে কেন? এ যে কোন্ রসের সাহিত্য তাহা ওই 'every aspect of life' এবং 'social organisations' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ আর কিছুই নয়—সেই শিশ্নোদরসমস্যারই কথা; সেই জন্য আর সকল সাহিত্য বাতিল হইয়া গিয়াছে। Freedom in every aspect of life—ইহাই যে আধুনিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র! আমরাও তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, কেবল ইহাই বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই মন্ত্রটির সাধনার জন্য একটা নূতন পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিলেই তো ভাল হইত—পূর্ব্ববর্ত্তীদের সেই আসনটির উপরেই এত লোভ কেন? এই সাহিত্য-নামটাকেও বর্জ্জন করিয়া একটা নূতন নামে এই 'brave new world'-এর পত্তন করিলে তো আর কোনও হাঙ্গামা হইত না। কিন্তু তাহা যে ইহাদের মনঃপূত নয় তার কারণ—সাহিত্য-নামটার একটা বনিয়াদী প্রতিপত্তি আছে, অসাহিত্যিক হইয়াও সেই প্রতিপত্তিটুকু চাই। শূদ্রের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের কারণও তাহাই—যাহাকে বলে দারুণ inferiority complex; ব্রাহ্মণত্বের প্রতি সভয় শ্রদ্ধা আছে, লোভও কম নয়; কিন্তু তাহা যে হইবার উপায় নাই, জন্মক্ষণেই বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন—তাই এত আক্রোশ, এত চীৎকার।

এই আক্রোশের বশেই ছোট প্রগতি-মহাশয় এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে চান যে, রবীন্দ্রনাথের দিন গিয়াছে এবং রবীন্দ্রোত্তর কবি-সাহিত্যিকগণ গড্ডলিকাবৃত্তি

করিয়া সেই মৃতযুগের মৃতভার বহন করিতেছেন। এ আশ্বাস যে চাই-ই, নতুবা বাঁচে কেমন করিয়া? কিন্তু ইহাতেও একটু গোল রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা কেবলমাত্র অনুকরণ করিয়াই বাঁচিতে চায়, তাহাদের কথা বলি না, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে রসের যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা যে সর্ব্বযুগের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথও যে গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়াছেন! তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথও কখনও বাঁচিয়া থাকেন নাই! খাঁটি প্রগতিতত্ত্ব অনুসারে রবীন্দ্রযুগও একটা পৃথক যুগ নয়, যেহেতু তাহাও পূর্ব্বতন যুগের মূলপ্রেরণাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে নাই, সেও মৃত-যুগের ভার বহন করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, ইহারা সাহিত্যকেই চায় না, চায়—যাহা খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব; এবং যে-সমাজ তাহাতে আপত্তি করিবে, তাহাকে decadent, vicious ও putrescent বলিয়া গালি দিব।

৪

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদলের মতি-গতি ও অভিপ্রায় সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম; ইহাদের কথার জবাব দিবার চেষ্টা অনর্থক। তার কারণ,—প্রথমত, যাহারা সাহিত্য বোঝে না, এবং বিশ্বাসও করে না; আত্মপ্রতিষ্ঠাই যাহাদের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহারা কোনও জবাব মানিবে না; দ্বিতীয়ত, যে দেশ হইতে এইরূপ সাহিত্যতত্ত্বের আমদানী হইয়াছে এবং এখানকার জলমাটির গুণে তাহার এমন বৈজ্ঞানিক ভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে—সেই দেশে বিবলতাও যেমন জন্মিয়াছে, তেমনই বিষম ভেষজের অভাব ঘটে নাই। সেখানে আচার্য্যকল্প সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যবস্তুর যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শোনা যাইতেছে, ইংরাজী-অভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ব্বে যে কয়টি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন ব্যক্তির; পরে আরও কিছু উদ্ধৃত করিব, তাহা হইতে অন্তত এইটুকু সপ্রমাণ হইবে যে, প্রকৃত সাহিত্য-জ্ঞান এখনও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই। একালেও সভ্যতম সমাজের শিক্ষিততম ব্যক্তিরা সাহিত্যের প্রসঙ্গে অসাহিত্যিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেছেন না। সমাজে চোর যেমন আপনা হইতেই চোরের দলে আকৃষ্ট হয়—সাধু সাধুর দলে, তেমনই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিক রসিকের

দলে, এবং বেরসিক বেরসিকের দলে মিশিয়া থাকে। অতএব দল গড়িলেই কোন-কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না; বরং, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নানাস্থানে শাখা স্থাপন করিয়া একটা নিখিল রকমের ভুতু দল গড়িয়া তুলিলেই বুঝিতে হইবে, উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। এই সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক বীরকে আকাশে তুলিয়া সংবাদপত্রে পত্রপ্রেরকদিগের যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অনুপাতে কাল্‌চার বড়ই কমিয়া গিয়াছে—সাহিত্যরসবোধ দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই যশ এত সুলভ হইয়াছে।

বাংলার প্রগতি-সাহিত্য যে-প্রগতির পরিচয় কিছুকাল যাবৎ দিয়া আসিতেছে, এতদিনে তাহা কোনও সুস্থ ও সহৃদয় ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই সাহিত্য অতিশয় আধুনিক হইলেও ইহার লক্ষণ নূতন নহে, এবং ইহার সম্ভাবনা কোনও কালেরই অগোচর ছিল না; তাহার প্রমাণ—১৩১৩ সালে, প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকার উৎপাদন করে, যাহাতে ছোটই বড় হইয়া উঠে, বড়ই ছোট হইয়া যায়; যাহাই ক্ষণকালের তাহাই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে, তাহাকে আমরা এমনিই অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্র সূর্য্য তারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।"

—পড়িয়া মনে হয় নাকি যে, এ যেন এই প্রগতি-সাহিত্যের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের একটি অতি আধুনিক উক্তি? এই যে freedom-এর অভিযান—সাহিত্যে এই দলবদ্ধ আস্ফালনই বিধাতার সৃষ্টির বিরুদ্ধে আধুনিক মানুষের চীৎকার। আমি এই সাহিত্যকে শিশ্নোদরসর্ব্বস্ব বলিয়াছি—বাক্যটি অশ্লীল হইলেও, অর্থটি সত্য অতএব সাধু। সেকালের সত্যদর্শী ঋষিগণ আধুনিক প্রগতিবাদের অর্থ বুঝিতেন—পৃথিবীময় আজ যে মানুষের দল "freedom in every aspect of life" বলিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সেই ব্যাধির নিদান এক কথায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা ঐ অতিশপ্ত সারাকাটি

সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব আমাদেরও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ঋষি নহেন, তিনি কবি; তাই তিনি অতখানি নগ্নতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারও বক্তব্য সেই একই,—অতিশয় ভদ্রভাবে তিনি বলিয়াছেন, "যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়।" প্রগতি-সাহিত্য হইতেই ইহার উদাহরণ দিব। বাংলা কাব্যে প্রেমের কবিতা প্রায় নাই বলিলেই হয়—অত বড় ইংরেজী সাহিত্যেও তেমন প্রেমের কবিতা ঝুড়ি ঝুড়ি নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্য মহাপণ্ডিত ও মহাসাহিত্যিক ছোট প্রগতি-মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন—

"যৌন-অভিজ্ঞতা জীবনে বেশির ভাগ মানুষেরই হয়, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কবিদের মধ্যেই বা ক'জন বর্ণনা করতে পেরেছেন?···ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হ'ত তা'হলে যে-কোনো মানুষই কি অল্প নৈপুণ্যের দ্বারা তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারতো না?"

এই জন্যই প্রেমের কবিতা বাংলায়, এমন কি ইংরেজীতেও—এত দুর্লভ! যৌন অভিজ্ঞতাই প্রেমের যে গভীরতম উপলব্ধির মূল, এবং তাহার যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতায় নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হওয়া চাই,—তাহা পশুর মতই মানুষের পক্ষেও অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া, তেমন কবিতা লেখা বড়ই দুরূহ। সে যে কত দুরূহ, তাহা বুঝে না বলিয়াই সাধারণ মানুষেরা এইরূপ কবিতার কবিকে ন্যায্য সম্মান দান করিতে চাহে না। এইরূপ সার্থক রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক এই লাইন কয়টি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "এ রকম পংক্তি জগতে খুব বেশি লেখা হয় না"—

The moment of desire! the moment of desire!—the virgin that pines for the man who shall awaken her womb to enormous joys in the secret shadows of her chamber.

হায় বাল্মীকি, হায় কালিদাস! হায় শেক্সপীয়র, হায় রবীন্দ্রনাথ! বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী তো গোল্লায় গিয়াছে। কারণ, এমন রজকিনী পাইয়াও দ্বিজ-কবি শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার মশলাগুলি কবিতার রসে মিশাইতে পারেন নাই! আমার 'শিশ্নোদরপরায়ণ' কথাটা কি মিথ্যা? না, রবীন্দ্রনাথ ভুল বুঝিয়াছেন?—"যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া

গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্র সূর্য্য তারাকেও সে ম্লান করিয়া দেয়।”

এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের, তাহারাই যদি সাহিত্যিক হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ কি হইবে, তাহা তো জানাই আছে। একজন ইংরেজ সমালোচক আধুনিক সাহিত্যিকদিগকে একটি নাম দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে নাম অবশ্য তাহারা গৌরবের সহিত বহন করিবে; কারণ, কিছুতেই তাহাদের গৌরবহানি হয় না। এই লেখক বলিতেছেন—

If we fasten then, one label on these books, on which is one word 'materialists,' we mean by it that they write of unimportant things; that they spend immense skill and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring.

শেষের বাক্যটি যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথেরই অনুবাদ! লেখক ইহাদিগকে নাম দিয়াছেন—materialists, অর্থাৎ জড়বাদী; এবং কি অর্থে, তাহাও বুঝাইয়া বলিয়াছেন। সে দেশের আধুনিকদের সম্বন্ধে ইহাই হয়তো যথার্থ; কিন্তু আমাদের এই প্রগতির দল জড়বাদীও নহে—জড়েরও যে ধর্ম্ম আছে, ইহাদের তাহাও নাই; কারণ, জড়েরও প্রকৃতি-গুণ আছে, ইহারা সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। ইহাদের এই যে অনাচার, এই যে অসত্যের আরাধনা, ইহাতে 'immense skill and immense industry'-র প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাহার সাড়ে-পনেরো আনাই অনুকরণ; ইহাদের জীবধর্ম্মই স্তিমিত, জড়ধর্ম্ম বরং ভাল ছিল।

উপরি-উক্ত সমালোচকের আর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আমাদের এই 'শিষ্য-বিদ্যা—গরিয়সী' প্রগতি-প্রতিভার যাঁহারা গুরু সেই ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের বিখ্যাত কয়েকজনের নাম করিয়া, তাঁহাদের তথাকথিত বাস্তবতার অজুহাত সম্বন্ধে, এই লেখকই বলিতেছেন—

... Let us hazard the opinion that for us at the moment the form of fiction most in vogue more often misses than secures the thing we seek. Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing has moved off...we suspect a momentary doubt, a spasm of rebellion, as the pages fill themselves in the customary way. Is life like this? Must novels be like this?

পরিশেষে আর এক আধুনিক মনীষীর একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাহারা অন্তরে ধর্ম্মহীন, আধুনিক যুগের অহংমদমত্ততায়

যাহারা প্রাণের ধৈর্য্য হারাইয়াছে, যাহারা মৃত্যুকেই মোক্ষ জানিয়া চিরকালের উপর ক্ষণকালকে আসন দিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে, যাহারা বিকৃত দেহ-মনের স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যকেই প্রজ্ঞা ও প্রতিভার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারাই প্রগতির ধুয়া তুলিয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিতেছে। যে-ধরণের প্রগতিবাদের দম্ভ ইহারা করিয়া থাকে তাহাতে তত্ত্বগত প্রগতিও নাই—কারণ, কালের প্রবাহমানতাকেই ইহারা কার্য্যত অস্বীকার করে। নিজের আত্মাভিমানের অনুকূল করিয়া ইহারা কালকে বিচ্ছিন্ন বর্ষসমষ্টিরূপে ধারণা করে,—এক একটি বর্ষসমষ্টি আপনাতেই সমাপ্ত; যেন কালের কোন সুনিয়ত প্রবাহ নাই, তাহার প্রত্যেক অংশই এক একটি স্বতন্ত্র ঘূর্ণি। অতীত নাই, ভবিষ্যৎও ভাবনার বহির্ভূত; প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই—আছে কেবল স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য ও পাশব-স্বার্থের অসংউত্তেজনা। ইহাদের মনস্তত্ত্বে রসতত্ত্বের স্থান নাই—থাকিতে পারে না; তাই ইহারা কাব্যরসের চিরনির্ঝরকে বিদ্রূপ করে, মানুষের জীবনে যে বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, যাহার অভাবে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহাকে ইহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। তাই, যাঁহারা যুগে যুগে মানুষের অধ্যাত্ম-জীবন পুষ্ট করিয়া, সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া, মানুষকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন, সেই অমৃত-সমাজ কবিগণের চিরনবীনতাময়ী বাণীকে ইহারা অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপ বলিয়া মনে করে। তাহার কারণ, ইহারা জড়বাদী নাস্তিক, প্রেমহীন ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু যাহাদের আত্মা এখনও সুস্থ আছে, যাঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে সমান বলীয়ান,—কবিত্বের অমৃত-হ্রদে অবগাহন করিয়া যাঁহাদের কান্তি উজ্জ্বল ও শান্তি সুস্নিগ্ধ হইয়া উঠে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এমনই একজন জগতের মহাকবিদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

To men such as these the debt of humanity is inestimable. They, above all others, keep the souls of men alive; they do not tell us of spiritual felicity; they create it in us from the substance of our coarser elements...Not that Shakespeare was a Christian, any more than the poet is a mystic—but he was religious, as all great poets must be. For high poetry and high religion are at one in the essential that they demand that a man shall not merely think thoughts, but feel them—that this highest mental act be done with all his heart and with all his mind and with all his soul.

আমাদের যুগন্ধর সাহিত্যিকদিগের যে সকল উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি,

তাহার সহিত এই উক্তি তুলনা করিলে, যাহারা মানুষ, পশু নয়—তাহারা কি বুঝিতে পারে না, কোন্ উক্তিটির মধ্যে, কাহার কণ্ঠস্বরে, মানুষের সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব বৃহত্তর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে? মনে হয়, জাতিতে জাতিতে যেমন, মানুষে মানুষেও তেমনই কত তফাৎ! নহিলে আমাদের দেশে, এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক-সমাজে, এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিতে পাইলাম না কেন? প্রগতি তো সে দেশেও আছে।

দুঃখের স্বরূপ

সমাজে দুর্ব্বল দুঃস্থ অসহায়ের সংখ্যা কোনকালেই কম নয়। কিন্তু কোনকালেই এইরূপ দারিদ্র্য বা দৈহিক দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। প্রেমিক যথাসাধ্য পরোপকার করেন, কিন্তু 'কর্ম্মদোষাৎ দরিদ্রতা' বা 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—বলিয়া জ্ঞানী সে আশা ছাড়িয়া দেন। এইরূপ দুঃখকে মানুষ কৃপার চক্ষেই দেখে, ইহাকেই সত্য বা মহান্ বলিয়া মনে করিতে পারে না। এইরূপ দুর্ব্বল দুঃস্থ জনগণের সেবা করিয়া সক্ষম সুস্থ ব্যক্তির মনুষ্যত্ব-বিকাশের সুবিধা হয়—সমাজের দিক্ দিয়া ইহাই এইরূপ দুঃখের একমাত্র সার্থকতা।

যাঁহারা ভাবুক ও চিন্তাশীল, মনুষ্য-চরিত্র এবং মনুষ্য-ভাগ্যের সত্যনির্ণয় করিতে যাঁহারা উৎসুক—তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুঃখের নিদান অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা জানেন, কেহ কাহারও সত্যকার দুঃখের মূলোৎপাটন করিতে পারে না। মানুষের দুঃখের মূল বহুদূর-প্রসারী, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ মানুষের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। হিন্দু তাহাকে অতি সংক্ষেপে 'কর্ম্মফল' বলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন—'Character is Fate'। কথাটা গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে প্রতীতি হইবে যে, ব্যষ্টি বা সমষ্টি—যে ভাবেই ধরা হউক, দুঃখের জন্য দুঃখী নিজেই দায়ী, দুঃখ মানুষের গৌরবের নয়—কলঙ্কের কথা। যে শক্তিহীন সেই দুঃখী। ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাকে পাপ বলে তাহার মূলেও এই শক্তিহীনতা। পথিপার্শ্বে কোন কুষ্ঠরোগীকে দেখিলে সুস্থ মানুষের মনে যেমন বিভীষিকা উপস্থিত হয়—কৃপার উদ্রেক যতই হউক, তেমনই,নিরতিশয় দারিদ্র্য দেখিলে মানুষের মনে একটা প্রবল কুণ্ঠার উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। যে-প্রেমিক এই দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হ'ন, তাঁহার অন্তরে একটা কঠিন বীর্য্য ও পৌরুষের প্রয়োজন আছে; দয়ায় অভিভূত হইয়া কেবল ক্রন্দন করিলেই হয় না, তাহাতে নিজেও দয়ার পাত্র হইতে হয়। যেখানে এই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টায় পৌরুষ ও বীর্য্যের পরিচয় পাই সেইখানেই আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করি, দুঃস্থের দুঃখকে প্রণাম করি না।

এই দারিদ্র্য-দুঃখকে দুঃখহিসাবেই মহিমান্বিত করিবার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহাতে চিন্তাশক্তির দারিদ্র্যই প্রকাশ পায়। সকল মানবীয় দুঃখের কারণই অভাব—কামনার অপরিতৃপ্তি। এই কামনার জন্য মানুষ দায়ী নয়, কারণ কামনা স্বভাবজ। কিন্তু কামনার পরিতৃপ্তির অভাবে, অর্থাৎ সুখের লালসায়, মানুষ যে পাপ করে—সে-পাপ সমর্থন-যোগ্য, তাহা ভগবানের পাপ—'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী ভগবান কাঁদিতেছেন'—ইত্যাকার উক্তি মিথ্যা বলিয়াই কুৎসিত। মানুষের মধ্যে যেখানে শক্তি দেখি সেখানেই ভগবানকে দেখি। আত্মজ্ঞানের চিদ্-রূপী ভগবান হয়ত আছেন, কিন্তু তাহা ব্যবহারিক সত্য নয়—সে জ্ঞানের তুরীয় অবস্থার কথা। যে শক্তিকে ভগবানের বিভূতি বলিয়া মনে করিতে পারি—সে শক্তি ক্ষুধার শক্তি নয়, সেই ক্ষুধাকে জয় করিবার জন্য মানুষ যখন অসাধ্য-সাধন করে, তখনই বুঝি তাহার মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন। মানুষ-ভগবান ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, দুই উপায়ে—হয় ক্ষুধাকে নষ্ট করিয়া, নয় মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিয়া ক্ষুধার খাদ্য আহরণ করিয়া। এই ক্ষুধার তাড়নায় অক্ষম অসহায় জীব যখন শৃগাল কুক্কুরের মত অমেধ্য-ভোজন করে—উপুড় হইয়া নর্দ্দমার পঙ্ক-জল পান করে, তখন সেই ক্ষুধার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে মানুষের যে কতবড় অপমান হয়, তাহা মানুষ মাত্রেই বুঝিতে পারে।

দুঃখ যে মানুষের পরাজয়ের প্রমাণ, মানুষ তাহা অন্তরের অন্তরেই জানে। যে-কামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই সেই কামনার ব্যথায় আকুল হওয়া পুরুষের ধর্ম্ম নয়। কামনা যখন মানুষকে অভিভূত করে তখন সে পশু। অতি সহজ-লভ্য কদর্য্যবস্তু যখন তাহার প্রেয় হয়, এবং তাহাকেই উপাদেয় বলিয়া যখন সে শ্রেয়ঃ-বস্তুর বিরুদ্ধে আস্ফালন করে তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি নিজেই মেরুদণ্ডহীন। সে যখন বিষ্ঠাকে চন্দন বলিয়া তাহাকে ভোগ করিতে চায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, চন্দন আহরণ করিবার শক্তি তাহার নাই এবং বিষ্ঠা তাহার বমনোদ্রেক করে না। বিষ্ঠা ও চন্দন দুইটাকেই সমজ্ঞানে পরিত্যাগ করা, এবং চন্দনের পরিবর্ত্তে বিষ্ঠাতেই তৃপ্ত থাকা—এ দুইটি প্রবৃত্তি এক নয়, সম্পূর্ণ পৃথক্।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' এই শ্রুতিবাক্য অতিশয় সত্য, কারণ যে দিক দিয়াই দেখি ওই বাক্যই চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়। মানুষের সকল ক্ষুধার অন্তরালে

একটা গভীরতর ক্ষুধা আছে—সেইখানেই আসল অভাব, আসল দুঃখ। এই দুঃখ মানুষের মনুষ্যত্বের নিদান। এই জন্তই আর সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও কোথায় যেন একটা অভাব থাকিয়া যায়। অবশ্য মানুষ প্রথমে অন্যান্য দুঃখের নিবৃত্তির চেষ্টাই করিবে, সেই চেষ্টার ভিতর দিয়াই মানুষ এই পরম দুঃখের সন্ধান পায়—এই এক কারণেই আর সকল দুঃখ সত্য ও সার্থক। যাহা পাইলে এই শ্রেষ্ঠ দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহাকেই এইখানে 'আত্মা' বলা হইয়াছে। নামে কিছুই যায় আসে না। ক্ষুধা সত্য হইলে মানুষ সত্যকার বস্তুকেই চায়, যাহা-তাহা দ্বারা সে-অভাব পূরণ করিতে পারে না। কিন্তু, সেই বস্তুর পরিবর্ত্তে আর কিছুকে গ্রহণ করিব না—এরূপ প্রতিজ্ঞা করা বলহীনের কাজ নয়, এবং তাহা লাভ করিতে হইলে যে-তপস্যার প্রয়োজন তাহা 'বন্দী ভগবান'কে আর্ত্তনাদ করাইলেই সম্পন্ন হয় না। এই ক্ষুধা কামনারই পরিণাম—দেহের ক্ষেত্রেই ইহার অঙ্কুরোদগম হয়, এজন্য কাম বা দেহ বলিতে যাহা বুঝি তাহা ঘৃণার বস্তু নয়। কিন্তু সে কামনার সঙ্গে যদি শক্তি না থাকে তবে ক্ষুধার চরম রূপটি ধরা পড়ে না। কামনাকে সত্যের পথে জয়যুক্ত করিবার মত হৃদয়বল যদি না থাকে, তবে সে কামনা প্রাণের কামনা নয়, দেহের ব্যাধি মাত্র।

যে-দুঃখ দেহগত তাহা সার্ব্বজনীন, অতএব তাহাই পরম ও চরম দুঃখ,—এ যুক্তি অগ্রাহ্য। দুঃখ যেমন আছে, তেমনই, দুঃখকে অস্বীকার করিবার শক্তিও আছে, এই শক্তি সত্য-হিসাবে আরও অনেক বড়। সত্যকে যে আমরা সুন্দর বলিয়া জানি, শিব ও শান্ত বলিয়াই বুঝি—এই শক্তিই তাহার মূল। যাহা ব্যবহারিক সত্য অতএব অতিশয় প্রকট—সে দুঃখ পশুও পায়, কিন্তু জানে না। পশুর দুঃখ আছে, কিন্তু দুঃখ-পাওয়ার দুঃখ নাই—দুঃখকে তাহার স্বীকার করিতেই হয়। মানুষ স্বীকার করে না বলিয়াই দুঃখ তাহাকে বড় করে। এই দুঃখ তাহার নিকট বড় হইয়া উঠে যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই দুঃখকে সে মানিয়া লইতে পারে না। সে কারণ আর কিছুই নয়—মানুষ আনন্দ চায়, আত্মাকে ভালবাসে। দুঃখ যদি সার্ব্বজনীন হয়, তবে এই আনন্দও সার্ব্বজনীন। দুঃখের ব্যবহারিক প্রকট মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকেই চরম ও পরম সত্য মনে করা একটি মহৎ ভ্রম। এই আনন্দ প্রমাণ করিবার ছলে একজন রসিক মনীষী একটি বড় সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"দেখ নাই কি যে, মাঘ মাসের শীতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া

কম্পমান, দরিদ্র গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান 'কতা দে সখী কোন গলি গিয়া মেরে শ্যাম' গীত গাহিয়া থাকে, 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' গীত ত সে গাহে না।"

দুঃখের সঙ্গে সুখের বিরোধ আছে বটে, কিন্তু আনন্দের বিরোধ নাই। দুঃখ সত্ত্বেও মানুষ আনন্দ পায়, ইহাই মানুষের প্রাণের পরম রহস্য। মানুষের দুঃখ অ-সুখ নয়, সুখ দুঃখ উভয়ের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব দুঃখ—যে দুঃখের ধাতুই আনন্দ—সেই দুঃখই মানুষের নিজস্ব। এই আনন্দের অধিকার মানুষেরই আছে, পশুর নাই। তাই, দেহই এই দুঃখের বেদী হইলেও এই বেদীর উপরে যে আগুন জ্বলে—সে হুতবহ মাত্র, সকল আহুতি সে দেবতার মুখেই পৌঁছাইয়া দেয়।

এই আনন্দের প্রমাণ মানুষের যাবতীয় কারুসৃষ্টিতে। সাহিত্য-কলায় তাহা আরও পরিস্ফুট। মানুষের গূঢ়তম অনুভূতির যত-কিছু ভাবচিত্র যখন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তখন তাহার মধ্যে নিছক দৈহিকতা বা দেহ-দুর্দ্দশার যথাযথ কাহিনীই রসোদ্রেক করে না। যদি কোথাও তাহা করে, তবে সে কারুসৃষ্টির উপাদান-হিসাবে। কবিচিত্তের একটু রং, কল্পনার একটু মায়া তাহাকে রূপান্তরিত করে বলিয়াই আমরা তাহাকে বরণ করিয়া লই। কল্পনার সেই রংটুকু আর কিছু নয়—কবির নিজেরই আনন্দ-চেতনার পরিচয়। দুঃখকে তিনি দেখিয়াছেন—হয়ত তিনি গভীর করিয়া তাহার চরম রূপটাই দেখিয়াছেন, তথাপি বেশ বোঝা যায়, তিনি তাহাকে একান্ত করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার ভাবদৃষ্টিতে তাহাই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয় নাই—একটা বৃহত্তর চেতনা বা অখণ্ড অনুভূতির সঙ্গে ছন্দে ও লয়ে সুসমাহিত হইয়া তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছে, তাই তিনি তাহা হইতে রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। নতুবা তাহা জড়, অচেতন ও কুৎসিত হইত। কোন বস্তুরই যথাযথ বর্ণনা সাহিত্যের প্রয়োজন নয়—বাহিরের বস্তু যখন অন্তরের মধ্যে একটি ভাবের উদ্রেক করে, এবং সেই ভাবকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশিষ্ট অথচ সুসম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া ওঠে, তখনই সাহিত্যের জন্ম হয়। যাহা বস্তুগত বিচ্ছিন্ন তথ্য তাহাকে ভাবের পরিমণ্ডলে সম্পূর্ণ করিয়া ধরিবার শক্তিই যথার্থ সৃষ্টিশক্তি। ভাবের এই অখণ্ডতাই সাহিত্যের সুনীতি, সাহিত্যের আর কোন সত্য বা নীতি নাই। যেখানে ভাবের এই পরিমণ্ডলটি পূর্ণ নয়—যে রচনায় রচয়িতার ভাব এই সামঞ্জস্যের কামনা করে না—বস্তুকে খণ্ড তথ্যের

আকারে নকল করিয়া সত্যবাদ বা বৈজ্ঞানিক সৎসাহসের বড়াই করে, সে রচনা সাহিত্যহিসাবে ব্যর্থ, সাহিত্যহিসাবে দুর্নীতিপূর্ণ।

যে-মানুষ দুঃখকেই একান্ত করিয়া দেখিয়াছে, জীব-জীবনের একমাত্র সত্য-বস্তু বলিয়া বুঝিয়াছে—সে সুখকেও বিশ্বাস করে না। যে সুখ চায় বলিয়া দুঃখে কাঁদে, এবং যে সুখ চায় না বলিয়া দুঃখেও কাঁদে না—এই উভয়ের প্রকৃতিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মানুষ যাহা চায়—সেই চাওয়ার মধ্যে শক্তি নাই বলিয়াই তাহা পায় না; তারপর যদি না-পাওয়ার জন্য সে কাঁদে, তবে সে লজ্জাহীন, তাহার আত্ম-সম্মানবোধও নাই। যে এইরূপ কাঙাল-পনা করিয়া কাঁদে সে যদি সমাজ বা ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করে, তবে তাহা নিতান্তই হাস্যকর। ক্ষুধা স্বাস্থ্যের লক্ষণ, পীড়ার লক্ষণও বটে। হজম করিবার শক্তি নাই, খাইবার ইচ্ছা আছে—কিম্বা, যখন ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যাখাদ্য বিচারও নাই,—তখন সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে দেখিলে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে হয়, শ্রদ্ধান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। শক্তির অভাব দেখিলে শক্তিমানের দয়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অশক্তির আস্ফালন দেখিলে মহাপুরুষেরা ক্ষমা করিতে পারেন, কোনও পুরুষ পারে না।

শক্তির কথাই বলিব। জ্ঞান ও প্রেম, এই দুয়ের যে পথেই হউক—মানুষ বহুদিন দুঃখের সঙ্গে লড়াই করিয়া আসিতেছে। কোন্ পথ উৎকৃষ্ট সে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই, কেবল ইহাই বিশ্বাস করি, এই দুই পথ ছাড়া তৃতীয় পথ নাই। কিন্তু এই দুঃখের মূলে আছে কাম। দুর্ব্বল বা বিকৃত কামনাই জড়ত্বের লক্ষণ, ইহাই শাস্ত্রবর্ণিত তমোগুণ। যাহাদের কামনা দুর্ব্বল সেই মানুষের সংখ্যাই বেশী, তাহাদের অত্যাহিত নিবারণের জন্যই সমাজ-বিধির প্রয়োজন। কামনার প্রসারেই চিন্তার প্রসার; মানুষ জ্ঞানী হইয়াছে কামেরই কল্যাণে। সাধারণ মানুষ কামনার স্বচ্ছন্দ স্পন্দনে ভয় পায় বলিয়াই সমাজ-বিধিকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে—মিথ্যা গৌরব দাবী না করিয়া, অন্ততঃ নিজের সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহাকে স্বীকার করে। যেখানে এই কামনার শক্তি অজ্ঞান বা অন্ধ, সেখানে তাহা জড়শক্তির মতই—হিংসা, হানাহানি, ও আত্ম-প্রতিষ্ঠায়—আপনাকে নিঃশেষ করিতে চায়। কিন্তু যাহার কামনা-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর চিৎশক্তিরও বিকাশ হইয়াছে, সে-মানুষ কল্পনায় নিজের বৃহৎ কামনা চরিতার্থ করে। জ্ঞানের

কল্পলোকে সে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, কর্ম্মের কল্পলোকে সে মহা-যাজ্ঞিক—পরহিতব্রতী, কামের কল্পলোকে সে কবি। কামনার চরম প্রবৃত্তিতেই কামনার পরম নিবৃত্তি—বিষই অমৃতের নিদান!—ইহাই আদি রহস্য। যে-কামনায় শক্তির পরিচয় নাই তাহা কামনাই নয়—রক্ত ও পূয এক পদার্থ নয়।

প্রশ্ন উঠিবে, কামনাই যদি প্রকৃত শক্তি হয়, তবে সমাজ তাহাকে শাসন করিবে কেন? অবশ্যই করিবে। ব্যক্তিবিশেষের অহংকে সমাজ শাসন করিতে বাধ্য,—সমাজ সাধারণের জন্য, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। ব্যক্তির প্রতিভা সমাজকে সংস্কৃত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, নষ্ট করিতে পারে না। সে ব্যাপারে যেটুকু আপাত-সংঘর্ষ ঘটে, তাহা সমাজদ্রোহ নয়। সেটুকু সংঘর্ষ ঘটিবেই, তাহাতে কোন পক্ষেরই অপরাধ নাই। ব্যক্তি যেখানে সত্যই সমাজদ্রোহী, সেখানে তাহার সমাজ ত্যাগ করাই উচিত। যেটা ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র-কামনা—যাহা মূল সমাজনীতিরই বিরোধী, তাহা সকলের পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রচার করিয়া, সে যখন আপনার দুরভিসন্ধি সকলের উপর চাপাইয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকেই সমাজতন্ত্র করিয়া তুলিতে চায়, তখন সে দুর্ব্বৃত্ত ঠগ মাত্র। ইহারা নিজের স্বতন্ত্র বাসের উপায় করিতে পারে না, পরের বাড়ীর ভিত জখম করিতে চায়। বৃহত্তর সমাজের চিরন্তন কল্যাণের ভাবনা তাহাদের নাই; তাহারা অতীতের হিসাব রাখে না, বরং তাহাকে অতিশয় অশ্রদ্ধা করে; ভবিষ্যতের জন্যও চিন্তিত নয়—সে দৃষ্টিশক্তি নাই। লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে-স্বাধীনতা চায় তাহাই নিরুপদ্রবে ভোগ করিবার জন্য তাহারা যে ব্যবস্থার দাবী করে, তাহা অসম্ভব বলিয়াই সমাজে উপদ্রবের অন্ত থাকে না। যদি সত্যকার পিপাসা থাকে, অর্থাৎ চাওয়ার সঙ্গে যদি পাইবার ক্ষমতাও থাকে, তবে আপনার বাসনা আপনিই পূর্ণ কর, আপনাকেই বলি দাও—তাহারও মহিমা আছে। দুর্ব্বল জনসাধারণের পরিমিত কল্যাণকে এমন করিয়া বিঘ্নিত কর কেন? এ অভিসন্ধি কখনও সিদ্ধ হইবার নয়। সমাজ এত বোকা নয়, সমাজের একটা সামাজিক চেতনা বা সামাজিক আত্মা আছে, আত্মরক্ষার ধর্ম্মও আছে,—তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যাচারী কাপুরুষ ব্যক্তি কখনও জয়ী হয় নাই।

আজকালকার সাহিত্যে যাহারা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে তাহারাও এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবাদী। বিদ্রোহটা মূলে কাম-বিদ্রোহ, কিন্তু ধমক দিলেই

করুণ কান্না শোনা যায়—"বড় ব্যথা, বড় দুঃখ—দারিদ্র্য-দুঃখ—অর্থ-সমস্যা।" এই দুঃখের জন্য সমাজ আর থাকিবে না, ইহকাল পরকালও গেল। ইহকাল, পরকাল, সমাজ প্রভৃতি না হয় গেলই, কিন্তু তাহাতে দুঃখ-নিবৃত্তি হইল কেমন করিয়া? স্বেচ্ছাচারে যেটুকু সুখ পাওয়া যায় তাহারই চাটনীর সাহায্যে এই দুঃখকে রুচিকর করিতে হইবে! একটা অকাল পড়িয়াছে বলিয়া অনাচারের অজুহাত পাওয়া গেল, একটু সুখলাভের উপায় হইল। একটা গুরুতর সমাজ-বিপ্লবের সূচনা হইলে কোন নীতি বা নিয়ম টিকে না,—এক শ্রেণীর ক্ষুধার্ত্ত জীবের সেইটাই সুসময়; কারণ, তখন সম্পত্তি বলিয়া কিছুই আর থাকে না, চক্ষুলজ্জা করিবার প্রয়োজন হয় না, চুরি করিয়া চোর হইতে হয় না, কামনার বস্তু—উপার্জ্জন করিয়া—ভোগ করিতে হয় না, ধর্ম্মের ভানও করিতে হয় না। সকলেই তখন দুঃখ-নিবৃত্তির সহজ উপায় খুঁজিয়া পায়, হাত বাড়াইলেই দু' দশটা দুঃখনাশক বস্তু বুকের উপর আপনিই আসিয়া পড়ে। তখন দুঃখটাই একটা বড় বিলাস হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য বরং কিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হয়। দুঃখের নেশাখোর, কল্পনায় আপনাকে ক্রুশবিদ্ধ ভাবিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন ও মহিমা অর্জ্জন করিতে চায়। যক্ষ্মা হয় তাহাদের ক্রুশকাষ্ঠ, এবং নারী ও মদ্যই হয় দেহটাকে ক্ষত বিক্ষত করিবার যন্ত্র। শেষের দুইটা জিনিষ যাহাতে দুষ্প্রাপ্য না হয়, এবং সুপ্রাপ্য হইলেও নিন্দনীয় না হয়—তার জন্য তারস্বরে দুঃখের জয়গান ও সমাজবিদ্রোহ করিতে হইবে।

এই যে দুঃখ-প্রীতি ও দুঃখের আস্ফালন ইহাতে সত্যকার দুঃখ নাই। ইন্দ্রিয়-পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য যে দুঃখের দোহাই দিতে হয় তাহা কখনই সত্যকার দুঃখ হইতে পারে না। যে-দুঃখে মানুষ অসহায় জীবের মত রোদন করে—সেই দুঃখকে যখন সে মহিমান্বিত করিতে চায়, তখনই তাহার মিথ্যা ধরা পড়ে। যদি কেহ রোরুদ্যমান অবস্থাতেই বলিতে থাকে, আমার মধ্যে ভগবান বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে,—তবে তাহার কি রোগ হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারি। যে এই দুঃখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে না, অথচ ইহাকেই idealise করিয়া বাস্তবতার নামে পূজা করিবার ভান করে, সে এইরূপ বাস্তব দুঃখসম্বন্ধে যেমন অজ্ঞান, তেমনই, দুঃখের যে বিরাট মূর্ত্তি ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যেও রাজপুত্রকে উদাসীন করিয়াছিল, সে মূর্ত্তি কল্পনা করিবার শক্তিও তাহার নাই। যে সত্যকার দুঃখ পাইয়াছে, বা দেখার

মত করিয়া তাহাকে দেখিয়াছে, সে দুঃখকে লইয়া এরূপ তামাসা করিবে না। নিজের জীবনেই হউক, বা সহানুভূতি-মূলক কল্পনাতেই হউক—দুঃখের সত্য-স্বরূপ যে একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক জ্যোতির্ময়! তাহার কণ্ঠস্বরে আমরা চমকিত হই না, নিস্পন্দ হইয়া যাই।

দুঃখকে যাহারা বড় করিয়া দেখে নাই, কেবল 'বাস্তব অতএব সত্য' বলিয়াই দুঃখের মহিমা গান করে, তাহারা দুঃখেরই অজুহাতে সুখের দাবী করে,—সুখের জন্যই লালায়িত। সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নাই বলিয়া সক্ষম সুখীকে তাহারা ঈর্ষা করে। সুখ তাহাদের চাইই—সে যেমনই হউক। সেই সুলভ সুখসন্ধানের লজ্জা দূর করিবার জন্য, তাহারা নীতি, সমাজ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বীর সাজিতে চায়। দুঃখীর দুঃখকে আমি পরিহাস করি না; এরূপ দুঃখের কারণ কি, তাহার কতটুকু প্রতিকার সম্ভব, এবং কি হিসাবে তাহা মনুষ্যোচিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু এই সকল তথাকথিত দুঃখবাদীর মনস্তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ পৃথক ইহাই আমি যথাসাধ্য বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

হাস্যরস ও হিউমার

ইংরেজি 'হিউমার' শব্দটির একটা অতি স্থূল সাধারণ প্রয়োগ আছে, তাহার বাংলা প্রতিশব্দ 'হাস্যরস' হইলে আপত্তি নাই, অবশ্য যদি তাহাতে নির্দোষ রস-উপভোগের হাস্যই বুঝায়। বাংলায় হাসি বলিতে যেমন—হাসি, তামাসা, মস্‌করা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক, রসিকতা, ভাঁড়ামি, রঙ্গরস প্রভৃতি নানা ধরণের হাসি বুঝায়, ইংরেজিতেও তেমনই—Fun, Pleasantry, Jest, Buffoonery, Ridicule, Wit, Irony, Satire—প্রভৃতি শব্দ আছে। ইহাদের মধ্যে, Wit, Satire, Irony—সাহিত্যিক পরিভাষার অন্তর্গত, ইহারা শুধু হাসি নহে—হাস্যরসের গূঢ়তর ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যবোধক। আমাদের ভাষাতেও হাসি-তামাসার কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গির চল্‌তি নাম আছে, কিন্তু সাহিত্যিক পরিভাষায় তাহাদের কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। রবীন্দ্রনাথ 'হাস্যকৌতুক' নাম দিয়া একদা যে-রসের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাও একটা স্থূল বস্তু—Sublime-এর বিপরীত Ridiculous বলিতে যাহা বুঝায়—সে তাহাই, সংস্কৃত 'হাস্যরসের' ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত। কিন্তু Fun, Pleasantry, Jest, Buffoonery, এবং আমাদের হাসি-তামাসা, রঙ্গরস, ভাঁড়ামি—এ সকলের একটা সাধারণ গুণ এই যে, ইহাদের মধ্যে যে-হাসির উত্তেজনা আছে তাহা সম্পূর্ণ বাহিরের ব্যাপার; কাজ বা কথার কায়দাই ইহার প্রাণ। Wit-এর মধ্যে মার্জ্জিত বুদ্ধির বাক্‌চাতুর্য্যই তাহার প্রধান রস—সংস্কৃত 'বৈদগ্ধ্য' বা বাংলায় সোজাসুজি 'রসিকতা' তাহার প্রতিশব্দ হইতে পারে,—যদিও রসিকতা শব্দটির আরও ব্যাপক অর্থ হয়। কিন্তু Satire ও Irony এই ধরণের আমোদের ব্যাপার নয়, ইহার উদ্দেশ্য ভিন্ন—এ হাসিতে শুধুই দন্ত নয়, দংষ্ট্রা-বিকাশ থাকে। উভয়েরই অভিপ্রায়—বিদ্রূপ; কিন্তু তফাৎ এই যে—Satire খোলাখুলি বিদ্রূপ, Irony চাপা বিদ্রূপ; ইহাতে একটি বক্র-ভঙ্গি বা শ্লেষ থাকে; আবার, শ্লেষের কারণ অনুসারে Irony-র প্রকার ও মাত্রাভেদ ঘটে। Satire স্পষ্ট ও খোলাখুলি বিদ্রূপ হইলেও, ইহা যখন একটু বক্রভঙ্গীযুক্ত হয়, তখন ইহাকে Sarcasm বা টিটকারী বলা যাইতে পারে;

তখনও কিন্তু ইহা Irony নয়,—যদিও সাধারণ ভিক্সনারিতে Irony-র প্রতিশব্দ Satire-ও লেখে। ব্যাপক অর্থে Irony শুধু কথায় নয়, কাজেও হইতে পারে, যথা—'ironical cheers'; এবং সংস্কৃত 'সোৎপ্রাস উক্তি'ও Irony-র প্রতিশব্দ হইতে পারে; এই সঙ্গে 'Dramatic Irony' ও 'Irony of Fate' বাক্য দুইটিও স্মরণযোগ্য। কিন্তু Irony শুধু চাপা-বিদ্রূপ নয়,—বিদ্রূপের বক্রভঙ্গিতে ব্যথা ও মর্ম্মপীড়াও ফুটিতে পারে। Lear-এর Fool-এর হাস্য এই জাতীয়; আমাদের দ্বিজুরায়ের Satire-ও এইরূপ Irony-র সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। শরৎচন্দ্রের হাস্যরস অধিকাংশস্থলে এইরূপ মর্ম্মপীড়াজনিত Irony; রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার-সভা'র প্রধান রস যেমন Wit, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে-ধরণের হাস্যরস আছে তাহা প্রধানতঃ—Irony। তথাপি রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে পরিমাণ হিউমার আছে, শরৎচন্দ্রের তাহা নাই; একেবারে নাই বলি না, কিন্তু শরৎচন্দ্র যে একজন 'হিউমার'-রসদক্ষ লেখক, একথা সর্ব্বৈব অযথার্থ; কারণ, শরৎচন্দ্র যে-মাত্রায় sentimental, তাহাতে খাঁটি হিউমার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

এখন কথা হইতেছে, তবে 'Humour' পদার্থটি কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্থূল অর্থে 'হিউমার' হাস্যরসই; তবে সে-রস আমোদ বা কৌতুক-প্রধান— মর্ম্মদাহ, আক্রোশ, তাহাতে নাই। আবার তাহা নিকৃষ্ট Farce-ও নয়। এই অর্থে, American বা English Humour বলিতে আমরা এক এক জাতীয় হাস্যরস-রসিকতার নমুনা বুঝি। সবদেশের সব মানুষই হাসে; একটা প্রাকৃত হাস্যরস (ঠাট্টা, মস্‌করা, ভাঁড়ামি) সকল দেশের লোকেই অল্প-বিস্তর চর্চ্চা করে। কিন্তু 'হিউমার' বলিতে এই অর্থে যে হাস্যরস-রসিকতা বুঝায়, হয়ত কোন জাতির মধ্যে তাহার তেমন প্রাচুর্য্য নাই, তাহারা এ রসের তেমন পক্ষপাতী নয়, —Scotch জাতির এ দুর্ণাম আছে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতারাও এ বিষয়ে তেমন সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ইহাই হিউমার-শব্দের প্রচলিত অর্থের মোটামুটি সঙ্কেত। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনায় 'হিউমার' শব্দটির আর একটি গভীরতর ও মহত্তর আলঙ্কারিক অর্থ আছে। এই সূক্ষ্মতর অর্থে 'হিউমার' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে দেখা যাইবে, লেখকের রচনায় 'হিউমার'-এর রূপ যেমনই হোক, তাহার অন্তরালে লেখকের একটি মানস-ধর্ম্ম (an attitude of the mind) পরিস্ফুট হইয়া উঠে। জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ

সহৃদয় মনোভাবই 'হিউমার'-এর মূল উৎস। জ্বালা, মর্ম্মপীড়া বা ন্যায়-অন্যায়-বোধের আক্রোশ ত নহেই—কোন উচ্ছ্বাস বা অবসাদের অভিব্যক্তিও খাঁটি 'হিউমার'-এর লক্ষণ নয়। মানুষের সর্ব্ববিধ নির্বুদ্ধিতা,—তাহার অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, এবং বিশেষ করিয়া, ভাগ্যের পরিহাস-নিষ্ঠুর পীড়নে মানুষের যে চিরন্তন অসহায় অবস্থা—তাহার সম্বন্ধে অতিশয় ধীরবুদ্ধি ও আক্ষেপহীন মনোভাব রক্ষা করিয়া, সেই সকলের উপরে একটি লঘু-হাস্যের আলোকপাত করার যে প্রতিভা বা রসবোধ, তাহা হইতেই খাঁটি 'হিউমার'-এর উৎপত্তি হয়। এরূপ রস-রচনার পক্ষে লেখককে সাধারণ মানবীয় সংস্কারের কিছু উর্দ্ধে উঠিতে হয়। এ রস-রসিকতার ক্ষমতা যেমন সকলের থাকে না, তেমনই, সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভার মধ্যে অল্পবিস্তর এ রসের সন্ধান মিলিবে। এ রস অতি স্থূল হাস্যরস নয় বলিয়াই, এ রস উপভোগ করিতে হইলেও পাঠকের বিশিষ্ট রসবোধ বা taste থাকা চাই। আমার মনে হয়, যাঁহাদের এই 'sense of humour' আছে তাঁহারাই খাঁটি রসিক; এবং সাহিত্য-রসবোধের যে অভাব অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়—যে 'সহৃদয়তা'র অভাবই 'অরসিকতা'র কারণ—তাহার মূলে এই 'sense of humour'-এর অনটন লক্ষ্য করা যাইবে। সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষায় 'sense of humour' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকেই আর একটু সূক্ষ্ম ও গভীর করিয়া লইলে এই রসিকতার লক্ষণ মিলিবে। স্থানকাল-পাত্রোচিত সামঞ্জস্যবোধ, বা sense of proportion না থাকিলে, আমরা যেমন মানুষকে হীনবুদ্ধি বলিয়া নিন্দা করি, তেমনই, মানুষের জীবন, তাহার চরিত্র ও ভাগ্য-সম্বন্ধে যাঁহার মনের মধ্যে একটি ভাব-সাম্য বা স্থিরবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে নাই—তাঁহাকেই আমরা এই অর্থে বেরসিক বলিতে পারি। মানুষের সমগ্র জীবন বা জগতের সব-কিছু সম্বন্ধে এই যে মনোভাব, ইহাতে কোন তত্ত্বসন্ধান বা সত্য-জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি নাই, একটা সামঞ্জস্য-বোধের রস-কল্পনামাত্র আছে—এইজন্য ইহাকে আমরা রসিক-বুদ্ধি (Poetic Reason) বলিতে পারি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য—মানুষের শক্তির অহঙ্কার ও অশক্তির দৈন্য—এই রস-কল্পনায় একটি সমান ভাবরসে অভিষিক্ত হইয়া যে রূপ ধারণ করে তাহাতে হাস্যরসের কোন জ্বালা বা আক্রোশ থাকে না; ইহাতে, করুণরসের মধ্যেও একটি উদাসীন নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা নিহিত থাকে। এইজন্যই এইরূপ হাস্যরসে যেমন জ্বালা বা

আক্রোশ থাকে না, তেমনই ইহা করুণ-রসেরও বিরোধী নয়; Farce-এর মধ্যেও খাঁটি 'হিউমার'-কে প্রায়ই উঁকি দিতে দেখা যায়, সেই সকল স্থানে অতিশয় লঘু হাস্যরসও উৎকৃষ্ট কাব্যরসে পরিণত হয়। 'হিউমার'-এর মধ্যে যে সহৃদয়তা আছে তাহা ঠিক কারুণ্য বা করুণরস নয়, তথাপি অনেক উৎকৃষ্ট হিউমার-রস-রচনায় করুণরসের রেশ থাকে। Lamb-এর 'Essays of Elia' এবং Mark Twain-এর রচনায় হিউমার প্রায়ই একরূপ করুণরসের দ্যোতনা করে; কিন্তু সেখানেও সেই করুণরসের মধ্যে লেখকের মনোভাবের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে—পাঠক যদি নিজে না sentimental হন, তবে তাহা খাঁটি হিউমার বলিয়াই বুঝিতে পারিবেন। ডিকেন্সের লেখায় এই হিউমার বড় সহজেই করুণ-রসের প্রশ্রয়ে সংযম হারাইয়াছে; এইজন্যই বোধ হয়, ডিকেন্স্‌কে স্যুইনবার্ণ 'master in the conterminous provinces of laughter and of tears' —বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তথাপি, হাস্যরসের মধ্যেই করুণরস, এবং করুণরসের মধ্যেই হাস্যরসের সৃষ্টি—উৎকৃষ্ট হিউমারের লক্ষণ; কারণ, হিউমার-রস-রসিকের কল্পনায় হাসি ও কান্না তুল্যমূল্য, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদের দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলিতে হাস্যের অন্তরালে এই গুণ আছে বলিয়াই অমৃত বসুর প্রহসন অপেক্ষা সেগুলি অধিকতর সাহিত্যগুণোপেত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'লীলাবতী'র হেমচাঁদ-চরিত্রে অতি সূক্ষ্মভাবে এই রস সঞ্চারিত হইয়াছে। 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, যুবা সাজিয়া, নকল বাসর-ঘরে নকল শালী-শালাজদের কানমলা সহ্য করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন সহসা—'মরে গেছি! মরে গেছি! ও রামমণি!' বলিয়া তাহার বৃদ্ধবয়সের একমাত্র পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী বর্ষীয়সী বিধবা কন্যার নাম করিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—তখন এই হাস্যরসে আর এক রসের সঞ্চার হয়; নিজ বার্দ্ধক্য অস্বীকার করিয়া যে-বৃদ্ধ বিগত-যৌবনের অভিনয় করিতেছে, সে যে কিছুতেই জরাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছে না, নিমেষের মোহও টিকিতেছে না—নিয়তির সহিত কঠিন সংগ্রামে বিমূঢ় মানবের এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি তাহার অন্তরালে গভীর সহানুভূতির কারণ রহিয়াছে। কিন্তু সে সহানুভূতি-কালে অদৃষ্ট ও বিধাতার বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশের ভাব নাই—ইহাই উৎকৃষ্ট হিউমারের নিদর্শন। এই pathos রচনা-

বিশেষের হিউমারের মধ্যে স্ফুট বা অস্ফুট হইয়া থাকে ; তাই বলিয়া সেই পরিস্ফুট pathos-কেই উৎকৃষ্ট হিউমারের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, লেখকের যে মনোভাব হইতে হিউমারের উদ্ভব হয়, সেই মনোভাব-সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হইবে না। এইরূপ ক্ষুদ্র ধারণার বশে, pathos-মাত্রকেই উৎকৃষ্ট হিউমার মনে করিয়া একজন লেখক শরৎচন্দ্রের রচনায় যে সকল অংশে খাঁটি করুণরস ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও খাঁটি হিউমারের ভঙ্গী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, এবং হিউমার ও Irony-তে গোল পাকাইয়াছেন। ইহারই প্রতিবাদে আর এক ব্যক্তি অভিধান হইতে 'হিউমার'-এর যে অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও এমন একটি কথা আছে যাহা না থাকিলে, 'হিউমার' কথাটির বিশেষ কোন অর্থই পাওয়া যাইত না, সেটি হইতেছে—'depending for its effect on kindly human feeling'। একটু ভাবিয়া দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, এই 'kindly human feeling'-এর সঙ্গে করুণরসের বিশেষ বিরোধ নাই ; অবশ্য এ করুণরসের মাত্রা ও ভঙ্গি যে একটু বিশেষ রকমের, তাহা আমি যতদূর সাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি অশ্রুমাত্রকেই 'হিউমার'-এর চতুঃসীমানা হইতে নির্ব্বাসিত করিলে আর একদিকে বাড়াবাড়ি করা হয়। শরৎচন্দ্রের রচনায় যে grim humour আছে, তাহা অতি তীব্র তীক্ষ্ণ Irony-রই উদাহরণ। তথাপি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' হইতেই 'হিউমার'-এর একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বর্মার কাহিনীতে সেই যে দুইটি প্লেগভয়ভীত মান্দ্রাজী (?) ক্রিশ্চিয়ানের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা আছে, তাহা মুখ্যত pathos বলিয়াই উপভোগ্য নয় ; নির্ব্বোধ দুর্ব্বল অসহায় মানবের দুর্দ্দশাদর্শনে যে একটি সহৃদয় অথচ নির্লিপ্ত হাস্যভঙ্গী এই করুণ দৃশ্যের বর্ণনাতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' বলা যায়।

'হিউমার'-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে, Ludicrous হইতে Pathetic পর্য্যন্ত সকল পর্দ্দায় 'হিউমার'-এর গতিবিধি আছে ; কেবল, সেই সকলের মধ্যে যেখানে ঐ বিশিষ্ট মনোভাব (attitude of the mind)-এর পরিচয় নাই, তাহা 'হিউমার'-পদবাচ্য নয়। বস্তুতঃ, 'হিউমার' বলিতে যে রস বুঝায় তাহার সদ্ভাব কেবল সেই লেখকের রচনাতেই সম্ভব—যিনি সত্যকার সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী। এমন কি, মাত্র এই রসসৃষ্টির ক্ষমতা

যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা খুব বিশাল না হইলেও, তাঁহারা যে প্রতিভাশালী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আবার ইহাও লক্ষ্য করা যায়, যাঁহারা 'হিউমার'-সৃষ্টিতে নিপুণ, তাঁহারা উৎকৃষ্ট pathos-সৃষ্টিও করিতে পারেন। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যে একটি মাত্র লেখক, বিশেষ করিয়া, এই 'হিউমার'-গুণের অধিকারী, সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও 'কাশীবাসিনী'র মত গল্প লিখিয়াছেন; আবার, 'হিউমার'-এর প্রধান উপাদান যে 'kindly feeling' তাহাও যে কত সহজে অশ্রুজলের সৃষ্টি করে, তাহা তাঁহার 'ভুলশিক্ষার বিপদ' গল্পটি পড়িলে পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এই গল্পের নায়ক-চরিত্রটি উৎকৃষ্ট 'হিউমার'-এর নিদর্শন; কিন্তু সেই চিত্রেও যে অশ্রুপ্লাবন আছে, তাহা যে 'হিউমার'-রসের বিরোধী নয়—তার প্রমাণ, ঐ গল্পটিতে শেষ পর্য্যন্ত রস-বিপর্য্যয় ঘটে নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একজন অধুনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিশালী লেখকের নাম করা যাইতে পারে—ইনি 'গড্ডলিকা'-প্রণেতা পরশুরাম। ইহার রচনায় যে হাস্যরস আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে Wit এবং Fun থাকিলেও তাহা অতি স্নিগ্ধ সংযত Satire; তাঁহার সেই Fun-এর অন্তরালে একটা অতিশয় প্রচ্ছন্ন cynical laughter আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার দুইটি উৎকৃষ্ট গল্পের নাম করা যাইতে পারে—'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ও 'ভুষণ্ডীর মাঠ'। ঠিক এই ধরণের হাস্যরস বাংলা-সাহিত্যে নূতন; তথাপি এই সকল রচনায় লেখকের attitude খাঁটি 'হিউমার'-এর attitude নয়—কারণ, এই হাস্যরসের অন্তরালে, মানুষের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে একটি সহৃদয় রসকল্পনার যে নির্লিপ্ত প্রসন্নতা, তাহা অপেক্ষা বিদ্রূপের ভঙ্গীই প্রবল,—যদিও সেই বিদ্রূপ এমন স্নিগ্ধ ও সংযত যে, বাংলা-সাহিত্যে তাহা একটি বিশিষ্ট হাস্যরসের আমদানি করিয়াছে। পরশুরামের রচনায় প্রভাত-কুমারের রচনাভঙ্গির যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেই উভয় লেখকের রচনা তুলনার দ্বারা বিচার করিবার সুবিধা আছে, এইরূপ তুলনায় উভয়ের হাস্যরস-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রভাতকুমারের হাস্যরসে যে উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার হাস্যরসের মূলে এক ধরণের poetic reason বা কবি-বুদ্ধি আছে, পরশুরামের হাস্যরসে তাহা নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব। 'হিউমার' শব্দের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ

যখন নাই, তখন কি ইংরেজি শব্দটাই লইতে হইবে? এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি এই যে, বাংলায় যখন আধুনিক সকল শাস্ত্রের পরিভাষা-সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, তখন সাহিত্য-সমালোচনাতেও পরিভাষা চাই। সকল শব্দই যদি ইংরেজি হইতে গ্রহণ করিতে হয়, তবে আলস্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সংস্কৃতভাষা যখন বাংলা শব্দের আকর-স্বরূপ রহিয়াছে এবং চিরদিন থাকিবে, তখন এইরূপ শব্দচয়ন বা শব্দ-নির্ম্মাণে অসুবিধা নাই। কাজটি অবশ্য পণ্ডিতের কাজ; কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভাবে আমরা যদি এইরূপ বিদেশী শব্দ এত অধিক গ্রহণ করি, তবে ভাষার নিজস্ব শ্রী ক্ষুণ্ন হইবে, এবং অ-পণ্ডিতেরা প্রশ্রয় পাইবে। 'হিউমার'-শব্দটির সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি এই যে, এই ইংরেজি শব্দটির সঠিক তাৎপর্য্য এখনও যখন অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তখন সমান অপরিচিত একটা নূতন দেশী শব্দ ঠিক করিয়া লওয়াই কি অধিকতর সঙ্গত নয়? অতএব, 'হিউমার'-শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি হইতে পারে, সাহিত্যরসিক পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করুন; বর্ত্তমান লেখকের সে সাহসও নাই, সে পাণ্ডিত্যও নাই—এই আলোচনায় আমি যে বহু ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

'রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ'

১

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া নানা দলের বচসা কিছুকাল হইতে কবির মনে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিল; চারিদিক হইতে ভক্ত ও অভক্তের উৎপীড়নে তিনি কখনও বামে কখনও দক্ষিণে হেলিতেছিলেন। আসনখানিতে অটল হইয়া থাকিলেও এই ভূত-প্রেত-প্রমথগণের দৌরাত্ম্য তাঁহাকে যে একটুও চঞ্চল করে নাই, এমন কথা বলিলে কবিকে অসম্মান করাই হইবে। কারণ, বাংলা-সাহিত্যের অতি-আধুনিক গতি-প্রকৃতির দিকে একবার যখন তাঁহার, দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন—ব্যাপারটা যে অতিশয় তুচ্ছ—এমন কথা ভাবিতে তিনি পারেন নাই, বরং তাহাকে বুঝিবার ও তাহার সম্বন্ধে নিজের ধারণা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা তিনি এই স্বল্পকালের মধ্যে নানা উপলক্ষে ও নানা প্রবন্ধে বহুবার করিয়াছেন। যাহারা এই সাহিত্য রচনা করে ও তাহার গুণগানে পঞ্চমুখ, এবং যাহারা তাহা রচনা করে না ও তাহার নিন্দায় দশমুখ, এই উভয়দলের কাহারও সহিত তাঁহার বনিল না, কারণ তিনি আজীবন সরস্বতীরই সেবা করিয়াছেন। সে-সরস্বতী মল্লভূমির অধিষ্ঠাত্রী নন; তাঁহার পূজায় যে অভ্র-আবীর লাগে তাহার একটি বর্ণের, অপরটি আলোকের প্রতীক। তাই সরস্বতীর নামে যখন দুষ্ট-সরস্বতীর পূজা চলিতেছে, এবং যখন সেই পূজায় এক-পক্ষ পাঁক, গোবর ও ঘেঁটুফুল সাজাইতেছে, ও অপর-পক্ষ আসল দেবতার নাম না লইয়া অপদেবতা-দমনের জন্য ক্রমাগত মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, তখন দেবীর একনিষ্ঠ পূজারী স্থির থাকিতে পারেন নাই। আজ দেখা যাইতেছে, কবি আত্মস্থ হইয়াছেন, যে আনন্দে কবির মুক্তি—সেই রস-সৃষ্টির আনন্দে কবি বাস্তবের সমস্যা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'শেষের কবিতা'র যেটুকু পড়িলাম তাহাতেই বুঝিতেছি, এই আঘাত ও বৃথা-বিতর্কের ক্ষোভ তাঁহার চিত্ততলে কোন্ রসের সঞ্চার করিতেছিল। সকল রূঢ়তা নির্লজ্জতা ও নির্মমতার উপরে তিনি একটি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপগুণ্ঠিত করুণ

হাস্ত বিকীর্ণ করিয়াছেন, রসে ও রূপে, ছন্দে ও দীপ্তিতে এ রচনা ঝলমল করিতেছে। বিতর্ক ও বচসার ক্ষেত্রে যে বস্তু অতিশয় কঠিন ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, কবি-কল্পনা তাহারই একটি রস-রূপ আবিষ্কার করিয়াছে। সহসা একটি বিদ্যুৎশিখা ভাবঘন পুঞ্জমেঘ বিদীর্ণ করিল,—অমনি মন্দ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ধারাবর্ষণ সুরু হইয়াছে, গুমট ভাঙ্গিয়াছে, ধূলি-ঝঞ্ঝার ঘূর্ণানৃত্য আর আমোল পাইবে না। কবি এখন মুক্ত, তৃপ্ত ; যাঁহারা রসিক তাঁহারাও কৃতার্থ হইলেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে কবি এখনও বাঁচিয়া আছেন,—এখনও এমন করিয়া আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর করিতেছেন। "শেষের কবিতা" পড়িতে পড়িতে মনে হয়—

বিপাকের বিভীষিকা রজনীর 'পরে
করধৃত-শুকতারা শুভ্র উষাসম
কে তুমি উদিলে আসি—?

কবির সঙ্গে আমরাও কবিস্বর্গে উত্তীর্ণ হই,—কল্পনার যাদুবলে, রসের অতর্কিত সংক্রমণে, ভাষার মণিশিলাবিচ্ছুরিত বিদ্রুপচ্ছটায় যেন নিমেষে লোকান্তরে উত্তীর্ণ হইয়া যাই—বাস্তবের তুচ্ছতা, মলিনতা ও সংকীর্ণতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। ইহাই কাব্য, এই কাব্য আছে বলিয়াই আমরা জীবনযুদ্ধে ক্ষণেক বিশ্রামসুখ উপভোগ করি। দিবাবসানে রণশ্রান্ত সৈনিক যখন ধূলিশয্যায় নিষণ্ণ হয়, তখন নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশ তাহার চক্ষে যে পরিপূর্ণ শান্তি উন্মীলিত করে, যে স্বপ্নাঞ্জন পরাইয়া দেয়—এ সেই বেদনা-হরণ সুধা। তর্কে যাহার মীমাংসা হয় না, শাস্ত্র যাহাকে শাসন করিতে পারে না, সুবুদ্ধি যেখানে সংশয়যুক্ত—যেখানে জিজ্ঞাসার তৃপ্তি নাই, সেখানে রসই মুহূর্তে নিশ্চিন্ত করিয়া দেয়। অন্তরের অন্তস্তলে যে আনন্দ জাগে তাহাতে সকল দ্বন্দ্ব উবিয়া যায়, সমাধানের অপেক্ষাও রাখে না। যেখানে এই অবস্থা হয়, সেখানে বাক্য অন্তর্দ্ধান করে এবং বাণীর অধিষ্ঠান হয়,—যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাই অন্তরকে নির্ব্বাক করিয়া দেয়। আমাদের কাব্য-কলহে কবি এতদিন কূল পাইতেছিলেন না, আজ সেই কলহকেই তিনি রূপান্তরিত করিয়াছেন,—কাগজের মসীচিহ্নগুলিই হঠাৎ তাঁহার চক্ষে

সঙ্গীতের স্বরলিপি হইয়া উঠিয়াছে; বাদ বিসম্বাদের উদ্ধত ও উদ্ধৃত যুক্তি এবং কুযুক্তি, মৃণালশোভী কণ্টকের মত জলতলে নির্ব্বাসিত হইয়াছে!

এমনই হয়, কাব্যের এই যাদুশক্তির কথা কে না জানে? কবিরই কি এ কাজ নূতন? সারাজীবন তিনি কি এই কাজই করিয়া আসিতেছেন না? বাস্তবের এই বাধা, এই ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার গ্লানি যখনই তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে, তিনি ক্ষণমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন—কিন্তু তখনই তাঁহার কল্পনা-বিহঙ্গী সবলে পক্ষজড়িমা দূর করিয়া উর্দ্ধাকাশে বিচরণ করিয়াছে। যখনই মনে হইয়াছে—

লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন-অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর;—জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

—তখনই সেই আর্ত্তস্বরের মধ্যেই সুধানিস্যন্দিনী বাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, বেদনার তীর্থজলে আনন্দের অভিষেক হইয়াছে। তথাপি, আজিকার এই অভিনব স্বপ্ন-প্রয়াণের মধ্যে কবি-মানসের এমন একটি পরিচয় আছে, রস-সৃষ্টিতে এমন একটি বস্তুগত ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে যে, মনে হয় কবির প্রাণটিকে আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি। বাহিরের আঘাত চিরদিনই কবিকে আরও বেশী করিয়া অন্তরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে; 'প্রত্যহের কুশাঙ্কুর' তাঁহার চরণে যখনই বিঁধিয়াছে, তখনই তিনি দেশ ও কাল অতিক্রম করিয়া শাশ্বত-সুন্দরের আরতি করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য রচনায় সেই কুশাঙ্কুরের ক্ষতচিহ্ন আমরা খুঁজিয়া পাই না। সে ব্যথা এতই বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার স্পন্দন-পরিধি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহার উৎপত্তি বা কেন্দ্রবিন্দু আর লক্ষ্য করা যায় না। 'শেষের কবিতা'য় সে ব্যথার চিহ্ন আছে। সেই ব্যথাকে কবি কেমন করিয়া আত্মস্থ করিতেছেন—তাঁহার হৃদয়ের রসায়নাগারে তাহার সেই রসপরিণতির প্রক্রিয়াটিকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই কারণেই এ রচনায় রসের একটি নূতনতর স্বাদ আছে।

২

গল্পটির যতটুকু আমরা এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি তাহাতে একটা বিষয়ে আমাদের কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যে অক্ষমতার দম্ভ ও নবত্বের প্রমত্ততা আছে তাহার অন্তর্গত ভঙ্গীটিকে কবি এই গল্পে একটি বিশেষ রূপ দিয়াছেন—একটি অভিনব চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় কবি শ্রীহীন বাস্তবকে একটি শ্রী ও সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। যে বাস্তবের সঙ্গে আমরা পরিচিত, কবির রস-কল্পনা তাহাকেই রূপান্তরিত করিয়াছে—তাহার মধ্যে যে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, মনের অপরিচ্ছন্নতা ও চিন্তার দৈন্য আছে, তাহাই তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল। তাই কবি তাঁহার ভাবদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ইহার অন্তরালে, সকল অক্ষমতার মধ্যে, একটি প্রাণের আকুতি আবিষ্কার করিলেন। না করিয়া উপায় নাই,—যাহা ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া না লইলে কবির শান্তি বা সান্ত্বনা নাই। বাংলার সাহিত্য-পল্লীতে শীত-সন্ধ্যায় যে ধূমবাষ্প উত্থিত হইতেছে তাহার মধ্যস্থলে বাস করিলে শ্বাসরোধ হয় বটে, কিন্তু একটু দূর হইতে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, সেই ধূম একটি নীল-মণ্ডলরেখায় গ্রামখানিকে বলয়িত করিয়াছে। অস্তমিত সূর্য্যের শেষ আভায় সে দৃশ্য যথার্থই সুন্দর। যাহা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কুণ্ডলায়িত অবস্থায় অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক, তাহাই দূর হইতে দেখিলে সুনীল ও মণ্ডলাকার। বিদ্রূপের মধ্যেও এমনই একটি রূপের লীলা রহিয়াছে,—জগতের কোন কিছুই সুষমাহীন নয়। তাই অসংখ্য বিকট ও বিরূপের একাকার হইতে কয়েকটি ভাঙ্গা ও টুকরা উপাদান সংগ্রহ করিয়া, কবি একটি রস-রূপের প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহার নাম 'অমিত রায়'।

যে পরম আদর্শের সাধনা কবি আজীবন করিয়াছেন, যাহাকে নিজের দেবদুর্লভ প্রতিভায় তিনি বঙ্গবাণীর রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার প্রতি নব-নবীনের এই শ্রদ্ধাহীনতায় কবি কতখানি ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহার মনের এই অভাবাত্মক গ্লানি আবার সেই নিয়ত উৎসারিত ভাবধারায় ধুইয়া-মুছিয়া গেল। বাহিরের এই বাস্তব 'experience'-টিকে তিনি তাঁহার দিব্যানুভূতির দ্বারা 'perfect' করিয়া লইলেন, এই 'slying vapours'-কে একটি 'art pattern'-এ বাঁধিয়া ফেলিলেন। কুশাঙ্কুর পুষ্পকেশরে পরিণত হইল।

যৌবনের দম্ভকে সংসার-পণ্ডিত সহ্য করিতে পারে না—কাণ মলিয়া দিতে অগ্রসর হয়। দার্শনিক তাহাকে একেবারেই উপেক্ষা করে; দার্শনিক যে সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত সে দেশকাল-নিরপেক্ষ একটা অমোঘ অব্যর্থ তত্ত্ব; তাই সকল বৈচিত্র্যই তাহার চিত্তবিক্ষেপের কারণ। কিন্তু কবির ধর্ম্ম যুক্তি নয়, অনুভূতি। যে নিয়ম বা তত্ত্বকে বুঝিতে হইলে সকল বৈচিত্র্যকে একাকার করিয়া দেখিতে হয়, কবির দৃষ্টি তাহাতে নিবদ্ধ নয়। তিনি সেই নিয়মকে উপলব্ধি করেন আর এক রূপে। তাঁহার কাছে সে বস্তু পরমাশ্চর্য্য, তাহা দেশে ও কালে পরিব্যাপ্ত—সর্ব্ব বিরোধের মধ্যে একটি সঙ্গতি রক্ষা করিতেছে। বিচিত্রকে একাকার করিয়া যে-ঐক্য তাহা সে-ঐক্য নয়—তাহা একই কালে এক ও বিচিত্র। তাহার প্রবাহ নতোন্নত—তরঙ্গধারার মত; তাহার যে অংশই পৃথক করিয়া দেখি, তাহারই মধ্যে সেই সমগ্রতার ছন্দ রহিয়াছে। এই অদ্ভুত বস্তুর নাম প্রাণধারা। ইহাকে ব্যাকরণশাসিত বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব, যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবে কে? বিশ্বের এই প্রাণস্পন্দকে প্রাণের মধ্যেই অনুভব করা সম্ভব। কবিই ইহাকে অনুভব করেন, ও প্রকাশ করেন ছন্দে। যাহা তোমার আমার কাছে অসঙ্গত, প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত কবির চক্ষে তাহার মধ্যেই সঙ্গতি ধরা পড়ে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিশ্বায়ত প্রাণধারার প্রবল পরিচয় পাওয়া যায় তাহার যৌবনে। যৌবন সর্ব্বপাবন, তাহার অগ্নিতাপে নিকৃষ্ট ধাতুও আলোক বিকিরণ করে। তাই এই যৌবনের প্রতি কবির একটি বিশেষ মমতা আছে; কারণ, তাহার দম্ভের মধ্যেও একটা প্রবল প্রাণের বেগ আছে। যখন শাশ্বতকে অস্বীকার করিয়া সে ক্ষণিকের জয়গান করে, তখন কবির প্রাণে রস উছলিয়া উঠে, কবি তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সঙ্গতি লক্ষ্য করেন। যৌবন যাহাকে অস্বীকার করে—অস্বীকার করে বলিয়াই তাহার সম্মান বৃদ্ধি হয়! বিরোধের দ্বারা সে যাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহাকেই সে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। যৌবনের এই বিমূঢ়তা, এই আত্মবিস্মৃতিই পরম কৌতুককর। বিশ্বব্যাপ্ত বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও বন্ধুরতাই যে প্রাণের ছন্দ—বা ছন্দেরই প্রাণ! যৌবনের বিদ্রোহের মধ্যে এই সত্যের প্রতিই loyalty আছে,—ছন্দকে ভাঙ্গিয়াই এই যে ছন্দানুসরণ, বিদ্রোহাচরণের দ্বারাই এই যে বশ্যতা—ইহাই ত' লীলা! যাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে মানিতেছি, যাহাকে না মানিয়া উপায় নাই—যিনি পরমপ্রিয় প্রাণেশ্বর, তাঁহারই গোপন

ইঙ্গিতে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া এই যে নৃত্য, এ যে তাঁহাকেই বেড়িয়া বেড়িয়া করিতেছি,—এ আনন্দ যে তাঁহাতেই সমর্পিত হইতেছে!

৩

'অমিত রায়ের' মধ্যে এই আত্মবিরোধের লীলা কবি পরম কৌতুকসহকারে উপভোগ করিতেছেন। যৌবনের অবিমৃষ্যকারিতার মধ্যে যে রস আছে, শুধু তাহাই নয়—একটা সজ্ঞান বিরোধ, আত্মপ্রবঞ্চনার জিদ, জাগিয়া ঘুমাইবার চেষ্টাও কবি তাহাতে যোগ করিয়া দিয়াছেন। বাংলাদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যিক আবহাওয়ায়, সুন্দরের প্রতি যে একটা আক্রোশের ভাব আছে, তাহার মূলে আছে অশিক্ষার বর্ব্বরতা। ইহাকে ভৎর্সনা করা চলে, মাষ্টারী করা ছাড়া ইহার সম্বন্ধে আর কোনও ব্যবস্থা নাই। ইহাকে লইয়া যে-রসের সৃষ্টি হইতে পারে তাহাও অতিশয় প্রাকৃত-জনসুলভ বিদ্রূপ-রস, কবির পক্ষে তাহা উপাদেয় নয়। তাই কবি এই বাস্তবকে একটা সুদৃশ্য pattern-এ বুনিয়া তুলিলেন। অমিত রায়—আর যাই হোক, বর্ব্বর নয়। সুন্দর কি, সে তাহা জানে। সেও স্বপ্ন দেখে—

"কিন্তু, লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোন-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোণার মুহূর্ত্তটিকে সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তারপরে কি হবে ভেবে দেখ!"

—কাব্য ইহার চেয়ে বেশী সুন্দর আর কি হইবে? যে রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সে কোমর বাঁধিয়া তর্ক করে, তাঁর কাব্য-কল্পনার অপরাধ কি ইহার চেয়েও গুরুতর? বরং, ইহাই মনে হয় যে, রবিঠাকুরের কাব্যরসে তাহার চিত্ত ভরপুর। রবিঠাকুর তাহার মনোহরণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি এত আক্রোশ। সে যখন বলে—"ফজ্‌লি আম ফুরোলে বল্‌ব না, আনো ফজ্‌লিতর আম, বলব, নতুন বাজার থেকে বড় দেখে আতা নিয়ে এস ত হে।" তখন সে নিশ্চয় জানে, ফজ্‌লি আমের সময় ফজ্‌লি আম প্রতি বৎসরই নূতন হইয়া দেখা দিবে; সে বুদ্ধিমান—ফজলিতর কিছু সে চায় না, সে চায় স্বাদ বদলাইতে। সে ভোগক্লান্ত—Blase' নয়, রসনাকে একটু চান্‌কাইয়া লইতে চায় মাত্র। এই spirit of contradiction তাহার যৌবন-

ধর্ম,—সে রবিঠাকুরকে, অর্থাৎ আপনাকেই contradict করিয়া সুখ পায়, তাই রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে তাহার যুক্তিগুলি এমন তীক্ষ্ণ, অথচ absurd। মনে হয় 'অমিত রায়' কবির নিজেরই একটি *complex*। যৌবন-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিজের যে একটু নিগূঢ় সহানুভূতি আছে, আবার জীবনের [illegible] তাহার একরূপ ব্যাধির প্রতিও তাঁহার যে কুণ্ঠার ভাব আছে,—এই উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে তিনি নিজেরই একটি মানস-আত্মীয়কে মূর্ত্তি ধারণ করাইয়া রস-পিপাসা মিটাইতেছেন।

কারণ, বাহিরে কোন বাস্তব 'অমিত রায়' নাই। বাহিরে যে যৌবন নবত্বের দম্ভ করিতেছে, তাহার মধ্যে ব্যাধি আছে, বোধশক্তি নাই। সে কখনও ফজ্‌লি আম খায় নাই—যাহার স্বাদ সে জানেনা, তাহার বদলে আতাই বা চাহিবে কেন? সে ফজ্‌লিও বোঝে না, আতাও বোঝে না—স্বাদ বদলাইবার জন্য সে বড় জোর নোনার বদলে আঁশ-ফল চাহিবে। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, 'অমিত রায়' নামক ব্যক্তিটির মধ্যে একটু বাস্তবের ছায়া আছে, অথচ কায়ার সঙ্গে ছায়া যেন একটুও মেলে না। ইহাই রসসৃষ্টির রহস্য। "A poem is a very image of life."—বলিলে কথাটা হঠাৎ স্বীকার করিতে বাধে, কিন্তু তার সঙ্গে যদি যোগ করা যায়—'expressed in its eternal truth', তবে আর বাধে না। নবত্বের দম্ভের উপর কবি যে একটি কঠোর অথচ সহানুভূতি-কাতর হাস্য বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তিনি উহার eternal truth-টিকে ধরিয়া দিয়াছেন। 'অমিত রায়'কে একটু দূরে ধরিয়া—তাহাকে যেমন একদিকে একটি সুতীক্ষ্ণ পরিহাসের অস্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনই, আর একদিকে তাহাকে অতিশয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছেন; এজন্য তাহার পরিণামও যে পরম রমণীয় হইবে, এমন আশা করা যায়। এই বিরোধাভাসই গল্পটির প্রাণ। ইহার মধ্যে যে সত্যটি কৌতুক-কটাক্ষে উঁকি মারিতেছে, তাহাই কবিকল্পনার আবিষ্কার। সকল বাস্তবের এই রূপান্তরই তাহার সত্যকার রূপ, এই জন্যই সকল কাব্যই—is a very image of life expressed in its eternal truth.

৪

'অমিত রায়ে'র আত্মবিরোধের মধ্যে যে কৌতুকরস ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহা কি অনেকটা সজ্ঞান নহে? ইহার কারণ, কবি তাহাকে আপনারই সত্তায়

সন্ধান করিয়াছে। কবি যেন 'অমিত রায়' হইয়া এই নবত্বের উৎসাহে নিজেও মাতিয়া উঠিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে হাস্যকর absurdity আছে—রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে যে প্রকাণ্ড স্পর্দ্ধার বিলাস আছে, সেটা কবিরও আত্ম-দ্রোহ বটে। কবি যেন বিপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের খরশাণ শর যোজনা করিয়া আপনিই আপনাকে বিদ্ধ করিতেছেন, নবত্বের উন্মাদনাকে উপহাস করিতে করিতে আপনিও সেই উন্মাদনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সমগ্র রচনাটির রসকল্পনাই তাহার প্রমাণ বটে, কিন্তু তাহার চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যে দুইটি কবিতায় তিনি এই নবত্বের ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার প্রথমটিতে বিরোধের আভাস আছে, নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাটির মধ্যে যে পরিপূর্ণ সুরের আবেগ আছে—যে আশ্চর্য্য ছন্দের নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা খাঁটি subjective, অতিশয় personal ও sincere। 'অমিত রায়ে'র গান তিনি নিজের কণ্ঠে লইয়াছেন, এখানে আর এতটুকুও বিদ্রূপের আক্রু নাই।—

> নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ ;
> বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
> হঠাৎ কখন সন্ধ্যেবেলায়
> নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
> প্রভাতবেলায় হেলা ভরে করে
> অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
> উদ্ধত যত শাখার শিখরে
> রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ।

তাঁহার অন্তরের কবি-বাউলটি আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, যৌবনের নবত্ব-লালসায় কবির প্রাণ অসংবৃত হইয়া পড়িল। এই কবিতাটির মধ্যে তাঁহার নিজেরই সেই নর-দুর্ল্লভ যৌবন অতীত-জীবনের প্রান্ত হইতে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। পশ্চিমের অস্তরাগ যেমন পূর্ব্বাকাশে প্রতিফলিত হইয়া উষার স্মৃতি জাগাইয়া তোলে, এই কবিতাটিতে আমরা তেমনই করিয়া কবির সেই যৌবন-উষার আভাস পাইতেছি। পশ্চিম-আকাশে অস্তমিত-প্রায় রবি পূর্ব্বাকাশের স্বপ্ন দেখিতেছেন! কিন্তু উষার আর সে-রূপ নাই। এ উষায় কনক-চাঁপার কুঞ্জ' অথবা 'বনবীথিকায় কীর্ণ বকুল-পুঞ্জ' একটি অতি কোমল

শুভ্র রূপপ্রভায় চিরন্তনী কাব্যসুন্দরীকে বরণ করিতেছে না,—অতি স্নিগ্ধ মৃদু সৌরভে মুগ্ধ-হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছে না। আজিকার উষায় 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ' 'অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ' করিয়া রাগরক্ত নবত্বের জয়ধ্বজা তুলিয়াছে। ক্ষতি কি? কাব্যশ্রীর বধূজনোচিত ব্রীড়াকে যাহারা উপহাস করিতেছে, তাহারা যে যৌবনের আবেগেই আত্মহারা—মনের ঐশ্বর্য্য নয়, প্রাণের প্রাচুর্য্যই তাহাদের যৌবনধর্ম্ম। এই আবেগ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে যে ছন্দে উৎসারিত হইয়াছে, তাহা অর্থকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে,—পড়িবার সময়ে ছন্দের উন্মাদনাই যেন পাঠককে পাইয়া বসে, আর কোনদিকে মনঃসংযোগ করিতে ইচ্ছাই হয় না। এই একটি পদের ধ্বনি—'রডোডেনড্রন্‌গুচ্ছ'—শিরায় শিরায় স্পন্দিত হইয়া উঠে, ফিরিয়া ফিরিয়া কাণে বাজিতে থাকে—

'আমরা চকিত অভাবনীয়ের
কচিৎ কিরণে দীপ্ত।'

একদিন এমনি করিয়া কবির কাব্য পাঠ করিতাম। তখন অর্থ বুঝিতাম না, বুঝিতে চাহিতাম না—ছন্দের অপরূপ লীলাই প্রাণের মধ্যে উৎসব করিত, যৌবনের মোহ-মদিরায় হৃদিপাত্র উচ্ছল হইয়া উঠিত। সে কি কুহক, কি অভাবনীয় স্বপ্নসম্ভার! সে-ভাষা কি অর্থের অপেক্ষা রাখিত! সে যেন রূপময়! বাংলা কবিতার সেই প্রথম অপ্সরী-বেশ দেখিলাম—ছন্দ তাহার চরণে নূপুর হইয়া বাজিতেছে! রূপময় বলিতেছি এই জন্য যে, সে-ভাষা যেন নৃত্যপরা অপ্সরার মতই ছন্দের উপর ভর করিয়া স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের হিল্লোল তুলিত, যেখানে যেটুকু অর্থের আভাস দিত সে যেন সেই ছন্দেরই রূপানুবাদ। আজ প্রতি কবিতার মূল প্রেরণা বুঝি, স্বপ্ন ও সঙ্গীতের অন্তরালে কবি-হৃদয়ের যে রহস্যময় অনুভূতি রহিয়াছে তাহার অর্থ বুঝি; কিন্তু ভাষা ও ছন্দের যে কুহকে সদ্য-বিকশিত প্রাণপদ্ম থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত—আজ বিশ বৎসরের উজান ঠেলিয়া সেই যাদুস্পর্শটি একবার ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে আর পাই না। সেই 'কনকচাঁপার কুঞ্জ' এবং 'বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ' একটি

ঘনঘোর অভ্র-কুয়াসার মধ্য হইতে অভিসার-সঙ্কেত করিতেছে, কিন্তু সে পথ আর খুঁজিয়া পাই না। আজিকার দিনে সেই নবত্বের উন্মাদনা জাগাইবে 'রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ'! অদৃষ্টের পরম পরিহাসই বটে। তথাপি এই 'রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ'ই মুহূর্ত্তের জন্য সেই ছন্দটিকে ফিরাইয়া আনিয়াছে, মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের ভিতরে সেই সেকালের পুলক-নৃত্য জাগিয়াছে। তাই সব ভুলিয়াছি। সাহিত্যের বিচার-বচসা ভুলিয়াছি। 'দুই এক জন কলেজের অধ্যাপক' যাহা বলিতেছেন তাহা ভুলিয়াছি। এমন কি, নিবারণ চক্রবর্ত্তী ও অমিত রায়ের আসল কথাটিও ভুলিয়াছি। আজ আবার সেই সেকালের মতই কবিতা পড়িবার সময়—

হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

সাহিত্য-সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়

১

সাহিত্য এককালে সবদেশেই 'labour of love' ছিল; আমাদের দেশে এখনও কার্য্যতঃ তাহাই আছে। কিন্তু আজিকার দিনে এ ধরণের labour of love, বা প্রেমের দায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সাহিত্য-শ্রমীকে জীয়াইয়া রাখিবার পক্ষে এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত কোথাও দেখা যাইতেছে না। এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য সাহিত্য-ধর্ম্মের গ্লানি বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে।

যাঁহারা সাহিত্যিক তাঁহারা ব্যবসায়ী নহেন, সাহিত্যিক প্রতিভা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রায় এক সঙ্গে থাকে না। এজন্য বৈষয়িক ব্যাপারে সাহিত্যিক চিরদিনই পরমুখাপেক্ষী। অতএব, যেকালে অর্থনীতিই সকল নীতির উপরে, সেকালে সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা কতকটা ন্যায়বুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি ও সাহিত্যিক হিতাহিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইলে, সাহিত্যের অধঃপতন অনিবার্য্য। কিন্তু জাতির চরিত্রগত ব্যাধির ফলে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সেরূপ উন্নত হিসাব-বুদ্ধি বা দূরদৃষ্টির আশা এখনও দুরাশা মাত্র।

বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যাঁহারা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক এমন অনিবার্য্য হইয়া উঠে নাই। সাহিত্যের তখন মর্য্যাদা ছিল—বাজার ছিল না; সাহিত্যপ্রীতিই তখন সাহিত্যের একমাত্র মূল্য ছিল, অন্যবিধ মূল্যের প্রত্যাশা বড় ছিল না। এখন সমাজে literacy অনেক বাড়িয়াছে, বটতলাই এখন সাহিত্যের ভদ্রপল্লী—এমন কি ভট্টপল্লীকেও জুড়িয়া বসিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও আদর্শ অনেক নামিয়াছে, সব একাকার হইয়া গিয়াছে। ফলে, সাহিত্যের একটি বড়বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে—রীতিমত চাহিদা ও যোগানের পাল্লা চলিতেছে। ব্যবসায় জমিয়া উঠিয়াছে—উদরভরণের একটা নূতন উপায় মিলিয়াছে।

কিন্তু সাহিত্যের কামধেনুকে যে ভাবে দোহন করা হইতেছে, তাহাতে সে আর বাঁচে না; ইতিমধ্যেই ফুঁকা-দেওয়া সুরু হইয়াছে। সে দিকে ব্যবসায়ীদের

দৃকপাত নাই। চাহিদার অনুপাতে যোগান এত কম যে, খাঁটির কথা ভাবিলে চলে না; দুধের রংটা থাকিলেই হইল—শিশুদের দুধ চাই-ই; সাহিত্য-দুগ্ধ-লোলুপ শিশুর সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া চলিয়াছে, কাজেই কামধেনুও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন যে-কোনও ধেনু দিয়া কাজ চালাইতে হয়—যাহাকেই মাঠে পাওয়া যায় তাহাকেই দোহন করিতে হয়; খাইতে দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না, হইলে বোধ হয় ব্যবসায় চলিত না। বুড়াগরুকে ফুঁকা দিয়া এবং অপরগুলির দুধে জল মিশাইয়া কারবার চলিতেছে।

উপমা না হয় থাক। কিন্তু সাহিত্যিকদের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে খাঁটি সাহিত্যের ভরসা বড় কম। জীবিকার অভাবে ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করা দুষ্কর; কাগজের অপেক্ষাও কম দামে রচনা বিক্রয় করিতে হয়—প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে না পারিলে আধ-পেটাও মেলে না, স্ত্রী বেচিয়া অর্থোপার্জ্জনের মত কলালক্ষ্মীকে বেচিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয়। আজ তাঁহারা পণ্য-বিক্রেতার প্রসাদজীবী, তাহাতেও পেট ভরে না; পেট যদি ভরিত তাহাতে কতকটা সান্ত্বনা, এমন কি স্বাধীনতার সম্ভাবনা থাকিত।

যেদিন হইতে সাহিত্য জীবিকার বস্তু হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সাহিত্যিকের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে। যাঁহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ছিল—সরস্বতীর সুন্দরী ও সতী মূর্ত্তিকে রসপিপাসু পাঠকের সমক্ষে স্থাপন করা, উৎকৃষ্ট ভাব-চিন্তার জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করাই যাঁহাদের বিধিদত্ত অধিকার, তাঁহারাই আজ জনমনের পরিচর্য্যায় আত্মবিক্রয় করিতেছেন। গতযুগের সাহিত্যিকদের জীবনকাহিনী হইতে জানা যায় যে, সেকালে plain livingও যেমন সম্ভব ছিল, তেমনই, ভালো চাকুরীর উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বড় বড় সাহিত্যিকগণ ধর্ম্ম-সঙ্গত সাহিত্যসেবার অবসর পাইয়াছিলেন। এই তথ্য প্রণিধানযোগ্য; অবস্থা সেইরূপ না হইলে আধুনিক বাংলা-সাহিত্য এত শীঘ্র এমন ভাবে গড়িয়া উঠিত না। সত্য বটে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের সাক্ষাৎ যোগ ছিল না বলিয়া, সাহিত্যের আদর্শ কল্পনাপ্রধান হইতে পারিয়াছিল—অর্থাৎ তাহাতে বস্তুজগৎ অপেক্ষা ভাব-জগতের প্রসার অধিক ছিল; কিন্তু এরূপ না হইলে গদ্যে ও পদ্যে ভাষার এমন শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইত না; কারণ, রসপ্রেরণাই সেই যাদুশক্তি—যাহার

বলে রসনায় বাক্‌ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হয়, এবং মানুষী ভাষা দৈববাণীর মত বিদ্যুন্ময় হইয়া উঠে। সাহিত্যকলার আদি এবং শেষ—একাধারে সাহিত্যের দেহ, প্রাণ ও আত্মা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া থাকে—সেই বাণীকে মূর্ত্তিমতী করিবার সাধনাই মুখ্যতঃ সে যুগের সাধনা ছিল। সে সাহিত্যকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সাহিত্য, অথবা জীবন-সত্যহীন কাব্যবিলাস বলিয়া যাঁহারা কলরব করিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহাদের সাহিত্য-জ্ঞান প্রশংসনীয় নহে।

২

সাহিত্যের আদর্শ এক এক যুগে, জাতি ও সমাজের অবস্থা-অনুসারে, এক এক রূপ হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলিয়াই কোনও সাহিত্য মূল্য-হীন নহে। বরং, জাতি ও সমাজের অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া যদি এমন কোনও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা যায়, যাহা জাতির স্বধর্ম্মের প্রতিকূল—তবেই সাহিত্য পীড়িত হয়, সৃষ্টির পরিবর্ত্তে অনাসৃষ্টিই বাড়ে। বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের দুর্দ্দশা, ও সেই সঙ্গে সাহিত্যিকের জাতিনাশ—এই দুয়েরই কারণ কতকটা ইহাই। আজকাল সাহিত্যের আদর্শ লইয়া যে কোলাহল উঠিয়াছে—অভিজাত ও সৌখীন বলিয়া এক আদর্শকে অশ্রদ্ধা করিয়া, সত্য ও বাস্তব-জীবনের দোহাই দিয়া যে অপর আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে—তাহার মূলে আছে সাধারণের মনোরঞ্জন, যাহারা সিনেমা-গৃহের জনতা বৃদ্ধি করে তাহাদেরই দুষ্ট-ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন। শিক্ষিত, এমন কি উচ্চশিক্ষিত বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের রুচিও এতদপেক্ষা উন্নত নয়; তার কারণ, পাণ্ডিত্য ও রসবোধ এক পদার্থ নহে। জীবন-সত্য বা বাস্তব-রসতত্ত্বের দোহাই যাহারা দেয় তাহারা এই নিকৃষ্ট গণ-মনোবৃত্তির পরিচর্য্যা করে। ইহারই ফলে, আজ বাংলা-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে, সাহিত্য ও সাহিত্যসেবী উভয়কেই গ্রাস করিবার জন্য এক বিকট Frankenstein মুখ-ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে কল্পনা বা রসিকতা জনমনসুলভ তাহাই সাহিত্যের উপাদান নয়। যাহা সাহিত্যের পক্ষে জীবনীয়—সেই রসবস্তু আপামর সাধারণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে-রস কেবলমাত্র শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন সমাজের উপাদেয়, তাহাই একমাত্র রস না হইলেও—উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু, যাহা অশিক্ষিত ও দুঃস্থ জনগণের

পক্ষে সহজসেব্য তাহাই উৎকৃষ্ট না হইতে পারে, এমন কি, তাহা কোনও প্রকার রস না হওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, সাহিত্যে বাস্তব বা জীবন-সত্যের আদর্শই যে সত্য তাহার প্রমাণ এই নয় যে, তাহা অধিকাংশ পাঠকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে,—দুর্ব্বল অসহায় দেহ-মনের যত কিছু দুঃখ, গ্লানি ও লজ্জার জয়গান করে। আধুনিক সাহিত্যে ইহারই নাম জীবন-সত্যের আদর্শ; অতিশয় ক্ষুদ্র যাহা তাহাকেই একটা বৃহৎ নাম দিয়া সাহিত্য-সমালোচনায় যে ধাপ্পাবাজী চলিতেছে, তাহার ফল সবদিকেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

যে-দেশের জনগণ এখনও আর্টের পাঠশালায় ভর্ত্তি হয় নাই, যাহাদের রুচি ও রসবোধ তাহাদের জীবনেরই মত হীন, দুর্ব্বল ও পঙ্গু—বিদেশ হইতে আদর্শ ধার করিয়া এবং তাহার কদর্থ করিয়া, তাহাদের সেই মূর্খতা ও মূঢ়তাকেই প্রশ্রয় দেওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক, তাহা এখনও ভাবিয়া দেখিবার সময় যদি না আসিয়া থাকে, তবে সে সময় আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে এ জাতির পক্ষে যেমন এখনও Dictator-এর প্রয়োজন আছে, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রুচি ও রসবোধকে শোধন ও সংযমন করিবার জন্য, জন-মনোবৃত্তির উপরে অভিজাত-চিত্তের শাসন এখনও অত্যাবশ্যক। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথের যুগ এখনও শেষ হয় নাই—হইবার নহে। বিদেশ হইতে ধার-করা আধুনিকতার আদর্শ খাড়া করিয়া—বাস্তবতা বা জীবন-সত্যের দোহাই দিয়া, যাঁহারা জন-মনের পরিচর্য্যাকেই সাহিত্যের ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

অরসিককে রসিক বলিয়া সম্মান করার ফলে যাহা হইয়াছে তাহা এই। এক-কালে সাহিত্যপল্লীর একটি সংকীর্ণ গলির নাম ছিল বটতলা; এখন পল্লী বাড়িয়া সহর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলিটিও সাহিত্যের সেণ্ট্রাল এভেনিউ হইয়াছে; এখন আর তাহা মাত্র বটতলা নয়—মাহেশের রথতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে আর ইতর-ভদ্র নাই, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নাই,—একবেলা আমোদ উপভোগের জন্য সকলেই একদলভুক্ত হইয়াছে। দোকানীরা নগদ বিক্রয় করিয়া খুচরা লাভকে যথালাভ মনে করিতেছে। মাল দুই ঘণ্টা পরেই বাসি হইয়া যাইবে তাহা জানে, তাই ক্রমাগত চুল্লীর উপর নূতন কড়াই চাপাইতেছে; যাহা বাসি হইতেছে তাহাতে কুকুরেও আর মুখ দেয় না। পাঁচ বৎসর আগে ছাপা বহি এ বৎসরে আর কাটে

না। এই রথতলার মাল-সরবরাহের ভার লইয়াছেন আধুনিক 'ভুখা' লেখকগণ। কিন্তু তাহাতে পেট ভরে না। পুস্তকবিক্রেতাদের সঙ্গে গ্রন্থলেখকদের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহা অনেকটা বাড়ীউলী আর রূপজীবিনীর মত! বহি যেমন হোক, তাহার ভিতরে যাহাই থাক, বাহিরের চেহারাটা চটকদার হইলেই হইল; খরচ যা-কিছু ঐ জন্যই, অন্য খরচ বিশেষ কিছুই নাই। তার উপর যদি খানকতক বেশ একটু suggestive রকমের রঙীন ছবি—বারান্দা-বাসিনী উর্ব্বশীর 'অকুন্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা' মূর্ত্তি জুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ত' সোনায় সোহাগা! এইরূপ ছবি-দেওয়া কবিতার বই—নারীদেহের কোন একটি অঙ্গের অনাবৃত শোভায় আগা-গোড়া চিত্রিত অনুবাদ-কাব্য—প্রকাশ করা খ্যাতনামা প্রকাশকদিগের একটা কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরস্পরে পাল্লা দেওয়া চলিতেছে। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মনাশের উপরে এই ব্যবসায় নির্ভর করিয়া আছে, তাহারা ভাল করিয়া খাইতেও পায় না; তাহাদের কালিমা-বেষ্টিত চক্ষে অস্বাভাবিক জ্বালা, গণ্ডে ও ওষ্ঠে জ্বর-জনিত রক্তিমাভা!

পুস্তকপ্রকাশক ও পুস্তকপ্রণেতার সম্বন্ধ যেমন ধর্ম্মসঙ্গত বা সাহিত্যের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, পত্রিকা-ব্যবসায়ীদের ধর্ম্মজ্ঞান তদপেক্ষা উন্নত নয়। এই ব্যবসায় এখনও তেমন লাভজনক হইয়া উঠে নাই—অধিকাংশই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যে কয়খানি পত্রিকা সচল তাহাদের পশ্চাতে অন্যবিধ ব্যবসায়ের পৃষ্ঠবল আছে। এরূপ পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশী নয়; তথাপি সাহিত্য-প্রচারের শক্তি ইহাদেরই আছে। বিজ্ঞাপন যোগাড় করিয়া তাহারই আয়ে সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে কোনও প্রকারে খানকয়েক ছোট অথবা বড় পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়া বেকার অবস্থা দূর করিবার চেষ্টা আজকাল সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে—এইরূপ পত্রিকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বড় কাগজগুলি প্রায় সম্পাদকবিহীন—স্বত্বাধিকারী, অর্থাৎ ব্যবসায়ী দোকানদারই ইহাদের কর্ণধার। সাহিত্যকে ইহারা খোলাখুলি অবজ্ঞার চক্ষে দেখে; ইহারা সাহিত্যের জমীদার—লেখকগণ ইহাদের প্রজা, নিতান্তই কৃপার পাত্র। পত্রিকার অধিকাংশ সেই সকল লেখকের রচনা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়া থাকে, যাহারা লেখা ছাপা হইলেই কৃতার্থ বোধ করে। গরম চানাচুরের মত গল্প যাহারা লেখে তাহারা কিছু কিছু বকশিস পায়। দুই চারিটা খুব ভারি প্রবন্ধ ওইরূপ গল্পের সঙ্গে হজমী-গুলির মত বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

ইহাতেই সম্পাদনার চূড়ান্ত হইয়া যায়। ইহাই এই সকল পত্রিকা-পরিচালনার সাধারণ-পলিসি—ব্যতিক্রম যে নাই তাহা বলিতেছি না।

কিন্তু ক্ষণজীবী পত্রিকার সংখ্যাই বেশী। ইহাতে ছাপাখানা কাগজব্যবসায়ী ও দপ্তরী কিছু পাইয়া থাকে—লেখক ত' নহেই; যাহারা প্রকাশক তাহারা তাহাদের সখ বা দুর্ব্বুদ্ধির দণ্ড দিয়া শেষে সরিয়া পড়ে। অর্দ্ধ-শিক্ষিত সাহিত্য-ব্যাধি-গ্রস্ত ছোকরার দলই এই সকল পত্রিকার জন্য দায়ী। এই ব্যাধির বিস্তার যেমন হইতেছে, তেমনই পত্রিকা-সংখ্যা বাড়িতেছে—এরূপ পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ হইবে না দেখা যাইতেছে। এক দলের পর আর একদল ক্রমাগত স্থান পূরণ ও জঞ্জাল বৃদ্ধি করিতেছে। সাহিত্যিক হওয়া এতই সহজ, এবং ছাপাখানা এত বাড়িয়াছে—যে, এই ধরণের প্রলোভন অনেকটা বাঙ্গালীর ছেলের বিবাহ-করার প্রলোভনের মতই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষণজীবী পত্রিকা দ্বারা পত্রিকা-ব্যবসায়ীদের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা, এবং হইতেছেও,—এই রূপ সাহিত্যচর্চ্চার ফলে, আজিকার বাজারের উপযুক্ত চলনসই লেখা অনেকের অভ্যস্ত হইতেছে; ইহারাই কিছুদিন পরে স্থায়ী পত্রিকাগুলির বিনামূল্যে লেখক হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে।

পুস্তক-প্রকাশকের কথা বলিয়াছি—পত্রিকা-ব্যবসায়ীর কথাও সংক্ষেপে বলিলাম। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়িগণ সাময়িক সাহিত্যের অধোগতির জন্য অধিকতর দায়ী। নিকৃষ্ট লেখকদের প্রশ্রয় দিয়া সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিবার শক্তি যেমন ইহাদের আছে, তেমনই, সুলেখক ও প্রতিভাবান নবীন সাহিত্যিকদিগকে আদর করিয়া এবং তাঁহাদের রচনার যথাযোগ্য মূল্য দিয়া, সাহিত্যসাধনায় সাহায্য করিবার—এবং সেই সঙ্গে জাতির মনোজীবন উন্নত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। কিন্তু ধান চাল পাটের ব্যবসায়েও যেটুকু দেনাপাওনার ধর্ম্মবুদ্ধি আবশ্যক, এই ব্যবসায়ে সেটুকুরও প্রয়োজন নাই। কারণ, যাহারা সাহিত্যের ক্রেতা তাহাদের মাপিয়া লইবার মাপকাঠি, অথবা ওজন করিয়া দেখিবার বাটখারা নাই। 'এ ব্যবসায় শৌণ্ডিকের ব্যবসায় অপেক্ষাও নিরাপদ; কারণ, সেখানে খরিদদার মাতাল হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ প্রথম বোতলের হিসাব রাখে। এখানে গোড়া হইতেই রসোন্মাদ! পাঠক-পাঠিকার বয়স, বিদ্যাবুদ্ধি ও রসজ্ঞান, এই তিনের অন্ততঃ একটাও ঠকাইবার পক্ষে যথেষ্ট। দুই চারি-

খানি ছবি, কিছু ছড়া, ও গোটা কয়েক রসালো গল্প হইলেই হইল; তার উপর কাগজখানা যদি একটু মোটা, এবং নিয়মমত প্রকাশিত হয়, তবে আর কোনও বালাই নাই। পত্রিকা-সম্পাদনের ইহাই বাহাদুরী—ইহার অধিক বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেই মাটী। ব্যবসায় বেশ চলিতেছে; মাছের তেলে মাছ ভাজা হইতেছে—সিদ্ধির কুল্‌পী, অথচ আবগারী আইনের ভয় নাই।

৩

সাহিত্যের ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহার উত্তরে বলা যায়, ইহার জন্য ব্যবসায়ীরা দায়ী নহে, দায়ী শিক্ষিত সমাজ ও লেখকেরা। সাহিত্যের ব্যবসায়ে যদি সাহিত্য বাদ পড়িয়া কেবল ব্যবসায়টাই লক্ষ্য হয়, তবে তাহার কারণ—ব্যবসায় ও সাহিত্য এই দুইটা পরস্পরের দাবী রক্ষা করিয়া চলিবার মত সময় আমাদের দেশে এখনও আসে নাই; তাই বলিয়া ব্যবসায়ের পথ বন্ধ থাকিতে পারে না—সেজন্য অভিযোগ করা নিষ্ফল। লেখকদের আদর্শ ও সাধারণের রুচি যদি এমনই অধঃপতিত হয়, তবে সাহিত্যের ব্যবসায়ে ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজন হইবে কেন? সাহিত্যের ব্যবসায় যদি বন্ধ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলেই কি রুচি ও রসবোধ উন্নত হইত? প্রকাশ ও প্রচার অনিবার্য্য, বিশেষত আজিকার এই সস্তা ছাপাখানার যুগে। বটতলা চিরদিন আছে ও থাকিবে; আজ যে বটতলাই সাহিত্যের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তার জন্য দায়ী কাহারা? তা'ছাড়া, যাহা কিছু পণ্য হইবার উপযোগী তাহার ব্যবসায়ী জুটিবেই। ব্যবসায়ে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বলিয়া পণ্যের কোনও জাতি নাই—সকল বস্তুরই চাহিদা আছে; অতএব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিছুই অগ্রাহ্য হইতে পারে না। সাহিত্যও পণ্যহিসাবে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না—অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া পণ্যতালিকার বহির্ভূত হইতে পারে না। যাহাকে নিকৃষ্ট সাহিত্য বলা যায় তাহার ব্যবসায় কোন্ দেশে নাই? ব্যবসায়ীর দোষ কি?

আমিও সে কথা মানি। তথাপি, মনে হয়, সাহিত্যের ব্যবসায়ে শিক্ষিত ধর্ম্মবুদ্ধির প্রয়োজন আছে; এ ব্যবসায় একটু স্বতন্ত্র। কবিরাজী ঔষধের দোকান খুলিয়া যে কেবল মোদক বিক্রয় করে সে যেমন কবিরাজী ব্যবসায়কেই লোকের চক্ষে হীন করিয়া তোলে—ঔষধের পরিবর্ত্তে নেশার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া

মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; তেমনই, সাহিত্যের ব্যবসায় করিতে বসিয়া যাহারা সস্তা দামে, সুদৃশ্য মলাটে মুড়িয়া, বটতলারও অপাংক্তেয় উঞ্ছ সামগ্রী বিক্রয় করে, তাহারা ব্যবসায়ের নীতিকেও লঙ্ঘন করে। ইহারা যে সাধু ও শিক্ষিত, এক কথায় respectable, এবং যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই যে ইহারা সরবরাহ করে,—এমন একটা প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য যাহা-কিছু দরকার, তাহার আয়োজন ইহারা করিয়া থাকে; একই মার্কা দিয়া খাঁটির সঙ্গে বহুল পরিমাণে ভেজাল চালাইয়া থাকে। আমাদের সাহিত্য আছে, সমালোচনা নাই—দর ঠিক করিয়া দিবার জন্য কোনও ব্যবস্থাপক মণ্ডলী নাই; বরং, সমালোচনার মালিকও ইহারাই—সমালোচনী-পত্রিকাও এই সব ব্যবসাদারের করতলগত। সুবিধা ও সুযোগ থাকিলে, ইহাও বোধ হয় সাংসারিক রীতি বা ব্যবসায়-নীতির বিরোধী নয়। যেখানে বাধ্যতা নাই, সেখানে ধর্ম্মবুদ্ধি থাকিবে কেন? জনমত যেখানে উদাসীন, সেখানে সর্ব্ববিধ দুর্নীতির উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু সুস্থ জনমতও সৃষ্টি করা যায়—সাহিত্যের ব্যবসায়ী যাহারা তাহারাও একাজ করিতে পারে; তাহাদেরও দায়িত্ব আছে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত জাতীয়-চরিত্রের কথাই ভাবিতে হয়, দেশের শিক্ষিত সমাজকে স্বীকার করিতেই হয়—"দোষ কারও নয় মা শ্যামা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।"

এখন উপায় কি? সাহিত্যের ব্যবসায় চলিবেই; ছোট ছোট দোকান-গুলিতে সাহিত্যের বাজার ভরিয়া যাইবে; ক্রেতার অভাব হইবে না। আর কেহ লাভবান না হইলেও কাগজওয়ালা, ছাপাখানা ও দপ্তরী—আধুনিক সাহিত্যের এই তিন প্রধান স্রষ্টা—কিছু করিয়া লইবেই। কিন্তু সাহিত্যসেবার কি হইবে? যাঁহারা সরস্বতীর আহ্বান সত্যই হৃদয়ের মধ্যে পাইয়াছেন—তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহাদের সাধনাকে জীয়াইয়া রাখিবেন? আমাদের দেশে যে-সাহিত্যকে লইয়া ব্যবসায় চলিতেছে তাহা সাহিত্য-নামের যোগ্য নয়; তার কারণ, পয়সা খরচ করিয়া সাহিত্য পড়িবার মত ব্যক্তি আমাদের দেশে খুব বেশী নাই। কবিতার লেখক আছে—পাঠক নাই; গল্প ও উপন্যাস ছাড়া অন্য কোনও উচ্চাঙ্গের রচনা পছন্দ করিবার মত রুচি, কিম্বা হজম করিবার মত বোধশক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের মুখাপেক্ষা করেন না। আসল কথা, লিখিতে পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র,

এবং তাহাতে সংবাদপত্র-জাতীয় সাহিত্যের এতটা কাটৃতি হইয়াছে যে, ব্যবসায় চলিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ব্যবসায় চলিবার মত অবস্থা এখনও হয় নাই—যদি হইত, তবে পুস্তকবিক্রেতা ও পত্রিকা-ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়-বুদ্ধিকে আরও উদার, এবং ধর্ম্মবুদ্ধিকে আরও সজাগ রাখিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

৪

এ অবস্থায়, সাহিত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে হইলে, সাহিত্যসেবীকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। যাঁহারা সত্যকার সাহিত্যিক, যাঁহাদের শক্তি ও সাধনা আছে, তাঁহাদিগকে এখনও কিছুকাল একক অসহায়ভাবে তপস্যা করিতে হইবে। এখনও প্রতিদান বা পুরস্কার আশা করিবার সময় আসে নাই—সাহিত্যজীবী না হইয়া সাহিত্য-সেবী হইতে হইবে। বিদেশের ভদ্র ও উন্নত সাহিত্যিক জীবন দেখিয়া লোভ করিলে কি হইবে? তাহাদের মত সাহিত্য-সেবার মূল্য দাবী করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। এদেশে এক্ষণে সাহিত্য ও জীবিকা দুইই একসঙ্গে চলিবে না—ইহা নিশ্চিত। যাহারা দাম দিবে তাহারা সাহিত্য চায় না; কাজেই দাম চাহিলে তাহাদের ফরমায়েস মত, 'রস'-নামে যে আর এক বস্তু আছে তাহাই প্রস্তুত করিতে হইবে। 'ভুখা-ভগবান'কেই সাহিত্য-দেবতা বলিয়া প্রচার করিতে হইবে—মানুষের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া সকলকে স্বদলে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে; নহিলে, সাহিত্য না বাঁচুক, জীবিকার উপায় হইবে না।

কিন্তু বিপদ এই যে, তাহাতেও পেট ভরে না। ধর্ম্ম ত নহেই, অর্থও তাহাতে নাই—আছে কেবল কাম; এবং তাহাতেই শেষে মৃত্যুরূপ মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে। প্রতি মাসে দশটা গল্প ও দুইখানি উপন্যাস লিখিতে পারিলেও সিগারেট-খরচা জুটিবে কিনা সন্দেহ। তাই মাসের পর মাস যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে রক্তমুখে সাহিত্যের সঙ্গে জীবিকার পাল্লা চলিয়াছে! স্কুল কলেজে পড়িবার সময় যেটা ছিল সখ, এখন তাহাই প্রাণের দায় হইয়া উঠিয়াছে। যেটুকু শক্তি বা প্রতিভার আভাস এককালে ছিল, খেয়াল-খুসীর অনাচারে ও মিথ্যা-অভিমানের স্বেচ্ছাচারে তাহাকে নষ্ট করিয়া, আলোকের পরিবর্ত্তে আগুনের ফুল্‌কি ছিটাইয়া, এখন যাহারা চিতাগ্নির বেড়াজালে বেষ্টিত হইয়াছে

তাহারা আর কি করিবে? সাহিত্যধর্ম্মকে যাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহাদের জাতিও গিয়াছে, অন্নও জোটে না। আত্ম-প্রবঞ্চনার চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা নাই; সারস্বত সাধনায় সে প্রবঞ্চনার ফল আরও ভীষণ। যদি এতটুকুও সাহিত্যিক বিবেক এত অনাচারের মধ্যে এখনও বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার দংশন-জ্বালা আরও অসহ্য। এই দন্তচক্রময় জীবিকাযন্ত্রের পেষণে মহাপ্রাণী আর্ত্তনাদ করে, নিজের কাছে ফাঁকি চলে না। মূর্খ জনসাধারণকে দুই দণ্ডের আমোদ যোগাইবার জন্য ব্যবসায়ের যূপকাষ্ঠে জানিয়া শুনিয়া আত্মবলিদান করিতে হয়; অতি তুচ্ছ ও ক্ষণজীবী সাহিত্য-জঞ্জাল বৃদ্ধি করিয়া মুখে যতই আত্মগৌরব প্রকাশ করুক না কেন, অন্তর নিশ্চয়ই কাঁদে। যাঁহারা এককালে ভাল গল্প লিখিতেন, তাঁহাদের সে শক্তি আর নাই; যাঁহারা হয়ত ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর গল্প-উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়াছেন। শক্তির এই অপব্যবহার এবং প্রতিভার এই স্বধর্ম্মত্যাগে কার না দুঃখ হয়? আত্মপ্রসাদ বা আত্মতৃপ্তির উপায়ও আর থাকে না; জিজ্ঞাসা করিলে সেই এক কথা—"কি করি, জীবিকাসংগ্রহের জন্য আত্মবিক্রয় করিতে হয়।"

যাঁহারা এখনও আধুনিক সাহিত্য-জীবিকার এই কুম্ভীপাকে পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে সর্ব্বশেষে দুই চারি কথা বলিয়া আমি এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আমাদের জাতীয় দুরবস্থা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, জীবিকা আরও দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জীবিকার অনেক পথ এখনও পড়িয়া আছে—দুইটি অন্ন খুঁটিয়া লইবার জন্য শক্তি ও বুদ্ধিকে হয়ত আরও বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে, অনেক রকমের অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, জীবিকার সন্ধানে জীবনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিতে হইবে। কিন্তু সে-পথ সাহিত্য-সেবার পথ নয়; অন্ততঃ এদেশে এখনও সে পথ প্রস্তুত হয় নাই। যাঁহারা নিতান্তই সাহিত্যের সেবা ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যেন—জীবিকার জন্য সাহিত্য নয়—সাহিত্যের জন্য জীবিকা নির্ব্বাচন করেন; যদি দুইই এক সঙ্গে না চলে, এবং নিজেকে বলি দিয়া সাহিত্যকে বাঁচাইবার শক্তি না থাকে, তবে সাহিত্যকেই বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা যেন জীবিকার উপায় করেন। দুঃখ করিয়া ফল নাই—ইহাই পুরুষোচিত কাজ। যদি সাহিত্যসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়—সেও ভাল, তথাপি এরূপ অবস্থায় সাহিত্যকে জীবিকা

করিলে সাহিত্যের কি সেবা করা হইবে? বরং এমন সেবা না করিলেই সাহিত্যের কল্যাণ হইবে, সৃষ্টি করিতে না পারিলেও—সাহিত্যের আদর্শ-রক্ষায় গৌণভাবেও সাহায্য করা সম্ভব হইবে। আজিকার দুর্দ্দিনে ইহাও একরূপ সাহিত্যধর্ম্মপালন; কীর্ত্তির গৌরবই একমাত্র গৌরব নয়—অপকীর্ত্তি হইতে আত্মদমন করাও কম কীর্ত্তিকর নহে। অতএব যদি দুঃখ, দুর্গতি ও দারিদ্র্য, উপেক্ষা ও অনাদর সহ্য করিয়া সাহিত্যব্রত উদ্‌যাপন করা সকলের সাধ্যায়ত্ত না হয়, সরস্বতীর সেই অভিশাপ-বর বহন করিবার সামর্থ্য সকলের না থাকে—দেবী যদি সেবা চান, অথচ জীবনযাত্রা তাহার অনুকূল না হয়—তবে, মহাকবির সেই অতি-সত্য বাক্য স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হইবে—"Those also serve who only stand and wait"।

সাহিত্য ও যুগধর্ম্ম

১

জগতে একটা যুগান্তর চলিয়াছে, একথা আমরা সকলে জানি। আমাদের দেশেও সেই যুগান্তরের হাওয়া ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এই তথ্য আমরা প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিতেছি। ব্যাপারটা কিছু আকস্মিক বলিয়া মনে হইলেও, ইহার সূচনা হইয়াছে অনেক আগে,—যেদিন রাজশক্তির মারফতে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা পাকা হইয়া গেল। সেই প্রথম ধাক্কাটা আমরা অনেক দিক দিয়া সহিয়া লইতে পারিয়াছিলাম; উনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও নানা সংস্কারের সঙ্গে য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারার একটা আপোস করিয়া মনের ও প্রাণের উপর-তলাটায় নির্ব্বিঘ্নে আত্মপ্রসাদ উপভোগের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সব জায়গায় কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া লইয়া—কোথাও দাগরাজী কোথাও বা চুণকাম, কোথাও বড়জোর এক-আধটা খিলান বদলাইয়া—প্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভিত নড়িতে আরম্ভ হইল; তারপর গত দশ-পনের বৎসর যাবৎ ব্যাপারটা এমন বেমানান হইয়া উঠিয়াছে যে, হালে আর পানি পাওয়া যায় না; এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ভয় ভাবনা করিয়া আর ফল নাই, 'যাহা হইবার—হইবে' মনে করিয়া প্রবল স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া চলিয়াছি। রাষ্ট্র বা সমাজের কথা বলিবার অধিকারী আমি নহি, কিন্তু সাহিত্যে এই যুগধর্ম্ম যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার সম্বন্ধে, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহাই বলিব।

কোন সাহিত্যই দেশকালের প্রভাববর্জ্জিত নয়। সাহিত্যের জন্ম হয় দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যে, সেইখান হইতেই তাহার শিকড়গুলি রস সঞ্চয় করে; ফুল মাটির উপরে, এমন কি বহু উচ্চে পৃথক বৃন্তে ফুটিয়া ওঠে বটে, কিন্তু সকল জাগতিক সৃষ্টির মত তাহার বিকাশ হয় পাঞ্চভৌতিক নিয়মে। তারপর সেই

বিকাশের চরম ভঙ্গীটি দেখিয়া তাহার মূল্য-নিরূপণ হয়। তখন রসিক ব্যক্তিরা তাহার সৌন্দর্য্য-রসটুকুরই বিচার করেন, এবং সেই রস-রূপটিই তাহার একমাত্র সার্থক লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন। এই বিচার যথার্থ, ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু তথাপি, দেশকাল এবং জাতি বা সমাজবিশেষের সম্পর্ক তাহার ক্ষয়-বৃদ্ধির মূলে—প্রচ্ছন্ন থাকিলেও বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়াই আছে; নির্ব্বিশেষ রসের বিচারে তাহাকে বাদ দিলেও, তাহার উৎপত্তি ও বিকাশধর্ম্মের সঙ্গে এই সকলের একটি নিবিড় যোগ আছে; রসিক-সমাজের রত্নাগারে স্থান পাইবার পূর্ব্বে সাহিত্যকে তাহার কারখানা বা রসশালায় একটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিতে হয়। এই কার্য্যকারণতত্ত্ব সাহিত্যের পক্ষেও সমান বলবৎ—জগতের কোন কিছুই স্বয়ম্ভূ বা ভুঁইফোঁড় নহে।

এই কথাটি মনে রাখিয়া আমি বর্ত্তমান যুগের বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিতে চাই। এই আলোচনার একদিকে সাহিত্যের শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন আদর্শকেও স্বীকার করিব, আবার তাহার সৃষ্টি ও বিকাশের অন্তরালে যে যুগধর্ম্মের অমোঘ নিয়ম বর্ত্তমান, তাহাকেও অস্বীকার করিব না। বরং, যে-সাহিত্য প্রত্যক্ষ যুগসাহিত্য, যাহার বর্ত্তমানটাই প্রকট—ভবিষ্যৎ পরিণতি এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহার বিচারে ওই শেষ দিকের আলোচনাই বিশেষ আবশ্যক। এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না যে, বর্ত্তমান যুগে আমরা যে-সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা এখনও খুবই কাঁচা; তাহাতে যেটুকু রং ধরিয়াছে, তাহা রৌদ্রপক্কের রং। এ সাহিত্য এখনও সাহিত্যহিসাবে আলোচনার যোগ্য হয় নাই বটে, তথাপি ইহার মধ্যে এমন একটি প্রবৃত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যাহাকে, আর কিছু না হোক, একটা নূতনতর কালের ইঙ্গিত বলিয়া মনে করা অন্যায় নয়। এই সকল লক্ষণ হয়ত খুব বাহ্যিক ও ক্ষণিক, হয়ত অল্পকালের মধ্যেই গভীর-তর স্থায়ী লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িবে—তথাপি, ইহাকে আর উপেক্ষা করা যায় না। ইতিমধ্যেই এইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য-সমাজের নানা পাড়ায় নানা রকমের দুর্দ্দান্ত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, এবং সেই আলোচনায় সাহিত্যের নিত্যস্বরূপ সম্বন্ধে নিদারুণ সংশয়ের সৃষ্টি হইতেছে। একটি ঘূর্ণী-পাকের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকিলে কোন কল্যাণই হইবে না; সৃষ্টির চেয়ে

অনাসৃষ্টিই বাড়িয়া যাইবে, এবং যে যুগান্তর অনিবার্য্য তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে গিয়া মিছামিছি শক্তিক্ষয় করা হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি 'নব্যভারত'-পত্রিকায় 'আধুনিক-সাহিত্য' নাম দিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেগুলিতে একটি কথা আমি খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এই যে, বাংলাসাহিত্যে একটা যুগের অবসান হইয়াছে, ইংরাজী আমলের প্রথম যুগের যে সাহিত্য তাহার প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; সে ছিল চিত্ত-চমৎকার ও কল্পনা-বিলাসের যুগ। সে যুগে আমরা লাভ করিয়াছি—এক অভিনব সাহিত্যকলা, কাব্যসৃষ্টির উন্নত আদর্শ, ও তাহার উপযোগী ভাষা। সে যুগের যাহা সত্যকার প্রেরণা ছিল তাহার ফসলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়াছে। বর্ত্তমানে সে প্রবৃত্তি ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া একটা নূতনতর চেতনার সংঘর্ষে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে; এবং একটা নূতন ভাব-সত্যকে আশ্রয় করিবার জন্য আজিকার সাহিত্যবুদ্ধি অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই নূতন ভাব-সত্য যে কি তাহা আমি 'নব্যভারতের' প্রবন্ধে বিশদভাবে বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এইখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না; আশা করি, বর্ত্তমান আলোচনায় তাহা স্বতঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সেকালে, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আক্রমণে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মুখ্যতঃ ভাবপ্রধান। সর্ব্বত্র একটা আদর্শ-নির্ণয়ের ব্যাকুলতা, নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সামঞ্জস্য-চেষ্টা, এবং নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আত্মসম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার অসীম আগ্রহ—ইহাই ছিল সে যুগের প্রধান প্রবৃত্তি। সে যুগে বাস্তব জীবন অনেকটা স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত ছিল—জীব-জীবনের গভীরতম চেতনা, নিপীড়িত প্রাণধর্ম্মের আর্ত্তনাদ, দেহ-দুঃখ,—এ সকল সেদিন এমন জাগিয়া উঠে নাই। তাই সে-যুগের প্রতিভা ও মনীষা শাশ্বত সত্য-সুন্দরের মন্দির গড়িতেই ব্যস্ত ছিল, পদ-নিম্নের মৃত্তিকা এবং নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও বাস্তব দেহটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার প্রয়োজন সেদিন হয় নাই। কিন্তু সহসা যুগান্তর উপস্থিত হইল, নানা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা-পরম্পরায় জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশও শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল; রস আর বাহিরে কোথাও রহিল না, নিজের বাস্তব দেহমনকে নিংড়াইয়া যতটুকু পাওয়া যায় তাহাও তিক্ত ও বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে,—দেহ সাড়া দিয়াছে, কিন্তু সে

দেহ অতিশয় দুর্ব্বল ও রুগ্ন। তাহার ফলে আজিকার সাহিত্যের যে রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

২

যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের পরিবর্ত্তন হইবে—ইহা স্বাভাবিক। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে যাহা সত্য, তাহাকে অবহেলা করিলে সাহিত্য-প্রেরণা মিথ্যা হইয়া যায়। যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, তিনি দেশকালকে উপেক্ষা করিয়া যত বড় কল্পনাকেই আশ্রয় করুন না কেন, তাহা জীবন্ত বা প্রাণময় হইবে না। সত্যকে আমরা দেশকালের প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেই উপলব্ধি করি—সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রতিভার শক্তি-বলে শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের রূপটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গত-যুগে তাহাকে যে-ভাবে এবং যে-রূপে ধারণা করিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আর তাহাকে ঠিক তেমন ভাবে সন্ধান করিতে গেলে তাহার নাগাল পাইব না, সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিল নাই—তাই সে যুগের সাধনমন্ত্র এ যুগে অচল। যাঁহারা সাহিত্যের সম্পর্কে এই যুগধর্ম্মকে স্বীকার করেন না, তাঁহারা একালের এই আদর্শ-বিপর্য্যয়, চিত্ত-বিক্ষেপ ও দ্বন্দ্ব-সংশয়ের মধ্যে দিশাহারা হইবেন—যাঁহারা রসিক তাঁহারাও নূতন পানপাত্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন, কারণ, অভ্যাস জিনিষটি রসিকের পক্ষেও সমান অন্তরায়—রসিকও যে মানুষ।

আমি এই যুগধর্ম্ম মানি। কিন্তু এই নবযুগের প্রারম্ভেই সাহিত্যের অঙ্কুহাতে যাহা সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে আশান্বিত হইতে পারি নাই, বরং যথেষ্ট শঙ্কিত হইতেছি। একথা আমিও বুঝি যে, এই নব্য-সাহিত্য সবেমাত্র জন্ম লাভ করিয়াছে, ইহা সাবালক হইতে এখনও অনেক দেরী। এ যাবৎ এই সাহিত্য-রচনায় যে প্রবৃত্তি প্রকট হইয়াছে, তাহাতে কোন ধর্ম্মেরই লক্ষণ নাই; এখনও তাহা সজ্ঞান সপ্রতিভ নয়; এখনও তাহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী, form বা রূপ, নির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে নাই। কেবল একটা বালসুলভ উত্তেজনা ও অস্ফুট ভাব-বিদ্রোহ ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। তাহাতেও বালকোচিত স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। এই আধুনিক সাহিত্য-কর্ম্মিগণ 'তরুণ', 'সবুজ'

বলিয়া আপনাদিগের নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তারুণ্য ও চির-হরিতের যে গূঢ় ও সত্য অর্থ আছে সে অর্থে তাঁহারা এই পদবীর উপযুক্ত নহেন; বরং তাঁহাদের কীর্ত্তির তুলনায়, ওই শব্দদুইটির অর্থ একটু হাস্যকর হইয়া পড়ে। যদি বয়সের নবীনত্ব বা দেহের যৌবনই একমাত্র দাবী হয়, তবে সেই দাবী পশু-পক্ষীরও আছে, এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বজীবেরই একটা কচি ও কাঁচা অবস্থা থাকে। যদি ওই তারুণ্যটুকুই একমাত্র সম্বল হয়, তবে তাহা হইতে অন্ততঃ সাহিত্যের সৃষ্টিশালায় তাঁহাদের নিকট হইতে বেশী কিছু আশা করা যায় না। যৌবনই বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ, জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির অনুকূল; কিন্তু যে যৌবন বিশ্বগ্রাস করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে না, যাহার সাধনা বা তপস্যা নাই, যে-যৌবন সত্যের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে না—দুঃখ যাহার বিলাসমাত্র, সুলভ-মতবাদ ও সহজপাঠ্য নিকৃষ্ট সাহিত্য যাহার কৃত্রিম কল্পনার আশ্রয়, অতিশয় অলস ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ভাবোন্মাদ এবং কালি-কলমই যাহার সাহিত্য-রচনার একমাত্র উপকরণ—সেই যৌবন সাহিত্যের কোন্ কাজে লাগিবে? সবুজ রংটি খুব সুন্দর, তাহার সঙ্গে যে সকল ভাব মনে আসে তাহাও উপাদেয়; কিন্তু পুকুরের পানাও ত সবুজ, কোন কোন সাপের রং সবুজ—সবুজ বলিয়া গর্ব্ব করিবার সময়ে এই কথাটিও মনে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ তরুণ বলিয়া বা সবুজ বলিয়া প্রবীণদের সঙ্গে ঝগড়া করিলেই সাহিত্যের উপকার হইবে না। তারুণ্য বা adolescence জীবধর্ম্ম বটে, তাহার সঙ্গে সাহিত্য-প্রতিভার কোন সুনিশ্চিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, নূতনকে বরণ করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই; বরং পুরাতনের আসন টলিয়াছে, এবং সেই আসনে নূতনের আবির্ভাব যে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—এ বিশ্বাস আমি করি। যাহার প্রতিষ্ঠার লক্ষণ এখনও দেখিতে পাইতেছি না, তাহার সূচনা লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়াই আজ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি সাহিত্য-কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার নই, ঢিলা পায়জামাধারী সিগারদংশী অভিজাত-সাহিত্যের dilettante-ও আমি নহি। সাহিত্য-বৃক্ষের মূল হইতে তাহার শাখার ফুলটি পর্য্যন্ত সমস্ত বিকাশধারাকে আমি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি; বরং ওই শিকড়গুলিকেই খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার আগ্রহ আমার আছে—কেবলমাত্র ফুলের

ঘ্রাণ লইয়া গাছটাকে অবহেলা করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। তাই রসবিচারে Aesthetics-এর বা রসশাস্ত্রের দাবীও যেমন মানি, তেমনই সেই রসসৃষ্টির গভীর রসাতলের সন্ধানও রাখিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, এই ভবিষ্যৎ সাহিত্য একটু স্বতন্ত্র হইবে, সেই সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিবে জীবনের আর এক ক্ষেত্র হইতে। যেমন প্রত্যেক কবির কল্পনায় একটা স্বাতন্ত্র্য আছে,—এই স্বাতন্ত্র্য যাঁহার যত বেশী তাঁহার প্রতিভাও তত মৌলিক, এবং এই স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিশেষ রসসৃষ্টির পক্ষে বাধা না হইয়া, তাহার প্রকৃত সহায়—তেমনই, প্রত্যেক যুগের একটা বিশিষ্ট প্রেরণা আছে; যদি সে প্রেরণা সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিকূল না হয়, তবে তাহা হইতে যে সাহিত্যের জন্ম হয়, যুগবৈশিষ্ট্যসত্ত্বেও তাহা সর্ব্বকালের সাহিত্য হইয়া উঠে। মানুষের প্রাণের মধ্যে সত্যকার সাড়া না জাগিলে কোন সত্যবস্তুর জন্ম হয় না, এই সাড়া জাগে বাস্তবজীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নায়। সাহিত্যও শুধু রস-রূপের ধ্যান নয়—তাহা দেহচেতনাহীন আত্মার আনন্দ-গান নয়; অতি নিবিড় ও গভীর দেহ-চেতনাই সাহিত্যের জন্মহেতু। সেই চেতনা দেহকে অতিক্রম করে বটে, তথাপি দেহের ভিতর দিয়াই তাহার জন্ম হয়। নিছক মনঃকল্পিত কোন বস্তুই মানুষের জীবনের সত্য হইতে পারে না; তাই যেখানেই সেই রকম কিছু দেখি তাহাকেই কৃত্রিম বলিয়া মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধা জাগে। এই বাস্তব-ভিত্তি যতই প্রচ্ছন্ন হোক—যাহা প্রকৃত সাহিত্য তাহার মূলে ইহা থাকিবেই; না থাকিলে সাহিত্য যে কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা বোঝা কঠিন।

এখন প্রশ্ন এই—এ যুগের সেই বাস্তব-প্রেরণা কি? তাহা এখনও খুব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই সত্য, তথাপি তাহা আমরা নানা দিক দিয়া অনুভব করিতেছি। রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে তাহার আভাস যতটুকু স্পষ্ট, এ যুগের সাহিত্য-সাধনায় তাহা এখনও তত সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে নাই। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্য-ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিতেও পারে—যে যুগে এইরূপ বিরোধ ঘটে, সে যুগে সাহিত্য ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। যে অবস্থার গুণে বাংলা-সাহিত্য এতদিন এমন অবাধে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, আদর্শবাদ ও ভাবুকতার এমন আশ্চর্য্য ফসল ফলিয়াছিল—সে অবস্থা আর নাই; তথাপি অন্য কারণে আমরা আর একটা সাহিত্যের পত্তন এই যুগেও আশা করিতে

পারি। বর্ত্তমানে অনেক দিকে আমাদের স্বপ্ন-ভঙ্গ হইয়াছে, আমরা এখন এমন এক প্রকার বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াছি, যাহা আমাদের দেহ-চেতনাকে অতি-মাত্রায় প্রবুদ্ধ করিয়াছে—সত্যের আরেক রূপ অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে যেমন ভয়ব্যাকুল, তেমনই বিস্ময়-বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। নিছক আদর্শবাদ মনকে এখনও মুগ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাণে তেমন সাড়া জাগায় না। একটা নূতন ক্ষুধা, নূতন বেদনারসের আনন্দ আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু সেই অনুভূতি এখনও সাহিত্যের প্রেরণা হইয়া উঠে নাই। তার কারণ, কেবলমাত্র অনুভূতি হইলেই হইবে না—সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রতিভার প্রয়োজন। মানুষ যে শক্তিবলে বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে—সেই শক্তি বাণীর প্রসাদযুক্ত হইলে কবি-প্রতিভায় পরিণত হয়। আমি রসতত্ত্বের আলোচনা এখানে করিব না, করিয়া কোন লাভ নাই। 'রস'কে ইঙ্গিতে আভাসে নির্দ্দেশ করা যায়—উহা অনির্ব্বচনীয়। আমার বক্তব্য এই যে, যুগধর্ম্ম-বশে সাহিত্যের উপাদান, বা প্রাণস্পন্দনের রীতি যেমনই হৌক্—কোন যুগের বস্তুসম্পদকে রসসম্পদে পরিণত করিতে হইলে কেবল দরদী হইলেই চলিবে না, চাই সেই প্রতিভা—যাহা যুগ বিশেষের সম্পত্তি নহে, সকল যুগের পক্ষেই এক, চাই সেই প্রাণশক্তি, প্রজ্ঞা ও কল্পনা। কতকগুলি মত বা যুক্তির দোহাই দিলে হইবে না, কোনও নজীরের জোরেই যাহা কাব্য নহে তাহাকে কাব্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। প্রত্যেক সাহিত্য-কীর্ত্তি ভাবে ও প্রকাশরীতিতে স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ তাহাতেই মিলিবে; অলঙ্কারশাস্ত্রও তাহার প্রমাণ নহে, ইতিহাসও তাহার প্রমাণ নয়; কারণ, সাহিত্যের মূলপ্রবৃত্তি 'নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিত'; তাহার বহিরঙ্গে যে কালের যে চিহ্নই থাকুক, তাহার মর্ম্ম-কোরকের রূপটি স্বয়ম্প্রভ ও স্বয়ংপ্রকাশ। আমাদের জীবনে যে নূতন দেহ-চেতনার সাড়া জাগিয়াছে, যে আদর্শ-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সাড়া সাহিত্যের মধ্যে এখনও সত্যকার সৃষ্টিশক্তি হইয়া দাঁড়ায় নাই।

তরুণের দল যাহাকে সাহিত্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহার ভাবে ও ভাষায়, এই প্রতিভার কোন লক্ষণ নাই—আছে কেবল দুর্ব্বলের চিত্তদাহ, অজ্ঞানের দুঃসাহস—কিছু-না-মানার বাহাদুরী। তাহার কল্লোল যতখানি, ততখানি সে গভীর নয়। তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই; সে সাহিত্য যদি

তরুণের সাহিত্য হয়, তবে তাহার নিকট ইহার অধিক কি আশা করিবার আছে? পূর্ব্বে অভিভাবকের শাসন প্রবল ছিল, এখন তাহা নাই বলিলেই চলে; বরং অভিভাবক-বয়সীরা হঠাৎ কি ভাবিয়া ইহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া নিজেদের বিগত ও বিস্মৃত যৌবনের রোমন্থন আরম্ভ করিয়াছেন। সস্তা ছাপাখানা, পাঠক-পাঠিকার অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং ব্যবসাদারী পত্রিকা—একদিকে এই তিন যুগ-মহিমা, অপর দিকে—অনাহার ও অস্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্দ্দশা, এবং গত ১৫।২০ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের স্কুল কলেজে শিক্ষাদানের অবনতি, এই সকল কারণে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—সাধারণ শিক্ষার বিস্তার হইলেও 'কাল্‌চার' অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাই সাহিত্যের আসরে যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া একটা 'বোল্ হরিবোল্' আরম্ভ করিয়াছে। একদল বলিতেছেন, লেখাতে অধিকার সকলের আছে, বিশেষতঃ যুবকদিগের তাহা ত' জন্মগত সংস্কার—লেখার মধ্যে অজস্রতা ও অবাধ অসংশয় স্বেচ্ছাচার-ই প্রাণের লক্ষণ। অতএব মাভৈঃ! কাহারও কথায় কর্ণপাত করিও না, আমরা আছি; আমাদের বয়স বিদ্যাবুদ্ধি অনেকের চেয়ে বেশী, অথচ প্রাণ তোমাদেরই মত 'সবুজ'—'সবুজ' কথাটি ত আমাদেরই আবিষ্কার, যৌবনের জয়যাত্রার বাজনা ত আমরাই প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আরেক পক্ষ সাহিত্য-সৃষ্টির কোনও ধারই ধারেন না—কেবল শাসনটাই জানেন; ও জিনিষটা তাঁহাদের নিকট শুকনা হরীতকী—আহারান্তে চর্ব্বণীয়; মাত্রা বেশী হইলেও বিপদ আছে। একদিকে ড্রয়িংরুমবিহারী dilettante, অপরদিকে অশ্বত্থবৃক্ষবাসী জরদ্গব—এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া সাহিত্য খাবি খাইতেছে।

৩

এই গণ্ডগোল কাণে উঠায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এইবার শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি, সাহিত্য-ধর্ম্ম কি, সাহিত্যের শাশ্বত আদর্শ কি, তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা তিনি বহুবার বহু প্রবন্ধে করিয়াছেন—যাঁহারা সাহিত্যরসিক ও পণ্ডিত তাঁহাদিগকে সে কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু শিক্ষা ও সাধনা-বিমুখ, প্রাণধর্ম্মের নামে রিপুর উপাসক, অতি দুর্ব্বল ও বিকৃত-মস্তিষ্ক তরুণ ও প্রবীণের দল, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পাঠক-

সমাজের উৎসাহে যে শিবের গাজন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে গুরুমন্ত্রের প্রয়োজন নাই—সকলেই গলায় 'পাটা' পরিয়া মহা মহা সাধক হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপদেশে বা কশাঘাতে যে কোন ফল হইবে না, তাহার অন্য কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাহিত্য-প্রকৃতির আলোচনা করেন নাই। কিন্তু কেবলমাত্র Aesthetics বা রসতত্ত্বের মূল সূত্রটির আলোচনা করিলে সাহিত্যের বহিরঙ্গটি মূল্যহীন হইয়া পড়ে। যে বাস্তব উপাদানকে আমি সকল সাহিত্য-কীর্ত্তির মূলভিত্তি বলিয়াছি, যাহার সঙ্গে দেহ-মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইলে, পূর্ণপ্রেরণা-সঞ্চার হয় না, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া একেবারে রসতত্ত্বে আরোহণ করিলে দেহধর্ম্মী মন নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে শাসন জারী করিয়াছেন, তাহা অবশ্য তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে—তিনি ব্যতীত সত্য কথা তেমন করিয়া বলিবার শক্তি আর কাহারও নাই। সে আদর্শ হইতে কোন যুগের সাহিত্যই এতটুকু বিচলিত হইতে পারে না, এ কথা মানি। কিন্তু কথাটা আধুনিক সাহিত্যের পন্থানির্দ্দেশের পক্ষে আর একটু বিশদ ও সবিশেষ হইলে ভাল হইত। বোধ হয়, তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকটে আশা করাও যায় না। তিনি তত্ত্ব বা শাস্ত্রহিসাবে কিছু বলেন নাই, নিজেরই অলোকসামান্য কবিধর্ম্মের মর্ম্মকথাটি খুব স্পষ্ট করিয়া সংক্ষেপে জানাইয়াছেন। ইহা লইয়া তর্ক চলে না। একদিকে কথাটি খুবই সত্য, তদুপরি তাহা আবার অত-বড় কবির জীবনব্যাপী সাধনার উপলব্ধি। ওকালতি-বুদ্ধি বা নৈয়ায়িক বিদ্যার সাহায্যে তাঁহার কথার চুল ধরিয়া—ভ্রম প্রতিপাদন করিতে যাওয়া—শুধু যে পণ্ডশ্রম তাহা নয়, নিতান্তই হাস্যকর। তাঁহার বক্তব্যের মূল মর্ম্ম, যে-কোন রসিক ব্যক্তি বিনা প্রমাণে হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কিন্তু একটু গোল হইয়াছে। তিনি উপাদানের কথাটি অনেকখানি করিয়া বলিয়াছেন এবং তাহার নির্ব্বাচন-নীতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নতর জীব-ধর্ম্মের প্রয়োজন রসবোধের অনুকূল নহে, এ কথা সত্য; কিন্তু মানুষের অনুভূতি-মার্গে বিশ্বের প্রবেশাধিকার আছে, কোন বস্তুই সেখানে অগ্রাহ্য নয়। সেই অনুভূতিই—রসবোধের না হোক—রসকল্পনার মূল-প্রেরণা, একথা বলিলে রসতত্ত্বের হানি হয় না। গাছের মাথায় উঠিয়া শিকড়কে অস্বীকার করিলে চলে কি? তাহার দোষ হয় এই যে—মাটির কথাটা মনেই থাকে না। ফুল ফুটিল না,

গাছ কাটিয়া দাও,—আপত্তি নাই ; তাহা মালীর দোষ হইতে পারে, গাছেরও দোষ হইতে পারে ; কিন্তু সেজন্য মাটির সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে চলিবে না, সকল জায়গার মাটিই চাষ করিয়া দেখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, এক রকমের বাছাই-করা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম ; এই বাছাই-করায় কোনও 'বস্তু'র খোঁচা নাই, অর্থাৎ প্রয়োজনের তাড়না নাই—ইহা আমার আত্মার অতি সহজ স্বাধীন আনন্দ-বোধের পছন্দ। কিন্তু সেজন্য নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি ? সে ধর্ম্ম ত বস্তুগত নহে, তাহা রসিকের আত্মগত। প্রয়োজন-বোধও আত্মগত, বস্তুগত নয় ; সাধারণ জীবধর্ম্মে যে বস্তুটির অতিশয় প্রয়োজন—ব্যক্তিবিশেষের রস-কল্পনায় সেই বস্তুই প্রয়োজনাতীত—অতএব সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে। 'আব্রহ্মস্তম্ব' যদি 'সৎ' হয়, তাহা হইলে আত্মার আনন্দবোধের কোথাও বাধা থাকিতে পারে না,—যদি আমার সেই আত্মীয়তা-শক্তি থাকে। কিন্তু আরও একটু মুস্কিল হইয়াছে। জীবধর্ম্ম ও প্রয়োজনের কথা তিনি যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে প্রশ্ন উঠে—আত্মার আনন্দবোধ কি দেহ-তাড়নাকে একেবারে বাদ দিয়া ? না, দেহ-চেতনার ভিতর দিয়াই,—তাহাকে অতিক্রম করিয়া ? এই কথাটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতির যে পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে দেহঘটিত কোন ব্যাপারই তাঁহার কল্পনায় এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মার সঙ্গে বিরোধ করিয়া থাকিতে পারে না, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভায় সে তন্মুহূর্ত্তেই আত্মার দ্বারা পরাজিত হইয়া শাশ্বত সৌন্দর্য্যলোকে দীপ্তি লাভ করে। তিনি ভারতীয় ঋষির আনন্দবাদকে বাংলাকাব্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ যত সত্য হোক, সাধারণ মানুষ কখনও ইহাকে প্রাণের মধ্যে স্বীকার করিবে না ; কারণ, এত বড় প্রজ্ঞা ও কল্পনাশক্তি মানবসাধারণের—তত্ত্বগত অধিকার হইলেও—বস্তুগত অধিকার নহে। সাহিত্য এই আনন্দবাদে পৌঁছিতে না পারিলেও তাহা উপাদেয় হইতে পারে, জগৎ-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য তাহার প্রমাণ। অনেক উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি, এই বাস্তব-দুঃখ ও দেহ-চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কবির নির্লিপ্ত চিত্তের কল্পনাশক্তিই তাহা হইতে রস সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপাদান হইয়াছে অতি তীক্ষ্ণ দেহ-চেতনা, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার নানাধরণের বিরোধ—সে যুদ্ধক্ষেত্র যত বড়ই হউক, এবং সে যুদ্ধ-ঘোষণা যত উচ্চভাবেরই হউক। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা স্রষ্টার মনের

কথা—বাহিরের কথা নহে; শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার নাটকের Villain-গুলিকে চাবুক মারিবার তাড়নায় সৃষ্টি করেন নাই, একথা সত্য; তাঁহার মনে সেই ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি সামাজিক নীতির তাড়না নিশ্চয় ছিল না,—ছিল কেবল সেগুলিকে সৃষ্টি করার আনন্দ। কিন্তু এমন কথা যদি কেহ গোড়াতেই বলিয়া বসেন যে, ওই রকম চরিত্র আমাদের বাস্তবজীবনের উপদ্রব, আমাদের জীব-ধর্ম্মের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের সঙ্গে তাহার একটা বিরোধ রহিয়াছে, অতএব উহা রস-সৃষ্টির অনুকূল নহে—তবে কথাটা বড় অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে—রসসৃষ্টির উপাদান ও রসবোধের নিয়ম, এই দুয়ের সামঞ্জস্য হয় কবির প্রতিভায়। কাঁকর চারিদিক হইতে খোঁচা দেয় বলিয়া, আর পদ্ম সেই প্রত্যক্ষ দেহানুভূতির অনেক বাহিরে বলিয়াই যে, এই দুইয়ের মধ্যে সাহিত্যিক উপাদান-হিসাবে একটা সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে—এমন কথা বলিলে, রসতত্ত্বের হানি হয় না বটে, কিন্তু রসসৃষ্টির গোড়ার কথায় একটু গোল বাধে। এই রসসৃষ্টির প্রসঙ্গে আমাদের দেশে একটি প্রাচীন উপমা চলিয়া আসিতেছে। একখানা শুষ্ক অস্থি-খণ্ড চর্ব্বণ করিয়া আপনারই মুখনিঃসৃত রক্তে যখন সেইখানি বেশ সিক্ত হইয়া উঠে, তখন কুকুর সেইটিকে সেই অস্থির রস মনে করিয়া পরমানন্দে উপভোগ করে। এই শুষ্ক হাড়ের সঙ্গে তাহার জিহ্বা ও মুখগহ্বরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সেই কঠিন ঘর্ষণই—এখানে রসসৃষ্টির কারণ। উপমাটি সার্থক উপমা বটে। বাহিরের ওই হাড়খানার মধ্যে রস নাই, রসটা আসিতেছে কুকুরের নিজের মুখ হইতেই—কিন্তু ওই হাড়খানাও দরকার,—এমন কি, তাহার দ্বারা মুখটি ক্ষত হওয়ারও প্রয়োজন আছে!

মূল রসতত্ত্বের আলোচনায় Realism বা Idealism প্রভৃতি নামকরণের কোনও সার্থকতা নাই—কোনও কাব্যই একেবারে Real বা একেবারে Ideal হইতে পারে না। তবে যদি স্থূলভাবে কবি-কর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ বুঝিয়া লইবার বা বুঝাইয়া দিবার জন্য একটা ভেদ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, তবে একথা বলিলে দোষ হয় না যে, আমাদের সাহিত্যে এ-যাবৎ কাল Idealism-ই প্রবল হইয়া আসিয়াছে; তন্মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের Idealism যে কত বড়, কত গূঢ় ও গভীর—তাহা বিশেষ করিয়া ধারণা করা চাই। এত বড় সজ্ঞান ও শক্তিশালী Idealist কোন যুগের কোন সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার সেই অতি-

প্রবল ও একান্ত বস্তুভেদী কল্পনায়, বাস্তব তাহার যতকিছু বাস্তবতা লইয়াই রূপান্তরিত হইয়া গেছে। প্রয়োজন বা দেহ-তাড়নাকে তিনি কখনও তাঁহার কল্পনায় ভাল করিয়া আমল দেন নাই; এদিক দিয়া মানুষের জীবনে যে সকল জটিল ও দুর্ব্বার সমস্যা আছে, তাহার বাহ্য উগ্র রূপকে, এক উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি আবৃত ও অপসারিত করিয়াছেন। তাই যাহা দেহঘটিত চিত্তবিক্ষোভ, যাহা নানা যুগে, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে জীব-জীবনের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সাহিত্যের নিত্য-বিষয় হইতে পারে না—ইহা রসতত্ত্বের উচ্চ কথা হইলেও রবীন্দ্র-নাথের মুখে এই কথার তাৎপর্য্য আরও গভীর। রবীন্দ্রনাথ নিজের কবি-ধর্ম্মের কথা অনেকবার অনেক কবিতায় স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহাদের সে সম্বন্ধে এখনও কোন সন্দেহ আছে, তাঁহাদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতাটি পড়িতে বলি। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য-সাধনার মূলমন্ত্রটি আর কোথাও এমন যথার্থ ও সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই সঙ্গে আর একটি বিখ্যাত কবিতার ('পুরস্কার'—সোনার তরী) এই পংক্তিগুলিও স্মরণীয়,—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণ মন খুলি';
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ ভালে।
অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলি জালে।
অতি দুর্গম সৃষ্টি-শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর-সঙ্গীতে,
স্বর-তরঙ্গে যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,—
সেথা হ'তে টানি' ল'ব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।

আমরা এযুগের মানুষ, কিছু বেশী বাস্তব-পীড়িত ও দুর্ব্বল ; কাজেই এতবড় আদর্শকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ বা শক্তি, কিছুই আমাদের নাই। অসীম-কালের মহাকন্দর হইতে বিশ্ব-নির্ঝরের সঙ্গীতধারাকে টানিয়া আনিবার ভান আমরা করিতে পারি, কিন্তু তাহা এ যুগের সত্যকার প্রবৃত্তি নহে। ইহাতে যদি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব না হয়, তবে সে সম্বন্ধে এখন হইতেই নিরাশ হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। আমাদের একমাত্র আশা এই যে—কোন সমস্যাই রসের আধার হইতে পারে না বটে, তথাপি মানুষের সমগ্র দেহ-মন-প্রাণকে সে নাড়া দিতে পারে। মানুষ যখন সেই সমস্যাকেই বড় করিয়া তাহাকে নিত্য-সত্যের পূজা দেয়, তখন সে সাহিত্য-সৃষ্টি করে না, আপনার জীবধর্ম্মেরই একটা নূতন পরিচয় সে ইতিহাসে রাখিয়া যায়। কিন্তু ওই সমস্যার তাড়নায় সে যখন নিজের মধ্যেই ডুব দেয়, নিজের গভীরতম অনুভূতিক্ষেত্রে নিজের সঙ্গেই তাহার একটা নূতন করিয়া পরিচয় হয়। সে পরিচয়ের রহস্য-বিস্ময় যখন তাহার বহুদিনের অভ্যস্ত সংস্কারকে নাড়া দিয়া প্রাণের জড়তা দূর করে, তখন কি সেই বাহিরের প্রভাব, সেই অনিত্য যুগধর্ম্মের তাড়না তাহাকে সঞ্জীবিত করে না? রবীন্দ্রনাথ যে-যুগের মানুষ সে যুগও একটা বড় সমস্যার যুগ ছিল ; সে সমস্যা বাহিরের দিকে খুব প্রবল না হইলেও অন্তরের ভাবনায় খুব বড় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যুগ-মন্থনের ধন্বন্তরী তিনি—সর্ব্বশেষে অমৃত-পাত্র হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন। তেমনই, আজ যে-সমস্যা আমাদের দেহমনকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাহিরের তাড়নাটাই বেশী বলিয়া হতাশ হইবার কারণ দেখি না। বরং মনের অত্যধিক প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, কিছুদিন দেহের অধীন হইয়া, নিত্য-সত্য-স্বরূপকে আর এক পাত্রে ঢালিয়া পান করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা মিথ্যা, যাহা অনিত্য তাহাকেই নিঃশেষ করিতে চাই—যাহা জীবধর্ম্মের স্থূল দুঃখ, অতএব হেয়, তাহারই মশাল জ্বালাইয়া একটু নৃত্য করিলে ক্ষতি কি? নিত্য ত চিরদিনই আছেন, কিন্তু এই অনিত্য যদি যুগধর্ম্মের বশে একবার দেখা দিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রাণের সিংহাসনে বসাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেই বিচিত্র রস আস্বাদন করিতে দোষ কি? রবীন্দ্রনাথ সার্থক সত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, সত্যকার মানুষ 'লাখে না মিলিল এক'! একথা চিরযুগের বটে, কিন্তু আপাততঃ এই যুগে আমরা রসানুভূতিকে এত সূক্ষ্ম করিয়া সত্যের অত বড়

সাধনা করিব না। তিনি যাহাকে সাধারণ সত্য বলিয়াছেন সেই সাধারণ সত্যের মানুষকে তাহার জীবধর্ম্মের শাসনের মধ্যেই নির্ব্বিচারে বরণ করিব; অন্নাভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন আত্মার নিদারুণ দৈন্য, তার যতকিছু অগৌরব, দেহ-দুঃখের দুর্গতি ও কুশ্রী আকার, এই সকলই—সূক্ষ্ম রসবিলাস নয়—প্রত্যক্ষ দেহ-চেতনার দ্বারাই আত্মসাৎ করিব; ইহাই হইবে এ যুগের সাহিত্যের উপাদান। তারপর যদি সেই চেতনার পরিপূর্ণ আবেগে কাহারও 'চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়', এবং তাহার সেই প্রতিভা থাকে, তবে তাহা হইতে অভিনব রসসৃষ্টি হইবে। এ কথা বলিলে ত রসতত্ত্বের কোন বিঘ্ন হয় না, শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথাই ত বজায় থাকে। ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন দুই শ্রেণীর লোক—এক, যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আভিজাত্যে মুগ্ধ, যাঁহাদের নিকট জগৎ ও জীবন "শূন্যায়মান ভিক্যাণ্টারের" মত বৈঠকী রসালাপের উপকরণ; আর, যাঁহারা আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চিন্তার অল্পাধিক অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশের Don Quixote হইয়াছেন, চারিদিকে নানা সমস্যার বিভীষিকা দেখিয়া ঝুটা মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও যৌনতত্ত্বের তালপাতার তলোয়ার হাতে দেশের নানা দৈত্য ও ভূত ঝাড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ইঁহারা দুই দলই বর্ত্তমান যুগের উপসর্গ-মাত্র, ইঁহাদের দ্বারা যুগপ্রতিষ্ঠা ত পরের কথা—নবযুগের উদ্বোধনও হইবে না।

অথচ দেশে যুগান্তর আসিয়াছে। এ জাতি যদি এই মন্বন্তর উত্তীর্ণ হইয়া বাঁচিয়া উঠে,—যদি দেহে মনে প্রাণে সুস্থ হইবার অবকাশ পায়, তবে—আমি যে সাহিত্যের আভাস দিয়াছি, তাহা ভাষায় মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিবে। এখনই যে তাহা একেবারে একটুও হয় নাই তাহা নহে। যুগসন্ধিস্থলে আমরা শরৎচন্দ্রকে পাইয়াছি। তাঁহার রচনায় পূর্ব্বযুগের Idealism পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান, অথচ অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আকস্মিক উদয়ে বাংলার পাঠকসমাজ যে নাড়া পাইয়াছিল তাহা এখন অভ্যস্ত হইয়া গেছে; তাঁহার রচনাসম্বন্ধে প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই সমান হইয়া একটা স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছে—ইহাও স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিক্রিয়া। অতি সঙ্কীর্ণ বাঙালী-সমাজের যেখানে যেটুকু বাঁধন খোলা ছিল, সেইখান দিয়া তিনি কতকটা প্রত্যক্ষ পরিচয়, কতকটা তীক্ষ্ণ সহানুভূতি ও কল্পনার সাহায্যে, নরনারীর হৃদয়-দ্বার অসীম শ্রদ্ধায় ও সমবেদনায় উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। গতযুগের আদর্শসূত্র তাঁহার মধ্যে

ছিন্ন হয় নাই, কারণ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও উপন্যাস তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার হৃদয়-রাধিকা প্রেমকেই একমাত্র পাথেয় করিয়া অন্ধকারে দুর্গম-গহনে দুঃসাহসিক অভিসারে যাত্রা করিয়াছে—কোন সুস্পষ্ট সমস্যার তাড়নায় নয়, নৈরাশ্য-কাতর বিরহীর বংশীরব শুনিয়া। কাব্য-সাহিত্যের কথা আমি বলিব না, সত্যকথা বলিলে তাহা আমার পক্ষে শোভন হইবে না। কিন্তু কথা-সাহিত্যের অকথ্য উপদ্রবের মধ্যেও একটু ক্ষীণ আশার রেখা আমি যেন দেখিতে পাইতেছি। সে কথা এখনও উল্লেখ করিবার সময় হয় নাই; হয়ত সে সম্ভাবনা অর্দ্ধপথেই নির্ম্মূল হইবে—কে বলিতে পারে?*

* শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

সাহিত্যের আসর: কবি ও কাব্য

সাহিত্য মুখ্যভাবে আলোচনার জিনিস নয়, উপভোগের জিনিস—এ কথা মনে রাখিলে সাহিত্যকে লইয়া দল বাঁধা, অথবা বারোয়ারী-যাত্রার মত যখন তখন যেখানে সেখানে আসর বসাইবার জন্য মণ্ডপ তুলিবার উৎসাহ হইবে না। কারণ, সাহিত্য উপভোগ করিবার মত সংস্কার ও সংস্কৃতি সকলের নাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক বচসা যেমন সকলেই করিতে পারে, সাহিত্যকে লইয়া তাহা করিতে পারিলে সাহিত্যই উবিয়া যায়। অতএব, সাহিত্যের আসরে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি বলিতে হইল বলিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ করিয়া সকলকে আশ্বস্ত হইতে বলি যে, সাহিত্যরসিক হইতে না পারাটা যতই লজ্জার বিষয় হউক, মানুষের আত্মগৌরব বৃদ্ধি করার জন্য আরও কত বস্তু রহিয়াছে—সেখানে সিদ্ধিলাভ যে-শক্তির দ্বারা সম্ভব, তাহা মাত্রাভেদে অনেকেরই আছে। সাহিত্যরসবোধের যে সাক্ষাৎ জ্ঞাতি-শত্রু, তাহার নাম পাণ্ডিত্য;—আপনারা এ রসে বঞ্চিত হইলে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা করিতে পারেন। এ ছাড়া আরও কত পথ রহিয়াছে। প্রভুত্ব ও ধনশক্তি আরও বড় পুরুষার্থ, তাহার সাধনা করিলে গরিব কবি বা সাহিত্যিককে অনুগ্রহ-ভাজন করিয়া তাহার দ্বারাই স্বমহিমা কীর্ত্তন করানো যায়। সমাজে সাহিত্য-রসিক বা কবির সম্মান কতটুকু? কবি হইয়া সংসারে কেহ সত্যকার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল; কবির শক্তি, বা তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রকে সমাজ কোন কালেই শ্রদ্ধা করে না; গানের ওস্তাদ বা নটনটীকে এক হিসাবে আদর করিলেও, তাহাদিগকে যেমন কেহ সত্যকার শ্রদ্ধা করে না, তেমনই কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেও সমাজ তাহার সহিত একটা নিরাপদ ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলে—সে যে একটা অস্বাভাবিক চরিত্র, এবং সেরূপ শক্তি যে কোন কাজের নয়, ইহাই মনে করে। অতএব, সাহিত্যের পক্ষ হইতে যদি বলা যায়, এটা ভিড় করিবার স্থান নয়,—রস উপভোগ করিবার শক্তি সকলের নাই, তাহা

হইলে সংসার ও সমাজের তাহাতে রুষ্ট হইবার কারণ নাই, বরং পাগলের দলে ভিড়িবার সখ না হওয়াই শ্রেয়।

কাব্য যে লক্ষ্মীছাড়ার কীর্ত্তি, অর্থাৎ যাহারা ও রস সৃষ্টি করে, তাহারা যে সাক্ষাৎ সংসার-যুদ্ধে অপারগ হইয়া দূরে সরিয়া থাকে, অতএব কিছুই লাভ করিতে পারে না—ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে সংসারবিরাগী—এ কথা সত্য নহে ; বরং যাহা 'রাগের' আতিশয্যের ফল, তাহাকেই আমাদের 'বৈরাগ্য' বলিয়া ভ্রম হয়। জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহাদের সেই প্রেম খাঁটি বলিয়াই স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি লোপ পায়,—যে 'অহং' জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়, সে অহং তেমন জাগ্রত হইতে পারে না বলিয়া, কবিরা সংসারে নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল কৃপার পাত্র হইয়া থাকেন। তাই বলিয়া, কবিরা শক্তিহীন নহেন—কেবল ইহাই সত্য যে, সংসার যে-শক্তির ভজনা করে, সে শক্তি কবিদের নাই। সেরূপ শক্তিমান হইতে হইলে ছোট-বড় নানা আকারের স্বার্থকে পরম-পুরুষার্থ করিতে হয়, এবং যাহার 'অহং' যত বেশি, সেই তত শক্তিমান হইয়া থাকে। কবিরা এইরূপ শক্তিমান নয় কেন, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু জীবনকে আরও পূর্ণ, আরও গভীর ভাবে ভোগ করিবার শক্তি তাঁহাদেরই আছে—বাহিরের ঐ যুদ্ধ একরূপ জয় করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের অন্তরের সুখ আরও সত্য, আরও গভীর। তাই কবির মুখেই আমরা শুনি—

এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহি নে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক'দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে ;
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।

ফার্সী কবি হাফেজের সঙ্গে তৈমুরলঙ্গের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের যে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। কবি হাফেজ যে সৌন্দর্য্যধ্যানে মশগুল, যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি ধরণীর আধিপত্যও তুচ্ছ করিয়াছেন, শতরাজ্যবিজয়ী তৈমুর—সংসারের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভীতি ও ভক্তি-

ভাজন সেই শক্তিমান পুরুষ—তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাই হাফেজকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মূর্খ তুমি! তাই তোমার প্রেয়সীর গালের একটি তিলের বদলে তুমি আমার বোখারা সমরখন্দের অতুল বৈভব বিলাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছ—সে বৈভব কখন চোখে দেখিয়াছ? দেখিলে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা বলিতে না।" কিন্তু হাফেজ যে-রূপে মুগ্ধ, সে যে মানুষের হৃদয়-মন-আত্মার কত বড় আরাম, তাহা তৈমুর ও তৈমুর-উপাসক সাধারণ নরনারী কি বুঝিবে? আমিও বুঝাইতে পারিব না, কেবল কবিদের সাক্ষ্যমাত্র উদ্ধৃত করিতে পারি। আমাদেরই একজন কবি সেই আনন্দে, সেই অতুল সৌভাগ্যগর্ব্বে বলিতে পারিয়াছেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসী তার!

আর একজন এই সৌন্দর্য্য-বিহ্বল অবস্থার আভাস দিয়াছেন এই কয়টি কথায়—

ভাবিলাম মনে, ধরণী দেখায়ে দিল
ঐশ্বর্য্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
ক্ষণতরে দেখা দিয়ে গেল।—ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হ'য়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ-চরণতলে।

এইজন্যই কবিদের মনে কোন দৈন্য নাই—সংসারের উপেক্ষাও তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সত্য বটে, অতিশয় আত্মসচেতন লিরিক কবিদের কেহ কেহ যেন নিজেদের কাছেই নিজেদের মহিমাবোধ অটুট রাখিবার জন্য সংসারকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে আত্মঘোষণা করেন—কবির আসন যে কত উচ্চে, তাহা অকৃতজ্ঞ ও অবোধ সমাজকে স্মরণ করাইয়া দেন। ইংরেজ কবি শেলির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন—

"Poets are the trumpets which sing to battle, poets are the unacknowledged legislators of the world."

—এই কথাই একজন সামান্য কবিও আরও উচ্চ-স্বরে, আবেগকম্পিত বাক্য-ঝঙ্কারে ঘোষণা করিয়াছেন—তাহাতে মনে হয়, সংসারকর্ত্তৃক উপেক্ষিত অভিমানী কবি যেন আশ্বাস ও আত্মপ্রসাদের শেষ অবলম্বন খুঁজিতেছেন; কথাগুলি সত্যই বড় চটকদার—

We are the music-makers
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams ;—
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams :
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.

With wonderful deathless ditties
We build up the world's great cities ;
And out of a fabulous story
We fashion an empire's glory :
One man with a dream, at pleasure,
Shall go forth and conquer a crown,
And three with a new song's measure
Can trample a kingdom down.

আমাদের দেশে আধুনিক কালের যিনি শ্রেষ্ঠ কবি, তিনিও অন্তরে এই উপেক্ষার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই—বরং আরও স্পষ্টভাষায় সে কথা বলিয়াছেন, এবং আপনার মত করিয়া তাহার সান্ত্বনাসৃষ্টিও করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট।
হৃদি-শয্যাতল
শুভ্রদুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।
সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন ; সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
অয়ি মহীয়সী মহারাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্ ! আজি
এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ?

—এখানে সমাজ ও সংসারকে কবি কোন জবাব দেন নাই,—নিজেরই অন্তরকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, নিজেরই মহিমাবোধ জাগ্রত করিয়াছেন।

সংসারের অবহেলায় কবিগণের এই যে অভিমান, ইহা কবির নয়—কবি-মানুষটির দুর্ব্বল মুহূর্তের আত্মসচেতন মনোভাব। কবিদের ইষ্টদেবতা পরম-সুন্দর, তাঁহার উপাসনায় সকল অসৎ সৌন্দর্য্যধাতুতে পরিণত হইয়া সৎ হইয়া যায়। সেজন্য কবিহৃদয়ের আশ্বাস এত দৃঢ়, কবির প্রেম এমন সর্ব্বজয়ী ও শক্তিশালী যে, কবিচরিত্রে বা কবিরচিত কাব্যে কোথাও অহঙ্কার বা দম্ভ অভিমান থাকিতে পারে না ; সে শক্তি পূর্ণশক্তি বলিয়াই তাহাকে আত্মঘোষণা করিতে হয় না, কাব্যও বিনাযুদ্ধে আমাদিগকে জয় করিয়া লয়। কেবল বাক্যের উদ্দীপনা, ছন্দের ঝঞ্চনা, অথবা কোন আইডিয়া বা আবেগের উত্তেজনা—কবিশক্তির লক্ষণ নয়। জগতের এক শ্রেষ্ঠ কবি সেই শক্তিকে এই কয়টি কথায়—ব্যাখ্যা নয়—একেবারে রূপ দিয়াছেন—

'Tis the supreme of power :
'Tis might slumbering on its own right arm.

—অর্থাৎ, সে শক্তি সকল শক্তির উপরে—সে যেন আপনারই দক্ষিণ বাহুর উপরে মাথাটি রাখিয়া আধ-নিদ্রায় মগ্ন হইয়া আছে। (তাহার হুঙ্কার নাই, আস্ফালন নাই, আপন পূর্ণতাভরে সে আপনার মধ্যে স্থির হইয়া আছে।)

২

সভা-সমিতির বক্তৃতায়, বা পত্রিকাদির প্রবন্ধশালায়—যথার্থ সাহিত্যরসাস্বাদন যে কেন হইতে পারে না, সেই কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং কথা হইতে কথান্তরে গিয়া অনেক অবান্তর কথাও হয়তো বলিয়াছি। সাহিত্যের রসালাপ করিতে হইলে উপযুক্ত আসর চাই, এবং সে আসরে জনতা কম হইবারই কথা। তথাপি এমন কথা বলি না যে, গুহ্যসাধনার ভৈরবীচক্রের মত, সেখানে কেবল কয়েকটি দীক্ষিত সাধকেরই মাত্র আসন থাকিবে। তেমন আসরও হইতে পারে না এমন নয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ নাই—তাহাকে আদর্শ করিলে আপনাদের মত সাধুসজ্জনের সঙ্গলাভ আর ঘটিবে না। যাঁহারা সেই রসিক-শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের কোনরূপ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয় না, কোন জিজ্ঞাসা আর তাঁহাদের নাই; তাঁহারা কেবল চক্রে বসিয়া একত্রে ঢালেন ও পান করেন—একেবারে বুঁদ হইয়া থাকেন, কথা কহিয়া নেশাটিকে তরল করিতে চান না। এ অবস্থা খুবই কাম্য বটে, কিন্তু আমরা অনেকে এখনও কথা কহিতে চাই—জানিতে চাই, বুঝিতে চাই; এবং হয়তো বুঝি না বলিয়াই বুঝাইবার জন্য আরও অধীর হই। এজন্য সেরূপ আসরে আমাদের চলিবে না। একজন সুফী কবি এইরূপ রসপানের আসরকে 'শরাবখানা'র সহিত উপমিত করিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা লোভনীয় সন্দেহ নাই, যথা—

একটু তফাতে ব'সে আছে দেখি ইয়ারের দল
একদম মাতোয়ারা—
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁশ—প্রাণ ভ'রে পিয়ে
পীরিতির রসধারা।
নাই করতাল, বেহালা, সারং—মজলিসে তবু
ফুর্ত্তির কমি নাই;
বোতল, গেলাস, মদ দেখি না যে—তবু ঢালে আর
পান করে একজাই!

এই শরাবখানার যিনি অধিষ্ঠাত্রী, সেই রূপসী তরুণী সাধক-কবিকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আগেভাগেই বলিয়া দিলেন—

অবিশ্বাসীর আসর এটা যে—সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার,
শুরু হ'তে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলই
অবাক-চমৎকার!
পূজা-নমাজের ঘর ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড় এই
শরাব-খানার মাঝে,
খুলে ফেলে ওই দরবেশ-বেশ সাজিতে হবে যে
ফুর্ত্তিবাজের সাজে।
কাঁধে পর' দেখি কাফেরের সুতা, ফেলে দাও ওই
পুঁথি আর জপমালা;
পেয়ালায় মদ ভরপুর পিও, চলে এস ভেঙে
ধর্ম্মের আটচালা।
চুর হয়ে শেষে চুমাটি বাড়াও, গালে গাল দিয়ে
কথা কব কানে-কানে,—
একটি সে কথা!—জান্ তর্ হয়ে ত'রে যাবে তায়,
যদি বোঝ তার মানে।

ভাগ্যবান পুণ্যবান কবির আর উপায় কি? তাই তিনিও বলিতেছেন—

করিলাম তাই! চাও যদি ভাই, আমারি মতন
দিল্‌খানা লালে-লাল,
এক ফোঁটা এই খাঁটির লাগিয়া খোয়াও সকলে
ইহকাল পরকাল।

এমন করিয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইতে আমরা নিশ্চয় রাজি হইব না, ততখানি রসাবস্থার অধিকারী আমরা এখনও হই নাই; অতএব একটু নিম্নাধিকারে থাকিয়া এখনও পুঁথি ও জপমালার দাসত্ব করিব। আমাদের আসরে কেবল এমন ব্যক্তিকে চাই, যিনি ততখানি রসপিপাসু না হইলেও এই রসের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন; রসালাপের মধ্যে তাঁহার যেন আর কোন অভিপ্রায় না থাকে—অন্তত এই সময়টুকুর জন্যও তাঁহার চিত্ত যেন সকল স্বার্থবুদ্ধি ও বৈষয়িক সংস্কার হইতে মুক্ত থাকে, ব্যক্তিগত মতামতের অভিমান বা কোনরূপ লাভের লোভ কেহ যেন এখানেও সঙ্গে করিয়া না আনেন। ব্যবসায়ের সুবিধা, বড়লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ, দলবিশেষের দলপতি হইবার জন্য নিজের খ্যাতি ও

প্রতিপত্তি বৃদ্ধি-করা, কবি, ভাবুক বা চিন্তাশীল লেখক বলিয়া শীঘ্র একটা নাম করিবার আকাঙ্ক্ষা, পত্রিকা-সম্পাদকদিগের কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করিবার, অথবা ততোধিক কঠিনহৃদয়া আধুনিক মালবিকা-চতুরিকাদিগের অন্তরে একটু প্রবেশ-পথের আশা,—এ সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। সাহিত্য যদি কেবল জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে এতখানি চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখানে কেবল তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি হইলেই চলিবে না, অন্তরের আর্দ্রতা ও ঋজুতা চাই, সত্যকার পিপাসা চাই,—সে পিপাসা কেবল সাগর-শোষণের দম্ভেই চরিতার্থ হইবার নয়; বরং যে বিন্দু-মাত্র আস্বাদন করিতে পারিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, সেই বিন্দুটিকে রসনায় ধরিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই। ইহাকে পাইয়াছে এমন লোক খুব কম হইবারই কথা; কিন্তু পায় নাই—পাইতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অতএব সাহিত্যিক আলাপের আসর খুব ছোট হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা জনসভার মত বৃহৎ হইতে পারে না।

সাহিত্যের রসচর্চ্চা করিবার জন্য এইরূপ আসরের প্রয়োজন আছে, তাহা মানি; কাব্যামৃত-রসাস্বাদ ও সজ্জন-সঙ্গ, এই দুইটিই সংসারবিষবৃক্ষের অমৃতময় ফল, আর সকলই বিষ—এ কথা আজিকার দিনে সকলে স্বীকার না করিলেও, আপনারা যে কয়জন আজ এখানে, ফুটবল-ম্যাচ ও অন্য নানা লোভনীয় বা লাভজনক দেখা-সাক্ষাৎ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার কিছুও স্বীকার করিবেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, এমন আসরে আপনারা কেমন আলাপ আশা করেন? আমি জানি, অনেক—অনেক কেন, প্রায় সকল—সাহিত্যিক অধিবেশনেই অভিভাষণ ও বক্তৃতাগুলি নিতান্ত আনুষ্ঠানিক বলিয়াই শ্রোতৃবর্গ তাহা কোনমতে সহ্য করিয়া থাকেন। বড় বড় সাহিত্যিকেরা যখন তাঁহাদের বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, ভাব, ভাষা, তথ্য ও তত্ত্বের চরকিবাজি করিতে থাকেন, এবং আপন আপন কৃতিত্বের ক্রমিক উন্মাদনায় দেশ কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া শেষে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে আত্মসংবরণ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ এই ভাবিয়া রোমাঞ্চ-কলেবর হন যে, এই মরুভূমিতেও শীতল উৎসের দর্শন মিলিবে—এখানেও নৃত্য ও গীতের প্রচুর ব্যবস্থা আছে। হয়তো সেই নৃত্যকলা ও অন্যান্য কলা দিগ্‌ভ্রান্তকারিণী মরীচিকার মতই বারিহীন, তথাপি ওই বক্তৃতার মত তাহা সদ্য-প্রাণঘাতী নয়। ইহাও জানি যে, আপনাদের এই বৈঠক তেমন

বৃহৎ ব্যাপার নয়; ইহা শাখা ও প্রশাখায়, কলার প্রদর্শনী ও কলাবিদ্‌গণের বিশেষত্ব-বাহুল্যে, পুষ্পোদ্যানকে ফলবান বৃক্ষবাটিকায় পরিণত করে নাই; আপনারা সত্যই একটু রসপান-অভিলাষে আসিয়াছেন। সে পক্ষে আমার পরামর্শ এই যে, এ আসরে কথার কচকচিকে গৌণ করিয়া কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি প্রভৃতিকেই মুখ্য করা হউক। নবীন সাহিত্যিকদিগের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের রচনাও শুনিতে হইবে, কারণ যেখানে অজস্র মুকুলোদ্গম,—সেখানে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের কয়টি দৃঢ় বৃন্তে প্রস্ফুট কুসুমাকার ধারণ করিবে—সে সংবাদ লইবার জন্য সাহিত্যামোদী-মাত্রেরই উৎসুক হওয়া উচিত। কিন্তু যে সকল কাব্য-কুসুম পূর্ণস্ফুট ও অম্লান হইয়া আমাদের সাহিত্য-নন্দনে বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গন্ধ-মধু পাঁচজনে মিলিয়া উপভোগ করাই এরূপ বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সুফী কবির শরাব-খানায় যে কাজ হইয়া থাকে, তাহার অন্তত কিছুও আমাদের অসাধ্য নয়; প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাত্রে এক একটু কাব্যের রস ঢালিয়া দিবেন—পান করিবার সময়ে কোন কথার প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বে বা পরে সেই সুধার কিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিলে স্বাদের মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়। সাহিত্যরস এমন করিয়া উপভোগ করিবার প্রয়োজন আছে। ইদানীং এইরূপ রস-চর্চ্চা বিরল হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই, কাব্যের সহিত মানুষের হৃদয়ের যোগ সুস্থ ও সবল থাকিতেছে না। এক্ষণে কাব্যরস আফিম বা চণ্ডুর সামিল হইয়া উঠিতেছে; ঘরে বসিয়া একাকী, নিতান্ত অসামাজিকভাবে—যাহার যেমন রুচি—কাব্যরস-সেবন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি হইলেও প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় না; এবং কাব্য-সাহিত্যের রসসম্ভোগে একটা বড় ত্রুটি থাকিয়া যায়—রস-সংবেদনা একটা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, বিভিন্ন হৃদয়ে আবেদন-বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাহার যে একটা সম্পূর্ণতর রস-প্রমাণ আছে, তাহা আর ঘটিতে পারে না। কবিতাকে এইরূপ যাচাইয়া লওয়ার প্রয়োজন অল্প নহে। অতএব এইরূপ সাহিত্যিক আসরের আমি যে একান্ত পক্ষপাতী, তাহা বলাই বাহুল্য।

৩

এখন আমি এ আসরে কি বলিব? আমাকে যখন আপনারা এ সভার মঞ্চাসনে বসাইয়াছেন, তখন বুঝিতেছি যে, কচকচির ভারটা আমাকেই বহিতে

হইবে। আমি পণ্ডিত নই, পাণ্ডিত্যের ব্যবসাদারী আমার সাধ্য নয়; আমি যাহা বলিব, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইবার ছলে, নিজে কতটা বুঝিয়াছি তাহাই নিজের কাছে যাচাই করিয়া লইব। যদি আপনাদের কাছে তাহা পরিষ্কার হইয়া না উঠে, তবে বুঝিব, আমার নিজের কাছেও তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। আমি আপনাদের সমক্ষে কাব্যপরিচয়ের দুই চারিটি সাধারণ সূত্রের অবতারণা করিব; মনে হয়, আপনাদের রসপিপাসু মন সেটুকু বরদাস্ত করিতে পারিবে।

প্রথমেই কবির 'কল্পনা' সম্বন্ধে কিছু বলিব। কাব্যরস আস্বাদনের সঙ্গে চিন্তাবৃত্তির যেমন কোন সম্বন্ধ নাই—ও রস আমরা যে রসনার দ্বারা আস্বাদন করি, সে রসনা যেমন মস্তিষ্কের সমদেশবর্ত্তী নয়, তেমনই, কবিরা যে দৃষ্টি দ্বারা জীবনের রস-রূপ আবিষ্কার করেন, তাহাও সাধারণ মনস্তত্ত্বের অধিকারভুক্ত নয়; এই দৃষ্টিকেই আমরা কল্পনা বলি। কিন্তু কল্পনা কথাটার একটা দুর্নাম আছে, এজন্য উহার অর্থ একটু শোধন করিয়া লইলে ভাল হয়। কবিদের দেখা—একরূপ অনুভূতি; সে অনুভূতি শুধুই দেহের অনুভূতি বা মনের অনুভূতি নয়—আরও ভিতরের, সে যেন একটা পূর্ণতর চৈতন্যের অনুভূতি। ইহাতে সাধারণ জ্ঞানবৃত্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া ভাষায় তাহার পরিচয় ঠিকমত দেওয়া দুরূহ। আমাদের বাক্য ও বাক্‌পদ্ধতি যে ক্রিয়ার প্রয়োজনে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা হইতে ইহা ভিন্ন, তাই কবির এই দেখার প্রকারটিকে কবিও বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে পারিবেন না; বুঝাইবার প্রয়োজনও হয় না, কারণ, কবিরা যাহা দেখেন, তাহা ঠিক তেমনই করিয়া আমাদিগকেও দেখাইয়া থাকেন—সেই দেখা আমাদেরও দেখা হইয়া উঠে। তথাপি চিন্তার সাহায্যে, সেই দেখার বিশেষত্ব আমরা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারি—তাহা হইতেই এই কল্পনা বা কবিদৃষ্টির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়। কবির সেই দেখার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে জগৎ ও জীবনের সব কিছু রূপান্তরিত হইয়া আমাদের প্রাণের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। ইহাও আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সে সময়ে আমরা চিন্তা করি না, বিশ্লেষণ করি না; কেমন করিয়া এমনটি ঘটিল, তাহার ভাবনাও থাকে না। অথচ তখন আমাদের চৈতন্য যে নিদ্রিত বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে তাহা নয়, বরং তাহা অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়াই আমরা কাব্যরস-আস্বাদনে এত আনন্দ পাই। যদি বলি যে, দৈনন্দিন জীবনের যে জাগ্রত অভিজ্ঞতা, তাহাই

আমাদের গভীরতর চৈতন্যকে আবৃত করে; যাহাকে আমরা সজ্ঞান অবস্থা বলি, তাহাই আমাদের অন্তশ্চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখে; যদি বলি, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাহা আমাদের [illegible] মনেরই একটা ষড়যন্ত্রের ফল—সেইজন্যই আমরা জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না; সে কেবল আমাদিগকে আঘাত করে মাত্র, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব-কোলাহল তুলিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে, নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া আমাদের মনকে মুক্ত হইতে দেয় না, এবং জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদিগকে জীবনের বহির্দ্বারেই বসাইয়া রাখে;—তাহা হইলে আপনারা চমকিত হইবেন না, কারণ, ইহা যে সত্য, তাহা কাব্যরস-আস্বাদনকালে আপনারা ক্ষণকালের জন্যও উপলব্ধি করেন। তথাপি আপনাদের অনেকেই হয়তো বলিবেন, জগৎ ও জীবনের সেই রূপান্তর—যাহা কাব্যে আমরা অনুভব করি—তাহা আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু পরে ইহাই বোধ হয় যে, তাহা সুখস্বপ্নের মত মিথ্যা; কবির সেই দেখা ও দেখানো যাহার দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা কল্পনা মাত্র,—সত্যের উপরে সুমোহন মিথ্যার জাল বিস্তার করিবার সে এক আশ্চর্য্য যাদুশক্তি। এ কথার উত্তরে আমি কেবল একটা প্রশ্নই করিব, তাহা এই যে, আপনারা কাব্যরস-আস্বাদনকালে স্বপ্নে-লাখ-টাকা-পাওয়া ভিখারীর মত পুলকবিহ্বল হন—না, সুখ-দুঃখের অতীত, দেশকালহারা সর্ব্বসংশয়-মুক্তির একটা অপূর্ব্ব চেতনার অধিকারী হন? মুহূর্তের জন্যও হন কি না? এইরূপ অনুভূতি হইতে কোন রসিক ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে পারেন না; যাঁহারা হইয়া থাকেন, তাঁহারা পুণ্যবান—অর্থাৎ রসিক—নহেন, তাঁহারা জগন্নাথ দেখিবার সময়েও লাউ-মাচা দেখিয়া থাকেন। যদি কোন প্রকৃত রসিক এমন কথা বলেন, তবে তাঁহাকে আমি বলিব—"হয়, Zাস্তি পার না।" ইহারই নাম আনন্দ; আর, আগে যে অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সুখানুভূতি মাত্র—সেখানে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে নাই, জাগ্রত চেতনার সেই অতিস্থূল সংস্কারই একটা ভিন্ন দেশকালের আশ্রয়ে একই মোহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কবির এই যে দেখা ও দেখাইবার শক্তি, তাহাকেই আমরা নূতন অর্থে কল্পনা নাম দিয়াছি। এই দিব্যদৃষ্টির ফলে খণ্ডের মিথ্যা পূর্ণের সত্যে পরিণত হয়,—জীবনের সমগ্র রূপ সেই অনুভূতিকেন্দ্রে মণ্ডলায়িত হইয়া দেখা দেয়; ইহাকেই আমি 'রূপান্তর' বলিয়াছি, এবং এই রূপান্তর যে মিথ্যা নয়, তাহার প্রমাণ ঐ আনন্দ। ভাল করিয়া স্পষ্ট

করিয়া বলিতে না পারিলেও,—সকল যুগের সকল দেশের রসিক ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশের—এই বাংলা দেশেরই—এক পুরাণকার তাঁহার গ্রন্থে (বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ) প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

ন কবের্ব্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ।
সর্ব্বোপর্য্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যে ন চৈব হি॥

—অর্থাৎ, 'কবির বর্ণনা মিথ্যা নয়, কবিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর। কবিগণের দৃষ্টি সকলের দৃষ্টির উপরে, আর কেহ তেমন দেখে না'। বেশ মনে হয়, আমরা এখানে যাহা বলিতেছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই লেখক ঠিক সেই কথাই বলিতেছেন। কবির বর্ণনা মিথ্যা হইতে পারে না—এই কথা খুব বড় কথা, আধুনিক কবিও এক স্থানে ঠিক সেই কথা বলিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছেন—

সেই সত্য যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

তাহা ছাড়া, উপরি-উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটিতে আরও দুইটি এমন শব্দ আছে, যাহার ব্যবহার আধুনিকতম কাব্যবিচারে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি 'সৃষ্টিকর' ও 'পশ্যন্তি' এই দুইটি শব্দের কথা বলিতেছি, আপনারাও কাব্যবিচারে এই দুইটি শব্দের বিশেষ অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন। 'পশ্যন্তি'র অর্থ যে-'দেখা' এবং কবির কাজ যে 'সৃষ্টি করা'—'কল্পনা' বলিতে তাহার অধিক বুঝিতে হইবে না; অথচ ইহা যে কতখানি, তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্য-রসের অতি সূক্ষ্ম বিচার ও কাব্যরচনা-কৌশলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু এ জিজ্ঞাসা নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, শাস্ত্র এক জিনিস, আর রসিক-হৃদয়ের সাক্ষ্য আর এক বস্তু। কাব্যবিচার যিনি করিবেন, তাঁহার এই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, তাঁহাকেও এক হিসাবে কবি হইতে হইবে। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের লেখক পুরাণকার হইলেও তাঁহার সে উপলব্ধি হইয়াছিল, যাঁহারা পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী কাব্যসমালোচক, তাঁহাদের তাহা হয় নাই। অতএব কাব্য-আলোচনায় এই কল্পনা-শক্তিকেই সর্ব্বাগ্রে প্রণতি নিবেদন করিতে হইবে; ইহার প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নাই, কাব্য-সমালোচনাতেও তাহার অধিকার নাই—এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। জ্ঞান নয়, পাণ্ডিত্য নয়, ভূয়োদর্শন নয়, বয়সের গৌরবও নয়—প্রতিভার

ভাষায়, বহুশ্রুত বা মেধাও নয়—এ অধিকার কেহ চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে পারে না, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ',—ইনি যাহাকে আপনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ ইহা সহজাত বা প্রাক্তন; ইহা সেই শ্রদ্ধা, যাহার অভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও নিষ্ফল। এজন্য, যাহার ইহা নাই সে যেন—যাহার আছে তাহাকে ঈর্ষা, নিন্দা বা বিদ্রূপ না করে; সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির সাধনায় রত থাকিয়া আপনার ইষ্ট লাভ করুক; কিন্তু, সেই সকলের কোন একটিকে উদ্দেশ্য করিয়া এ রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা—যাহা আজকাল অনেকেই করিতেছেন—তাহার মত অধর্ম্মাচরণ আর নাই।

৪

কাব্যের আকৃতি, অর্থাৎ তাহার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তির সম্বন্ধে আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে। পদ্যে রচিত না হইলে আমরা কোন রচনাকে কাব্য বলি না; গদ্য-কবি হইতে হইলেও (আজকালকার ফ্যাশন অনুসারে) বাক্যগুলিকে পদ্যের মত চরণযুক্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকের বচনই যথার্থ—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। পদ্য ও গদ্য—কাব্যের দুই রীতি মাত্র, কাজে দুইই এক। কবি হইবার জন্য জোর জবরদস্তি করিয়া অতিশয় রসহীন বাক্যকেও পদ্যের আকৃতি দিবার চেষ্টা হাস্যকর। ভাব-কল্পনার প্রকৃতি ও ক্ষেত্র অনুসারে কাব্য পদ্য বা গদ্য-রীতি আশ্রয় করে। মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির বিষয় একই—কাব্যের সেই চিরন্তন বিষয়, কিন্তু ইহাদের রচনায় যে রীতিভেদ বা আকৃতির পার্থক্য আছে, তাহার কারণ, বিষয় এক হইলেও কবি-কল্পনার প্রকৃতি এক নয়। মহাকাব্য ও উপন্যাস তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উহাদের ধরণ প্রায় এক, কেবল জীবনের যে দিক বা স্তর কবির কল্পনাকে অধিকার করিয়াছে, তাহারই প্রয়োজনে একটি সহজে পদ্যময় হইয়া উঠিয়াছে, অপরটি গদ্যকেই বাহন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই দুইয়ের দ্বিবিধ প্রেরণা লক্ষ্য করিলেই গদ্য ও পদ্যের পৃথক উপযোগিতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। নাটকেও গদ্য ও পদ্যের স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে; আজকাল নাটক হইতে পদ্য বহিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাই প্রমাণ হয় না যে, পদ্য-নাটক খাঁটি নাটক নয়; যাহারা এমন কথা বলে, রসিক-সমাজে তাহারা কৃপার পাত্র বটে। তথাপি এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে,

গদ্যেই হউক আর পদ্যেই হউক, কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে কবির সেই দৃষ্টির উপরে—সেই দেখাইবার শক্তির উপরে। যখন কোন কাব্য পাঠ করি, তখন এ বিচার করিবার অবকাশ থাকে না যে—ইহা পদ্য না গদ্য। কোন্ কাব্যের পক্ষে কোন্‌টা উপযোগী সে বিচার করেন কবি—কিংবা কবিও নয়, কাব্যের কল্পনা-বীজ বা মূল-প্রেরণায় তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কবির দৃষ্টিতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা যদি সত্যকার প্রকাশ হয়, তবে, তাহার সেই রস-রূপ আপনার বাণীদেহের আকৃতি আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কবিকেও ভাবিতে হয় না। কথাটা আর একটু স্থূলভাবে—হিসাব করিয়া বলি। কবির অন্তরে কাব্যের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, ধরা যাক তাহার উপাদান দুইটি—ভাব ও বস্তু; ভাব, অর্থাৎ কবির নিজস্ব অনুভূতি, এবং বস্তু, অর্থাৎ জীবন ও জগৎ-ঘটিত ব্যাপার। কাব্যের সেই বীজের মধ্যেই এই দুই উপাদানের পরিমাণ বা মাত্রাভেদ গোড়া হইতে থাকে। বস্তুর মাত্রা যদি বেশি হয়, তবে সে কাব্য গদ্যে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক; যদি ভাবের মাত্রা বেশি হয়, তবে তাহা পদ্যচ্ছন্দে কবিতার আকারে প্রকাশ পায়। আবার যদি তাহা একেবারে ভাবসর্ব্বস্ব হয়, অর্থাৎ বস্তুর সম্পর্ক যদি প্রায় শূন্য হয়, তবে তাহা শব্দের সুর-রচনা বা গীত হইয়া উঠে। এ হিসাব কিন্তু একটা মোটা হিসাব—ব্যাপারটা বুদ্ধিগম্য করিবার উপায় মাত্র, যদিও বুদ্ধির প্রবেশ এখানে নাই। উৎকৃষ্ট কাব্যের পক্ষে, ভাব ও বস্তুকে এইরূপ হিসাব করিয়া ভাগ করিয়া দেখানো সম্ভব নয়, সেখানে ভাব ও বস্তুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব আসিয়া পড়ে। যাহাকে আমরা এখানে 'ভাব' বলিতেছি, তাহা 'বস্তু' হইতে পৃথক একটা কিছু নয়; কবির হৃদয়ে বস্তু যে 'বিশেষ'-রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই ভাব; অতএব ভাবই হইতেছে সেই ছাঁচ, যাহা কবিতার বস্তুকেও তাহার বিশিষ্ট রূপটি দিয়াছে; এবং যেহেতু এই বিশিষ্ট রূপই কবিতার সর্ব্বস্ব—বস্তু এখানে ঐ রূপ ধরিয়াই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—অতএব, কাব্যবিচারে ভাব ও বস্তুর পার্থক্যবিধান তত্ত্বসঙ্গত নয়। কিন্তু এখানে এরূপ তত্ত্ববিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই—একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেই যথেষ্ট; আমাদের ঐ হিসাবটাই আর একটু টানিয়া চলিব। নাটকের কথা বলিতেছিলাম। নাটক ও উপন্যাস এক নয়; তথাপি শেক্স্পীয়ারের পদ্য-নাটকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্যের—তাঁহার উপন্যাসগুলির—তুলনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-ট্র্যাজেডিগুলি যেমন নাটকও নয়, তেমনই পদ্য-কাব্যও

নয়; অথচ শেক্স্‌পীয়ারের নাটকীয় ট্র্যাজেডির অনেক লক্ষণ তাহাদের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে; এবং গদ্যে হইলেও সেই কবিত্ব তাহাতে প্রচুর। কিন্তু তথাপি সেগুলি নাটকের আকার পায় নাই এইজন্য যে, তাহারা কেবল দৃশ্য নহে, পাঠ্যও বটে—ঘটনাবস্তু হইতে কবি আপনাকে একেবারে সরাইয়া লইতে রাজি নহেন,—কেবল দেখিলেই চলিবে না, তাঁহার কথাও শুনিতে হইবে; এইজন্য নির্ম্মাণকৌশলেও ইহা গদ্য-কাব্য, নাটক নহে। ইহারও কারণ, কবির দৃষ্টি এখানে কেবল রসদৃষ্টিই নহে, সেই রসদৃষ্টির সঙ্গে একটা সচেতন ব্যাখ্যা-প্রবৃত্তি আছে। অতএব, যেজন্য তাহা নাটক হইতে পারে নাই, সেইজন্য তাহা গদ্যও হইয়াছে। নাটকও গদ্য হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়াও নাটক হয় নাই কেন, তাহা বলিয়াছি; আবার, ভাব-প্রধান হইয়াও তাহারা গদ্যচ্ছন্দ আশ্রয় করিয়াছে কেন, তাহাও বলিতেছি। এই কাব্যগুলিতে কবির রসদৃষ্টি বস্তুর ভাবরূপকে যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তেমনই, সেই ভাবরূপের উপরে আপনার অতিজাগ্রত মানসচেতনার শাসন কখনও ত্যাগ করে নাই। যে আধ্যাত্মিক বৃত্তিবিশেষকে আমাদের শাস্ত্রে বিবেক বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রবৃত্তিকে সেই বিবেক ভিতর হইতে বল্গাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে রস-সঙ্গ করিয়াও পুরুষ আপনাকে অসঙ্গ রাখিতে চায়; সেই সঙ্গ-সুখের মধ্যেই যে মুক্তি, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। কবি-মানসের এই অতিজাগ্রত চেতনা জগৎ ও জীবনের রসরূপকেই একান্ত হইতে দেয় নাই—রূপরসের যে আত্যন্তিক আবেশ বাণীকে ছন্দোময় করিয়া তোলে, তাহাকে বশে রাখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-গুলি পদ্য-নাটক না হইয়া গদ্য-ট্র্যাজেডি হইয়াছে। শেক্স্‌পীয়ার ও বঙ্কিম উভয়ের কাব্যের বিষয়বস্তু এক, এবং কবিপ্রেরণাও মূলে সগোত্র বলিয়া মনে হয়, তথাপি একজনের কবিদৃষ্টি অবিমিশ্র বলিয়া—জগৎ ও জীবনের বস্তুগত সত্তাকে রসরূপে আত্মসাৎ করিবার শক্তি দ্বিধাহীন বলিয়া—তাহা কাব্যমন্ত্র-সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছে; অপরের দৃষ্টি সেইরূপ দ্বিধাহীন নয়—বস্তু ও ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, একে অন্যের উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত একেরই জয় হইয়াছে। অথচ এই কাব্যগুলির উপাদান ও প্রেরণা এমনই যে, গদ্য-উপন্যাস হইলেও তাহারা বার বার শেক্স্‌পীয়ারকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

৫

আর একটি বিষয়ে কিছু বলিয়া আজিকার আলাপ শেষ করিব। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহা হয়তো তেমন কাজে লাগিবে না; কিন্তু ইহারই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব, তাহা সাধারণ কাব্যপাঠকেরও কিঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা সাক্ষাৎ কাব্য-পরিচয়ের সুবিধা হইতে পারে। আপনারা সকলেই নাটক, নভেল, এমন কি কবিতা পড়িতেও ভালবাসেন—কেন ভালবাসেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। এই সকল রচনায় আমরা আর একটা এমন জীবনের স্বাদ পাই, যাহা আমাদের চিত্তকে ক্ষণকালের জন্যও সুস্থ করে। কবিকল্পনা বা কবিদৃষ্টির প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ করিব না, বোধ হয় আপনাদের তাহা স্মরণ আছে—এই আর এক জীবন ও জগতের উদ্ভাবনাকে একটা মিথ্যা স্বপ্নরচনা মনে করা যে ভুল, তাহাই বলিয়াছিলাম। এখন আমি সেই কথাটাই একটু ভাঙিয়া কাব্যের প্রকৃতি-ভেদের কথা বলিব। ধরিয়া লওয়া যাক, অধিকাংশ কাব্যের মতলবই এই যে, আমরা যেন তাহাতে বাস্তব জীবনের এই দাহ হইতে একটা শীতল আশ্রয় পাই। জগতে যাহা নাই, কিন্তু আমাদের গভীরতর চেতনায় যাহা কল্পনা করিয়া আমরা আশ্বাস পাই,—এই সকল কাব্যে, কবিগণ তাহারই অনুযায়ী একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই জগৎকে আমরা যদি বাস্তব হইতে পলাইয়া বাঁচিবার জগৎ বলি, তবে তাহা মিথ্যা হইবে না—এ বিষয়ে আপনারা সকলেই একমত, তাহা জানি। অতএব একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচকের অনুসরণ করিয়া আমরা এই ধরণের কাব্যকে "Poetry of Refuge" বা আশ্রয়-সন্ধানের কাব্য বলিতে পারি। ইহাতে প্রখর সূর্য্যালোক জ্যোৎস্নালোকে পরিণত হয়; অথবা, সূর্য্য যেন মধ্যগগনে না উঠিয়া পূর্ব্বাকাশেই ভ্রমণ শেষ করিয়া অস্ত যায়; যত কিছু শোক-তাপ একটি স্নিগ্ধ সান্ত্বনার রসে সিঞ্চিত হয়, কখনও বা অশ্রু হাসির ছদ্মবেশে পরম রমণীয় হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা স্বপ্ন-রচনা নয়; ইহাও এক প্রকার সৃষ্টি—একটা সুসম্বদ্ধ সুসংস্থাপিত জগৎ। অন্তরের অন্তরে আমরা ইহাকে সত্য বলিয়াই অনুভব করি, কারণ ইহার মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সুষমা আছে। স্বপ্নে তাহা থাকে না, তাহাতে কোন সুসম্পূর্ণ জগৎ নাই,

কোন শৃঙ্খলা নাই—তাহা তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার অনাসৃষ্টি মাত্র। অতএব এখানেও যে কল্পনার ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা কবি-কল্পনা; সেই কল্পনা যেন ধ্যানে বসিয়া, কোন এক নিগূঢ় প্রেরণার বশে, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই কণ্টকহীন করিয়া, তাহার সকল কঠিনতা দূর করিয়া, এমন একটি ছাঁদে মাল্যরচনা করে যে, মানুষ তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ক্ষণিকের জন্য জীবন-মুক্তির আনন্দ পায়।

এইবার আর এক জাতীয় কাব্যের কথা বলিব। এ কাব্যে কবির কল্পনা জীবনকে মুখামুখি দেখিবার, এমন কি তাহার অন্তস্তল ভেদ করিবার দুঃসাহস করিয়াছে। 'Poetry of Refuge' না বলিয়া ইহাকে 'Poetry of Interpretation' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই Interpretation বা ব্যাখ্যা দুই রকমে বা দুই উপায়ে হইতে পারে। জীবনের যত দ্বন্দ্ব—সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব পুরামাত্রায় স্বীকার করিয়াই, তাহাকে এমন একটি দৃষ্টির দ্বারা মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনার অনুগত করা যায় যে, মানুষকে তাহার জন্য আর হতাশ হইতে হয় না। ইংরেজ কবি শেলী ও আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই শ্রেণীর কাব্য। এই সকল কাব্যে কবির কল্পনা জীবনের সকল বিরূপতাকে একটা সুষম-রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছে—ভ্রম-সংশয়, দৈন্য-দুর্দ্দশা, কুরূপ-কুৎসিতের সমাধানমূলক এক একটি বাণী তাহাতে রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় কাব্যের আর এক স্তর আছে, সেখানেও কবির সৃষ্টি সমাধানমূলক বটে, কিন্তু তাহাতে সেই সমাধান এইরূপ কোন আদর্শ বা আইডিয়ার দ্বারা হয় নাই। সেখানে কবি-চিত্ত জীবনের ভীষণতম মূর্ত্তিকে, শুধু স্বীকার নয়—বরণ করিয়াছে; যে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি বা দেহ-দশাকে জয় করিতে না পারিয়া মানুষ নৈরাশ্যে অবসন্ন হয়—অতিশয় শক্তিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তিও চরম বিড়ম্বনা ভোগ করে, এ সকল কাব্যে কবির দৃষ্টি তাহার প্রতিই দৃঢ়বদ্ধ, এবং সেই দ্বন্দ্বকেই পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া তাহার যে রসরহস্য উদ্ঘাটিত করে, তাহাতেই আমাদের অন্তরে এক আশ্চর্য্য উপায়ে প্রহেলিকার সমাধান হইয়া যায়,—দুঃখ দুঃখরূপেই আমাদের প্রাণে একটি প্রশান্তির উদ্রেক করে। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, আসক্তি ও বিদ্বেষের মূলে, জীবনের সকল কোলাহল—উল্লাস ও আর্ত্তনাদের মধ্যে—যে মহাশক্তির লীলা রহিয়াছে, তাহা

প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের আত্মসম্বিৎ যেন বাড়িয়া যায়, আমরাও সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া যাই। উপরি-উক্ত ইংরেজ সমালোচক এই দুই স্তরের কাব্যকেই এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন—কেবল কবিদৃষ্টির পরিধি ও প্রখরতার তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহা শুধু এইরূপ স্তরভেদ নয়, কবির দৃষ্টিগত পার্থক্যও ইহাতে আছে। প্রথমোক্ত কাব্যে, Interpretation—বা, অনর্থের একটা অর্থ করিবার অভিপ্রায় আছে, কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে অর্থ-অনর্থের ভেদ-জ্ঞানই যেন নাই। এই দ্বিতীয় স্তরে আছে—মহাভারতের কাব্যাংশ, শেক্স্পীয়ারের 'লীয়র', 'হ্যাম্লেট', আমাদের মধুসূদনের 'মেঘনাদ', ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা'; প্রথম স্তরে আছে—শেলীর 'প্রোমিথিউস', রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর কাব্য ও নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি। কাব্যগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি মাত্র—কক্ষভুক্ত করি নাই; কেহ যেন মনে না করেন যে, কাব্যহিসাবে তাহারা যে সকলে সমান, ইহাও আমার অভিপ্রায়; সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই জাতি ভিন্ন কাব্যের আর কোন জাতির অস্তিত্ব সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক কালে সাহিত্যের যে নানা ভঙ্গি দাঁড়াইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি বা রসপিপাসা চরিতার্থ করা নয়, বরং যাহাতে কাহারও রসপিপাসা আর না হয়, তাহারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অতএব আমাদের আসরে সেগুলিকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। তথাপি ধর্ম্মত বলিতে হইলে, এই আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে, দুই একজন বিদেশী লেখকের রচনায় (একজনের কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে) এক নূতনতর কবি-দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি; তাহাতে, 'Refuge' বা 'Interpretation'—কোনটাই নাই; সান্ত্বনাও নাই, সমাধানও নাই। সে কাব্যে জীবনের বাস্তবকেই এমন এক রূপে উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে যে, তাহাকে যেমন স্বীকার করিতে হয়, তেমনই, তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি আধুনিক সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের কথা বলিতেছি না। এ বাস্তব দেহসম্পর্কহীন মন, অথবা মন-সম্পর্কহীন দেহের বাস্তব নয়; ইহার দৃষ্টি আরও গভীর—এ সকল রচনায় মানুষের প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর শাসনে তাহার বিবেক ও বুদ্ধির লাঞ্ছনা ও জীবনের নিষ্ফলতা এমন করিয়া চিত্রিত

হইয়াছে, এবং তাহাতে মানুষের শক্তি ও অশক্তি, তাহার ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, পরস্পরকে এমন পরিহাস করিতে থাকে যে, তাহাই তাহার একমাত্র নিয়তি বলিয়া মনে হয়; এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা বিমূঢ়তাই জাগে। ইহাতে ট্র্যাজেডিও নাই, কমেডিও নাই; ব্যাখ্যা নাই, বিশ্লেষণ নাই, কোন জিজ্ঞাসাও নাই—কারণ, সকলই নিষ্ফল। তথাপি, মানুষের সামাজিক বা নৈতিক সংস্কার, এমন কি, আত্মরক্ষামূলক স্বার্থসংস্কারেরও অন্তরালে সেই প্রবৃত্তি-রূপ নিয়তিকে এমন করিয়া দেখিবার যে দৃষ্টি, তাহাকেও এক প্রকার কবি-প্রতিভাই বলিতে হইবে। কিন্তু এই জাতীয় কাব্য ওই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টিতে পড়ে? চেষ্টা করিলে বোধ হয়, দ্বিতীয়টির কোন এক স্তরে ফেলিতে পারা যায়, নতুবা গত্যন্তর নাই।

আজ এই পর্য্যন্ত—এ আলাপের শেষ নাই। তবু যে এতদূর চলিয়াছে, তাহার কারণ, ইহার আগাগোড়াই একতরফা। প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিই নাই, ভুল করিলেও তাহা ধরাইয়া দিবার—লোক নাই বলিব না—উপায় ছিল না। আবার, এত বেশি সময় লইয়াছি যে, ইহার পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ধৈর্য্য থাকা অসম্ভব। তথাপি আশা করি, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সব না হউক, কতকটা আপনাদের মনে ধরিবে। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আজ যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন তত্ত্ববিচারের অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি কোন কোন স্থানে আমার ভাষা তত্ত্বগন্ধী হইয়া উঠিয়াছে তাহা জানি, আপনারা সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।*

* সঙ্গীত-সাহিত্য-বিতানের (টালা, কলিকাতা) সাহিত্য-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য

১

বিষয় 'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য'; কিন্তু প্রথমেই, 'বাংলা সাহিত্য' বলিতে কি বুঝিতে হইবে?—নিশ্চয়ই, যাহা বাংলা ভাষায় লিখিত, এবং বাঙালী-জীবন ও বাঙালী প্রাণমনের কাহিনী; অর্থাৎ, যাহা 'বাংলা' এবং 'সাহিত্য'। আজিকার আলোচনায় আমি বর্ত্তমান সাহিত্যের 'সাহিত্য' কথাটি আরও একটু সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি; কারণ, আমি কেবল সেই ধরনের রচনার আলোচনা করিব, যাহাকে খাঁটি সৃষ্টিধর্ম্মী বলা যায়। বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যে, সেই জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র নিদর্শন পাই গল্পে ও উপন্যাসে। নাটকের কথা আমি বলিব না, বলিলে অনেকেরই ভাল লাগিবে না; যাঁহারা এই ইঙ্গিতে ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদিগকে একটা সান্ত্বনার উপায় বলিয়া দিতেছি—তাঁহারা যেন আমার উপরে রুষ্ট না হইয়া, ইহাই মনে করেন যে, আমি নাট্যরসবঞ্চিত, প্রেক্ষাগৃহত্যাগী, হতভাগ্য ব্যক্তি; আমার নাটকসম্বন্ধে কোন 'বাসনা' বা 'সংস্কার'ই নাই; অতএব সে সম্বন্ধে আমার বলিবার অধিকারও নাই। কিন্তু কবিতার সম্বন্ধেও আমি ওইরূপ কথা নিজমুখে বলিব না; অথবা সে সম্বন্ধে কেবল ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইব না। কারণ, আমি বলিব—বর্ত্তমানে বাংলা কবিতা মরিয়াছে, শুধুই মরা নয়—মরিয়া ভূত হইয়া বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছে। অতএব গল্প-উপন্যাস ছাড়া আর কিছুরই সংবাদ উপস্থিত পাওয়া যাইতেছে না। সে সংবাদ যে অতিশয় শুভ ও আশ্বাসজনক, আমি তাহাই বলিতে বসিয়াছি। এই গল্প-উপন্যাস যাঁহারা লিখিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই সম্প্রতি কয়েকজন এ সাহিত্যে স্থায়ী আসন-লাভের অধিকারী হইয়াছেন। এখানেও একটা কথা পুনরায় বলিয়া রাখি; আমি আমারই সাহিত্যিক বিচার-বুদ্ধি ও আদর্শ অনুযায়ী আলোচনা করিব—সে বিচার আমারই; তাহার সহিত কাহারও মতদ্বৈধ হইলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, এবং হইলে—কেহ, বা কোন পক্ষ যেন ক্ষুণ্ণ না হন। আমার মতের মূল্যবিচার করিবেন তাঁহারাই, যাঁহারা নিঃস্বার্থ সাহিত্যপ্রেমিক ও সাহিত্যজ্ঞানী; যাঁহারা নিজেরাই এই সাহিত্য-রচয়িতা বলিয়া

অভিমান পোষণ করেন তাঁহারা, অথবা তাঁহাদের দল বা ভক্ত-সম্প্রদায় খুশি হইবেন কি না, সে ভাবনা আমার আদৌ নাই। আমি যাহা বলিব, তাহা সমসাময়িক সমাজের মুখ চাহিয়াই নয়—আমার এ স্পর্দ্ধাও আছে যে, আমার বক্তব্যের অন্তত কিছুও এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিচার-সভায় প্রতিধ্বনিত হইবে। আমি এমন কথাই বলিব যাহা, আমার জ্ঞানে ও বিশ্বাসে, পক্ষপাতপ্রসূত নয়; সাহিত্যিক নয়—সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই তাহার কারণ। এক্ষণে আরও দুই-চারি কথা বলিয়া আমার আলোচনার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিব।

২

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাংলাসাহিত্য বলিতে আমি বাংলাভাষায় রচিত বাঙালীর নিজের জীবন, তথা নিজেরই প্রাণমনের গূঢ় গভীর ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়-কাহিনীই বুঝিব। 'সাহিত্য' শব্দটি যতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হউক, শেষ পর্য্যন্ত তাহা জাতির ভাষায় জাতির আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আর কিছুই নয়; সেই আত্মসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠ কবিগণের প্রতিভায় এমন স্তরে গিয়া পৌঁছায় যে, তাহা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। অতএব, আমি এই গল্প-উপন্যাস-সাহিত্যের বিচারেও সেই এক মাপকাঠিই ব্যবহার করিব; ভাল-মন্দ বিচারের পূর্ব্বেই, আমি সেই সকল উপন্যাসকে সযত্নে দূরে পরিহার করিয়াছি—যেগুলি বাংলাও নয়, বাঙালীরও নয়। বর্ত্তমানকালে শহর নামক পীঠস্থানেই সকল শ্রেষ্ঠ ভাবচিন্তার ধারা আসিয়া মিলিত হয় বটে, এবং যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে দেশের ও জাতির নেতৃস্থানীয়, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র হয় শহর; কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে,—প্রথমত, বাঙালী জাতি এখনও শহরবাসী হয় নাই; এবং তাহার জাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতি—আজও পর্য্যন্ত যেটুকু খাঁটি অবশিষ্ট আছে—তাহা পল্লীরই স্তন্যরসে পুষ্ট। দ্বিতীয়ত, পরাধীন জাতির পক্ষে নাগরিক সভ্যতা যে কত বিষময় ও ভয়াবহ, তাহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বত্র চাক্ষুষ করিতেছি। যাহাদের আত্মা আর সুস্থ নাই, যাহারা একান্তই পরানুচিকীর্ষু ও আত্মভীরু, যাহারা নিজের জাতি কুল ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে—অর্থাৎ পিতা-মাতার সম্বন্ধেও—লজ্জা অনুভব করে, তাহাদের পক্ষে বিদেশ হইতে সদ্য জাহাজে-আমদানি-করা পণ্য-সভ্যতা যে কি ভয়ানক অহিতকর, তাহা বাংলাসাহিত্যের

ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শহরই এই পণ্য-সভ্যতায় মহাবিপণি; আত্মভ্রষ্ট পরাধীন জাতির পক্ষে এই বিপণি সেই সম্প্রদায়ের মাথা বেশি করিয়া ঘুরাইয়া দিয়াছে, যাহাদের মন একেবারে সকল সংস্কৃতিদোষবর্জ্জিত ছিল, যাহারা ইতিপূর্ব্বে ইহার নিকটেও বাস করে নাই; তাহারাই এই 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি'তে নিঃশেষে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। ইহারা সাহিত্যের নামে যাহা রচনা করে—সেই গল্প-উপন্যাস প্রভৃতিতে ইহাদের আত্মকথা নাই, ইহাদের নিজেদের দেশ ও সমাজের কোন ধারণা বা স্বজাতীয় সভ্যতার কোন ঐতিহ্য-সংস্কার নাই; ইহারা যে ভাষায় লেখে, তাহাও যেমন ইংরেজীর আক্ষরিক প্রতিধ্বনি, তেমনই, যে জীবন ইহারা 'ভণিয়া' থাকে তাহাও বিদেশীর নিকটে ধার-করা একটা মুখোস মাত্র; সেইজন্য ইহারা জীবনকে 'প্রকাশ' করিতে পারে না—'ঘোষণা' করিয়া থাকে। ইহাদের রচনায় বাঙালী কখনও তাহার প্রাণের গভীরতম আকুতির সাড়া পাইবে না—বাংলাদেশের জল-মাটি আকাশ-বাতাসের একটা তাজা রংও তাহাতে খুঁজিয়া পাইবে না। ইহাদের জন্মলাভ হইয়াছে দেহে নয়—মনে, অর্থাৎ কতকগুলি কেতাবী বুলির জগতে। জীবন যে কি, তাহা ইহারা জানে না; জীবনকে জানিতে হইলে যে একটিমাত্র উপায় আছে, সেই উপায় ইহাদের নাই,—ভূতপিশাচদের যেমন থাকে না। দেহ ধারণ করিয়া, তপ্ত হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন-পুলকে দেহীগণের সমাজে মিশিয়া, দেহেরই তীব্র উৎকণ্ঠায় মনকে ভাব-কল্পনার দিব্যদৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করার যে পরম কবি-সৌভাগ্য, তাহা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে কেমন করিয়া? ইহারা জীবনের সেই অনুভব-বাণীর পরিবর্ত্তে 'স্লোগান' গাহিয়া কৃতার্থ হয়। দেহের শিরা-স্নায়ুতন্ত্রীর যে আঘাত-বেদনা প্রাণের দিব্যবেদনায় রূপান্তরিত হইলে, তবেই সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়—সে বেদনা ইহারা বোধ করা দূরে থাকুক—কল্পনা করিতেও পারে না; অর্থাৎ, কাব্য-সৃষ্টি করা দূরের কথা, কাব্যরস আস্বাদনের শক্তিও ইহাদের নাই। অতএব, সাহিত্যিক-নামলুব্ধ, আত্মকৃতিত্ব-মুগ্ধ, জন্মমাত্রেই মৃত্যুব্যাধি-গ্রস্ত—এবং সেইজন্যই, আত্মরক্ষা-ব্যাকুল, দলগঠনপূর্ব্বক-প্রোপাগাণ্ডা-নিপুণ—এই হতভাগ্যগণের সাহিত্যিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তবু এত কথাই বা বলিলাম কেন? বলিবার কারণ আছে। এ যুগে আমাদের সমাজে সাহিত্যের ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তিরও যে বুদ্ধিভ্রম

লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে যাহা চিরন্তন তাহাকেও সাময়িকরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলাসাহিত্য এক্ষণে পণ্ডিতের গবেষণার বস্তু হইয়াছে—উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রগণকেও সেই গবেষণার ফলাফল ভোগ করিতে হয়। এতদিন যাহা মাসিক-সাহিত্য বা বৈঠকখানা-বিলাসের সামগ্রী ছিল, এক্ষণে তাহা বিদ্বৎ-সভার বিচারাধীন হইয়াছে; সেই বিচার গুরুতর গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া স্থায়ী মূল্য দাবি করিতেছে। অথচ তাহাতেও সেই বৈঠকখানাসুলভ বক্তৃতা—অর্থাৎ, ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত রুচি ও মনোভাবের অবাধ গতি সমান অব্যাহত থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এতবড় পণ্ডিতকেও মূল সাহিত্য-বস্তু সম্বন্ধে 'ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতা' দেখিয়া সন্তপ্ত হইয়াছি—কিন্তু বিস্মিত হই নাই; কারণ, এরূপ আলোচনায় যে বস্তুটির প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহা আদৌ সহজলভ্য নহে, এমন কি, 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। তাই গ্রন্থখানির নানাস্থানে পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও, অপর অনেক স্থলে যাহা আছে তাহাতে স্বতই বলিতে ইচ্ছা হয়—'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'। বুদ্ধি ও অবুদ্ধি, বিদ্যা ও অবিদ্যা, মোহ ও চৈতন্যের এমন অদ্ভুত সমাবেশ আর কোথাও দেখি নাই। এই গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসের যে ধারাবাহিক পরিচয় গ্রন্থকার দিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধারাবাহিকতার বেগ যেমন সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তেমনই বস্তু ও অবস্তুর ভেদ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। বাংলাসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের সহিত, তিনি অতি-আধুনিক অপসাহিত্যিকদিগকেও যুক্ত করিয়াছেন—অতিশয় নির্ম্মম বৈজ্ঞানিক-নিরপেক্ষতার সহিত, তিনি চন্দন ও বিষ্ঠাকে এক পাত্রে সঞ্চয় করিয়াছেন। যে সকল লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা তো দূরের কথা,—যাহারা বাংলা ভাষাও লিখিতে জানে না, তাহারা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে! ভদ্র-লোকের 'ইতিহাস' সম্বন্ধে একটা এমনই সভয় সংস্কার আছে—যে, যাহা-কিছু কালের ধারায় প্রকাশ হয়, যাহা-কিছু ঘটিতে পারে বা ঘটিয়া থাকে, তাহাকেও তিনি সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পারেন না; ইহাকেই বলে গবেষণা-কর্ম্মের 'thoroughness'। রসবোধ না থাকুক, পাণ্ডিত্যের বলেই তিনি যাহা বুঝিতে পারিতেন, তাহাও পারেন নাই; এইরূপ ইতিহাসে, অতিশয়

বর্ত্তমান কালের সাহিত্য সম্বন্ধে কোন পণ্ডিতই বিস্তারিত আলোচনা করেন না —মত প্রকাশ করা তো দূরের কথা; কেন না, এ কথা কে না জানেন যে, কালের কিঞ্চিৎ দূরত্ব বা ব্যবধান না ঘটিলে—এ সকল বস্তুর যথার্থ রূপ-নির্ণয় করা দুরূহ। পণ্ডিত হইয়াও তিনি এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। প্রথম হইতেই উপন্যাসের ধারাটিকে তিনি এমন বেগবান করিয়া তুলিয়াছেন যে, শেষে সে বেগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে পঙ্কগহ্বরে পতিত হইয়াছেন। এইরূপ ভ্রম হইবার কারণ আরও গভীর। গ্রন্থকারের সাহিত্যিক বিদ্যা আছে—বোধশক্তি নাই,—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির একান্ত অভাব আছে। তিনি 'উপন্যাস' নামক রসরচনাকে মূলে যে সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছেন, সেই সংজ্ঞাই ভুল। সাহিত্য যে একটা রূপকর্ম্ম—একটা আর্ট, এবং আর্ট-কল্পিত সৃষ্টির কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ লইয়া ইতিহাস-রচনা সম্ভব হইলেও, যেহেতু তাহার ভিতরকার রস-প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ম্প্রকাশ—এজন্য এক যুগের আর্টের সঙ্গে আর এক যুগের আর্টের কোন এভোলিউশন-ঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্য নাই;—এই তত্ত্ব স্বীকার না করিলে, সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া নানাবিধ ভ্রমে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। যুগ, দেশ ও সমাজের বহিরঙ্গনে যাহার বিকাশ, তাহাতে যুগপ্রভাব বা যুগলক্ষণ যতই থাকুক না কেন, এবং তাহারই সাহায্যে একটা ঐতিহাসিক ধারা নির্ণয় করা সম্ভব হইলেও, এইরূপ সাহিত্যের ইতিহাস যিনি লিখিবেন তিনি যেন কোন মতবাদকে প্রশ্রয় না দেন। 'উপন্যাস' বলিতে যদি বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার একরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি বুঝিতে হয়, এবং সেই মাপকাঠিতে মাপিতে মাপিতে যতই বর্ত্তমানের দিকে আসি, ততই উৎকৃষ্টতর উপন্যাসের সন্ধান পাই বলিয়া বিচার-কর্ম্ম আরও সহজ হইয়া উঠে, এবং শেষ পর্য্যন্ত অতি-আধুনিক উপন্যাসের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও কোন হিসাবে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে—তবে বুঝিতে হইবে, সমালোচকের দিক্‌ভ্রম হইয়াছে, তাঁহাকে আবার গোড়া হইতে পথ বাহিতে হইবে। যদি সমালোচকের মুখে এমন কথা শুনি যে, বাংলাসাহিত্যের রূপকর্ম্মের বিকাশধারায় ভারতচন্দ্র আগন্তুক, তাঁহার কাব্য সেই বিকাশের ধারাকে ব্যাহত করিয়াছে—কারণ, তাহা 'ময়নামতীর গান' বা 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র পথ রোধ করিয়া সত্যকার উপন্যাস-সৃষ্টির বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তবে ইহাই বলিব, সাহিত্য-বিচার এরূপ ব্যক্তির কাজ নয়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনায়

বাঁধা রাজপথে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিবার যে শক্তি তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ওই সাহিত্যের পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে ভালরূপে শিক্ষিত করুন—ইংরেজী সাহিত্যসম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ নাই, সেখানে কোন বিষয়ে কাহারও ভুল করিবার শক্তিই নাই। বাংলাসাহিত্যের সমালোচনায় যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহা কেবল অর্জ্জিত বিদ্যাই নয়, তাহার জন্য কিছু মূলধনও চাই। লজ্জার কথা এই যে, যিনি বাংলাসাহিত্যের বিচার করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার বাংলাভাষা সম্বন্ধেও সেই জ্ঞান নাই, যাহা দ্বারা অতি সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায়—কোন্ ব্যক্তি লেখকপদবাচ্য, কে নয়; আমি আর সকল লক্ষণ ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের (এমন গ্রন্থ আরও আছে, ঠিক এই শ্রেণীর পণ্ডিতের রচিত) প্রচার সহজ ও অনিবার্য্য হওয়ায়, বাংলা সাহিত্যের (বিশেষত বহুজন-পঠিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস প্রভৃতির) সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণার উৎপত্তি হইতেছে। অতএব আমি যে এই নিতান্ত সাময়িক ঘটনাকেও এ আলোচনায় এতখানি স্থান দিতেছি কেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন; আমি বলিব, এ সমাজে সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে এ দুর্গতিভোগ অনিবার্য্য।

বর্ত্তমানে বাংলাসাহিত্যের উপন্যাস-সম্পদের কথা বলিতে বসিয়াছি—সে প্রসঙ্গে কয়েকজন কৃতী লেখকের কৃতিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। কোন্‌গুলিকে কেন বাদ দিয়াছি, সে কৈফিয়ৎ এতক্ষণ সবিস্তারে দিয়াছি, তথাপি, একটা বিষয় উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে। আমি, সেই সকল লেখককেও আমার এ আলোচনার যোগ্য মনে করি না, যাঁহারা কেবল ভাষার একটু পরিচ্ছন্নতা অথবা গল্প বলিবার একটা ভঙ্গিমাত্র আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের রচনা সর্ব্বৈব অনুকৃতিমূলক, সত্যকার সৃষ্টি নহে। সৃষ্টি করিতে হইলে যে দৃষ্টির আবশ্যক, সে দৃষ্টি যে ইঁহাদের নাই, তাহার প্রমাণ—ইঁহারা সিনেমা-ছবির মত কতকগুলি কৌশল শিখিয়া লইয়াছেন; আধুনিক পাঠকের হৃদয়গ্রাহী কতকগুলি নিকৃষ্ট সেণ্টিমেণ্ট—এবং অতি গভীর সহৃদয়তা ও দার্শনিকতার ভঙ্গিসহকারে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের কৌশল তাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি হয় 'কম্‌রেডী' ভাববিলাস, নয় 'তরুণ-তরুণী'-বিদ্রোহের অতি তেজস্কর টনিক। আমি এগুলিকেও বাদ দিয়াছি।

৬

গত কয়েক বৎসরের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা আমার সহিত একমত হইবেন যে, আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক-গণের মধ্যে যশের নিঃসংশয় অধিকারী হইয়াছেন এই কয়জন—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'বনফুল' (শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)। আমি এই কয়জনকে প্রথম গণনীয় করিয়াছি এইজন্য যে, এক্ষণে ইঁহাদের শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—এবং সে শক্তি যে-কোন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকর। ইঁহাদের সমসময়ে, কিছু পূর্ব্বে বা পরে, আরও কয়েকজন লেখক শক্তিমান হিসাবে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—আগে তাঁহাদের সম্বন্ধেই বলিব। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং নূতনের পথিকৃৎ হিসাবে, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। শৈলজানন্দই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা সাহিত্যে 'regional' বা অঞ্চলবিশেষ ও সমাজবিশেষের জীবন উপন্যাসের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কয়লাকুঠি'র গল্পগুলিতে একটা নূতন রসের সৌরভ পাওয়া গিয়াছিল। পরে 'অতসী' ও 'নারীমেধ' নামক দুইখানি গল্পগ্রন্থে তাঁহার যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে একটি মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গি আছে। 'নারীমেধ'-এর গল্পগুলিতে যে-ধরনের 'রিয়ালিজ্‌ম' আছে, তাহা বাংলায় প্রথম, এবং বোধ হয়, আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমার মনে হয়, শৈলজানন্দের সাহিত্যিক প্রতিভা ও কীর্ত্তির পরিচয় ইহার অধিক আবশ্যক হইবে না। পরবর্ত্তীগণের মধ্যে এইরূপ বৈশিষ্ট্য দাবি করিতে পারেন—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সরোজ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই কবি-দৃষ্টি স্বতন্ত্র।

এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমি লেখকদিগের পর পর যে নামোল্লেখ করিতেছি, তাহা বয়স বা গুণানুসারে নয়—তাঁহাদের সাহিত্যিক খ্যাতি-লাভের কালক্রম অনুসারে, এবং তাহাও আমার নিজের যেরূপ স্মরণ হয় সেইরূপ। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত হয়ত শৈলজানন্দ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু শৈলজানন্দ তাঁহার পূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; জগদীশচন্দ্র এখনও যথোচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইঁহার রচনাতেও একটি অতিশয় মৌলিক কল্পনা-ভঙ্গি আছে, এবং তাহাতে ষ্টাইলের লক্ষণও আছে।

আমি তাঁহার সেই গল্পগুলির কথা বলিতেছি, যাহাতে মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্য্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জল [illegible] এক প্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্ব্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয়—যত ভয়ঙ্কর তাহার সেই অতি-প্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানবের কুসংস্কার, অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলা যায়—সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থ বুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে—শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদিগকে অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত-চৈতন্যের অগোচর; সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—এ সকল যেন তাহারই কচিৎ-দৃষ্ট মূর্ত্তি; আদিম মানুষের অপ্রবুদ্ধ চেতনায় ইহারই ছায়া পড়িত। কিন্তু এখনও সেই সকল অনুভূতি হয় তো আমাদের চেতনার নির্জ্জান-স্তরে সঞ্চিত আছে, অতি-প্রাকৃতের সেই বিরাট বেষ্টনী যে এখনও আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে—নানা ইঙ্গিতে ইসারায় আমরা সে কথা স্মরণ করিতে বাধ্য হই। জগদীশচন্দ্রের একটি গল্পে, মৃত্যুর পরেই পুনর্জ্জন্মের ঘটনা, এবং সেই সম্পর্কে একটি স্বপ্ন, এমনভাবে বিবৃত হইয়াছে যে—যাহা একটা লৌকিক কুসংস্কার মাত্র তাহাও গুরুতর রহস্যভারের মত মনের উপরে চাপিয়া বসে। এই ঘটনাটি সত্যঘটনা বলিয়াই মনে হয়, অর্থাৎ, কোন একটা অর্থে কোথাও ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু লেখকের নিজস্ব কল্পনা ও রচনা-ভঙ্গি ইহাকে এমন একটি রূপ দিয়াছে যে, তাহা অপেক্ষা bizarre বা uncanny বাংলা গল্পে আর কোথাও ফুটিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। এই দৃষ্টি ঠিক রসদৃষ্টি নয়, কারণ, ইহা normal বা সুস্থ নয়; তথাপি ইহাও আর্টের পর্য্যায়ভুক্ত; জগদীশচন্দ্র ইহাতেও যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একালেও যে ধরনের রোমান্সকে বাংলা উপন্যাসে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বাঙালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

পাঠকমাত্রের বলিলাম, তাহার অর্থ এই নয় যে, তিনি অতি সাধারণ স্তরের রসিক-সমাজকেই আনন্দ দিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার রচনা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, শরদিন্দুবাবুর রচনাগুলির মূলে একটি সুকর্ষিত ও সুমার্জ্জিত কবি-মন আছে; তাঁহার কল্পনা প্রাকৃতজনসুলভ নয়, অতি উৎকৃষ্ট রুচি ও কাব্যকলাবৈভব তাহাকে পুষ্ট করিয়াছে। আমরা এ যুগের কাব্যে যে সুরটি হারাইতে বসিয়াছি—শরদিন্দুবাবু তাহাকেই তাঁহার সহজাত কাব্যসংস্কারের বলে কতকটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। মানুষের মনে যে চিরন্তন রহস্যরসপিপাসা—দূর ও দুর্জ্ঞেয়ের প্রতি তাহার যে একটি অবশ আকর্ষণ আছে; কালের যে যাদুশক্তি প্রকৃতি ও সমাজের নিত্য-রূপটিকেও অনিত্য-মনোহর করিয়া তোলে বলিয়া, এককালের অতি-পরিচিত বাস্তবও একালের স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হয়; এবং অতীতকালের অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্য দিয়া এই জীবন ও জগৎকে অসীম রহস্যের আংশিক প্রকাশ মনে করিয়া আমরা পরমোৎকণ্ঠা অনুভব করি—সেই রসের সেই কল্পনা শরদিন্দুবাবুর রচনায় যেখানে যতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট দান।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার তিনখানি উপন্যাস বা উপন্যাস-ত্রয়ীতে ('ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা') যে সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও অনন্যসুলভ। ইহাতে যেমন একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমাজের জীবনালেখ্য অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যসহকারে অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনই, সেই সমাজের অন্তরে পূর্ণ প্রবেশ করিবার যে সহানুভব-শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহাও একটি উৎকৃষ্ট কবিশক্তি। যে ভূমি, যে প্রতিবেশ ও যে সংস্কৃতির পট-ভূমিকায় তিনি জীবনের এই এক নূতন রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে যে কত বাস্তব তাহা অনুভব করি তাঁহার স্টাইলে—ভাষার অতিশয় সংক্ষিপ্ত সরলতায়, ভাবালুতার সতর্ক সংযমে। সরোজকুমারও 'রিয়ালিস্ট'; বাস্তবের অন্তরালে যে রহস্য আপন অর্থ-গভীরতায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—কাহারও মনঃকল্পিত অর্থ যাহার নাগাল পায় না, সেই রহস্যাবরণের এক প্রান্ত তুলিয়া ধরিবার জন্যই, তিনি Real-এর পূজা করেন; তাহাকে লাঠির আঘাতে ভাঙিয়া মূর্খের মত সকল রহস্য নষ্ট করিবার প্রয়াসী তিনি নহেন। এ-জাতীয় উপন্যাস ইহাই প্রমাণ করে যে, জীবনের বহিরঙ্গশোভা যতই সাধারণ বা তুচ্ছ হউক, সত্যকার দৃষ্টি যাহার আছে,—

যে পুঁথির পরিবর্ত্তে প্রাণকে প্রাধান্য করিয়াছে, যে 'বুলির' বদলে মানুষকে চাহিয়াছে, এক কথায়, যে এই সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান—সে পথের উপরকার সর্ব্ববিধ পদচিহ্ন হইতেই অনন্তের তীর্থযাত্রার সঙ্কেত ধরিয়া দিতে পারে; তাই এই উপন্যাস-ত্রয়ীর মধ্যে যে বৈরাগীর আখড়া এবং যে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর যুগল-চিত্র লেখকের তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কাল, দেশ ও সমাজের আবরণ ভেদ করিয়া—এমন কি, প্রবৃত্তি বা দেহসংস্কারকেও অতিক্রম করিয়া—মানুষের ক্ষুধার গূঢ়তম রূপ ও তাহার পরম তৃপ্তির আশ্বাস উঁকি দিয়াছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে রসের আর এক ভিয়ান—আর এক সৌরভ আমাদিগকে সচকিত করে, যেন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দির-সংলগ্ন পাকশালায় চিরন্তন কিশোর-কিশোরীর রসনাতৃপ্তির জন্য, অতি নির্লোভ ভক্তিমান পূজারী শুচিবাসে ও শুদ্ধচিত্তে পায়স-ব্যঞ্জন পাক করিতেছেন। সে পাকের তিনটি রস প্রধান—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শিশুর রূপ ধরিয়া ঠাকুর যে রসের লীলায় আমাদের ঘর-সংসার আলো করিয়া রাখেন, সে রসের পাকও যেমন,—ঘরের বাহিরে, ব্রজ-বনে, তাঁহার দুর্ললিত বাল-চাপল্যের কৌতুক-লীলা আমাদের বয়োভার-পীড়িত মনকেও ক্ষণেকের জন্য যে রসাবেশে লঘু করিয়া দেয়, তাহার পাককর্ম্মেও বিভূতিবাবুর সমান নৈপুণ্য। তাঁহার গল্পগুলিতে এই লীলা-রস উৎকৃষ্ট 'হিউমার' হইয়া উঠিয়াছে; সে হিউমার যে সূক্ষ্ম পর্দ্দাগুলির উপরে গতায়াত করিয়া থাকে, তাহার আস্বাদনও অতি সূক্ষ্ম রসবোধসাপেক্ষ। তাঁহার রচনার সর্ব্বপ্রধান গুণ—সৌকুমার্য্য; এই সৌকুমার্য্য কেবল ভাব, বিষয় বা উপকরণগতই নয়,—সকল রচনার অন্তরালে আমরা একটি অতিশয় সংযমী, পর-সহিষ্ণু, নির্ব্বিরোধ, কোমল-হৃদয়, অথচ তীক্ষ্ণ রসদৃষ্টি-সম্পন্ন শিল্পী-চরিত্রের আভাস পাই। এই ব্যক্তিত্বই তাঁহার স্টাইল—ইহাই তাঁহার রচনার 'হিউমার'-গুণের কারণ। তাঁহার হাসিও যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, অশ্রুও তেমনই,—যেমন করুণ তেমনই মধুর। জীবনের হাসি ও অশ্রুকে পাশাপাশি গাঁথিয়া একই মণিমালায় তাহাদের অভিন্নতা সম্পাদন করার যে উৎকৃষ্ট রস-দৃষ্টি—তাহারই একটি সুকুমার ললিতভঙ্গি বিভূতিভূষণের রচনাকে লক্ষণীয় করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি 'নীলাঙ্গুরীয়' নামে যে সুবৃহৎ উপন্যাস প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার শক্তিকে আর একটু দুরূহ কর্ম্মে প্রেরিত করিয়াছেন; এবার তিনি রসের যাহা সার—সেই

উজ্জ্বলতম মধুর-রসের ভিয়ান করিয়াছেন। এ রসের পাক-নৈপুণ্যে শুধুই শিল্পী-মন নয়—জীবনের অতলকে মন্থন ও তাহার গরল হইতে অমৃত—মৃত্যুর হাত হইতেই মৃতসঞ্জীবনী—উদ্ধার করার যে কবি-শক্তি, তাহাই বিশেষ করিয়া প্রয়োজন। এই উপন্যাসে বিভূতিবাবু সে কাজ করেন নাই, তাঁহার অভিপ্রায় এত উচ্চ বা দুঃসাহসিক নয়। তথাপি, তাঁহার নিজস্ব পাক-প্রণালীতে বা নিজের ব্যক্তি-চরিত্রের সেই স্টাইলে, তিনি এই রসের যে রূপটি নিজেরই অভিজ্ঞতার পট-বস্ত্রে রঙিন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে সেই বৃন্দাবনী বাঁশির সুরেও একটু নূতন মূর্চ্ছনা যুক্ত হইয়াছে। বিভূতিবাবুকে আমি এক ধরনের বৈরাগী কবি-শিল্পী বলিয়াছি—এ উপন্যাসে তাঁহার সেই বৈরাগ্যের পূর্ব্ব-আশ্রমের ছায়া খুব গভীর হইয়া পড়িয়াছে; frustration ও tragic waste-এর মর্ম্মান্তিক নিশ্বাস—সুচিরবিরহের নৈরাশ্য ও বিধুরতা—এই প্রেমের কাহিনীতে নিশ্বসিত হইয়াছে। জীবনের মাঠে ঘাটে চারিদিকে কত সুরে কত হৃদয় সেই এক বাঁশির সুরে ব্যাকুল হইয়া উঠে; অনেক স্থলেই স্পষ্ট অভিসার-সঙ্কেতও পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছানো আর হয় না। কালিন্দীর ক্রূর-কৃষ্ণ জলধারা চিরবিচ্ছেদের অশ্রু-তরঙ্গিণীর মত প্রেমকে দুই পারে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। এই 'একা-নদী'ই 'বিশ-ক্রোশ' হইয়া উঠে, বার বার লগ্নভ্রষ্ট হয়, পারের নৌকা ছাড়িয়া দেয়—তখন খেয়াঘাটে গড়াগড়ি দিয়া জীবনের বাকি সন্ধ্যাটুকু শেষ করিতে হয়। এই উপন্যাসগত উপকরণের বেশির ভাগ—লেখকের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়, তাই ইহার প্রত্যেক চিত্রে যেমন বাস্তবনিষ্ঠা আছে, তেমনই প্রতি কথার মধ্যে ভাবানুভূতির অতি সূক্ষ্ম ও সুকুমার, অথচ দৃঢ় ও অসংশয় অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এখানেও জীবনকে দেখিবার একটি ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিভূতিবাবুও জীবনেরই রূপকার। কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি নিজের প্রাণকেই জীবন-পূজায় পুরোহিত করিয়াছেন—নিজের মনের যে গঠন, এবং ধ্যানের যে ধরন, তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই; যে বাস্তব হয়তো তাঁহারই নিজের জীবনে অচ্ছেদ্য বল্লরীর মত জড়াইয়া আছে, তাহাকে বৃহত্তর কল্পনার বলে কুসুমিত করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের স্নায়ুশিরাগ্রন্থিত সত্যকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া, যে-প্রেম জীবনের সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়াও মানুষকে আর এক মহিমালোকে বরমাল্য পরাইয়া দেয়—

tragic waste-এর মধ্যেও যে সান্ত্বনা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে নিগূঢ় উৎসমুখে উৎসারিত হয়—চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও ভাব-সম্মিলনের যে অমৃত সেই এক বাঁশির সুরেই ক্ষরিত হইতে থাকে—তাহার সন্ধান ইহাতে নাই। এমন একখানি উপন্যাসের সমালোচনা সহজ নয়; জীবনকে তিনি যেমন দেখিয়াছেন—সে দেখা যেমনই হউক, তাহাতে seriousness ও sincerity থাকিলে—এবং তাহার বাণী-রূপ সার্থক হইলেই হইল; ইহার অধিক দাবি করা অন্যায়। কিন্তু আমাদের উপন্যাসগুলিতে কেমন যেন শেষরক্ষা হয় না, জীবনের খণ্ডচিত্র-গুলি পর পর একটি সূত্রে সুন্দর গাঁথা হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সূত্রের দুই মুখ যুক্ত হইয়া একটি সুসম্পূর্ণ সুমণ্ডলায়িত কাহিনী হইয়া উঠে না। তাহার কারণ—'রিয়্যালিজ্‌ম' নয়; আমি কাব্যে সেইরূপ রিয়্যালিজ্‌ম মানি না; একমাত্র কারণ, আত্ম-নিরপেক্ষভাবে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টি, তাহা আমাদের লেখকগণের নাই; আমাদের সকল কাব্যই lyrical—আত্মকেন্দ্রিক। আরও কারণ এই যে, আমরা ভাব-রসিক, জীবনের রণস্থল হইতে আমরা সরিয়া যাই; তাই প্রেম আমাদের কর্ম্মশক্তির প্রেরণা নয়—ধ্যান-কল্পনার বস্তু। লেখক এই উপন্যাসেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন; এ উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রে কর্ত্তব্যের নির্ম্মমতা বা প্রেমের আত্মবিস্মৃতি—কোনটাই নাই, তাই যে ট্র্যাজেডির পূর্ণতর বিকাশ ইহাতে সম্ভব ছিল, পুরুষের শক্তিহীনতার জন্য তাহা ঘটিতে পারে নাই, উপন্যাসটিও কাহিনী-হিসাবে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে নাই।

তথাপি বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের যে পরিচয় দিলাম, আশা করি, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না যে, বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাসে আমরা একজন শক্তিশালী লেখকের অভ্যুদয় দেখিতেছি—শক্তি বলিতে যাহা বুঝায়, সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা স্টাইল তাঁহার রচনায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমি তিন জন অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পীর পরিচয় স্থগিত রাখিয়াছি, তাহার কারণ, তাঁহাদের সম্বন্ধে একটু পৃথক আলোচনার প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন বা ইতিমধ্যেই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এমন আরও কয়েকজনের কথা এইখানেই বলিব। ইহাদের মধ্যে মনোজ বসু,

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, 'সম্বুদ্ধ', অমলা দেবী ও প্রমথনাথ বিশীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু বয়সে ইঁহাদের অনেকেরই অগ্রজ, এবং গল্প-লেখক হিসাবেও যথাসময়েই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা খাঁটি সাহিত্যিক-গুণযুক্ত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সৃষ্টির প্রাচুর্য্য বা দৃষ্টির মৌলিকতা রক্ষা করিতে পারে নাই; রবীন্দ্র-শিষ্য কবিগণের মতই, তাঁহার মধ্যেও যেটুকু শক্তির লক্ষণ আছে, তাহা রবীন্দ্রপ্রভাবের ফল—সেই সাহিত্যেরই একটা জের বলা যাইতে পারে। তিনি সেই সাহিত্যেরই প্রান্তটিতে প্রায় একই প্যাটার্নের কিছু কারুকর্ম্ম করিয়াছেন—নূতন কিছু যোগ করিতে পারেন নাই।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়—বিশেষত প্রথম উপন্যাসখানিতে—এই তরুণ লেখকের যে প্রতিভার লক্ষণ আমাকে আশান্বিত করিয়াছিল, দুঃখের বিষয়, পরে তাঁহার লেখাগুলিতে রচনার যে ভঙ্গি ও কল্পনার যে দৈন্য উত্তরোত্তর প্রকট হইতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার সেই শক্তির অপচয় লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম দিকের গল্পগুলিতে কাব্য-কল্পনা ও মনস্তত্ত্বের যে সমন্বয়, এবং নারীচরিত্র-বিশ্লেষণে যে অপূর্ব্ব ভঙ্গির পরিচয় পাইয়াছিলাম, লেখকের বয়সের তুলনায় তাহা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু পরে, সৃষ্টিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বিদায় দিয়া তিনি সেই দৃষ্টি হারাইয়াছেন—চিন্ময়-বাস্তবের পরিবর্ত্তে জড়-বাস্তবের উপাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে; তাঁহার রচিত কাহিনীগুলিতে সে রস আর কোথাও নাই। অতিশয় কুশ্রী কুরূপ ও অকিঞ্চিৎকর যাহা তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং ভাষারও অনুরূপ অপরিচ্ছন্নতার ফলে, তিনি শেষে রূপকার কবির আসন হইতে রূপ-বিদ্রোহী কর্ম্মকারের পদবীতে নামিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মা-নদীর মাঝি' বিষয়বস্তু ও নামের জোরেই পদ্মাপারের পাঠকগণের বড় প্রিয় হইয়াছে; এই পুস্তকে তাঁহার শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু সে শক্তি রসসৃষ্টির শক্তি নয়।

শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়ের ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম—সেই সমাজ ও তাহার বিগতশ্রীর চিত্ররচনায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন—তাহার প্রতি যে কবিত্বময় মমতা তাঁহার কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বর্ত্তমান গল্পলেখকগণের মধ্যে একটি আসন পাইবার অধিকারী। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত

মনোজ বসু প্রায় এই ধরনের গল্প লিখিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গল্পগুলিতে কল্পনার কবিত্ব আরও অধিক।

'সম্বুদ্ধ' (শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দাসগুপ্ত) কয়েকটি হাস্যরসাত্মক গল্প লিখিয়া আমাদিগকে চমকিত করিয়াছেন; আমরা পূর্ব্বে ইহার কোন নোটিস পাই নাই, অথচ গল্পগুলির লিপিকৌশল পাকা ওস্তাদের মত। নিছক কৌতুক বা Fun, এবং কোথাও বা তাহার সহিত অতিশয় সূক্ষ্ম Satire এই লেখকের হাতে এমন একটি নূতন ভঙ্গি লাভ করিয়াছে যে, তাঁহার সেই দুষ্ট-সরস্বতী বাণীমূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। 'সম্বুদ্ধ' গম্ভীর ভাবের গল্পও লিখিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্লেষণ-শক্তির চমৎকার নিদর্শন হইলেও—দুই-চারিটি অপর গল্পে লেখকের মর্ম্মবিদারী দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি 'সম্বুদ্ধ'কে বাংলা সাহিত্যের খাল-বিলে শৌখিন মৎস্যশিকারী বলিয়াই মনে হয়—শক্তিমান হইলেও তিনি 'অ্যামেচার'; তাঁহার সাহিত্য-সেবায় নিষ্ঠার অভাব আছে। তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলেও স্থির নয়; এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাতে একটি খেয়ালী মনোভাবের পরিচয় পাই—ইহা আশঙ্কাজনক বটে।

অমলা দেবী তাঁহার 'মনোরমা' নামক প্রথম গল্পের বইখানিতে যে ধরনের আধুনিক সমাজ-চিত্র, যে দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি তখন হইতেই আমাদের পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কাব্যকল্পনা প্রায় নাই বলিলেই হয়; তিনি অতিশয় নির্ভুল ও গভীর রেখায় এমন কতকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন, যাহার জন্য, যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রয়োজন, তেমনই ঠিকমত বর্ণ-সন্নিবেশের ও রেখাবিন্যাসের কৌশল পাকা শিল্পীর মত আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। এই রচনাশক্তির মূলে আছে সুগভীর সহানুভূতি বা বেদনাবোধ, তাহাই তাঁহার দৃষ্টিকে এমন অন্তর্ভেদী করিয়াছে—সমাজের বহিরাবরণ জীর্ণ-কন্থার দীর্ঘ সেলাইগুলি খুলিয়া দিয়া তিনি নির্ম্মমভাবে তাহাকে বে-আব্রু করিয়া দিয়াছেন। এ ধরনের সাহিত্য বড় সাহিত্য নয়; ন্যায়, সত্য ও নীতিজ্ঞানই ইহার প্রধান প্রেরণা—জীবনের রহস্য-রূপের সন্ধান ইহার মুখ্য অভিপ্রায় নয়; তথাপি অমলা দেবীর স্টাইল খাঁটি সাহিত্যিক বটে, সেই গুণেই রচনা উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীও কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন—পণ্ডিত-ভাবুক,

সমালোচক ও কবি বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি আছে, সেই খ্যাতির বিস্তার কামনা করিয়া তিনি নাটক ও উপন্যাস-রচনাতেও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নাই বলিয়া আমি এই 'জি-বি-এস'-শিষ্য আধুনিক একলব্যের শরসন্ধানচাতুরীর কথা কিছুই বলিতে পারিব না, তবে আধুনিক সাহিত্যের একমাত্র রস—Satire, এবং Satire-সৃষ্টিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্ম—ইহাই যাঁহার সাহিত্যিক ধর্ম্মমত, তাঁহার উপন্যাসগুলি যদি তাহারই আনুষ্ঠানিক নিদর্শন হয়, তবে বলিতে বাধ্য হইব যে, তিনি তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই; কারণ সেগুলির মধ্যে প্লটের যে নিরঙ্কুশ গতি আছে, এবং চরিত্রগুলিতে যে স্বপ্নসুলভ কাল্পনিকতা আছে—তাহার কোনটাতেই Satire-এর প্রেরণা নাই—কল্পধেনুর দুগ্ধদোহন-প্রবৃত্তিই আছে। এই রচনাগুলি গল্প হয় নাই—এ গুলিতে সেন্টিমেণ্টযুক্ত ভাবুকতা, সূক্ষ্ম-চিন্তা, ও বাহিরের উপরে মনের রং ফলাইয়া সার্থক ডায়েরি-রচনার কৃতিত্ব আছে। তথাপি আমি তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে, বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যের তিনি একজন শক্তিমান লেখক।

অতঃপর আমি এই কালের তিনজন প্রধান লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

৫

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার প্রতি আমিই সর্ব্বপ্রথম 'শনিবারের চিঠি'তে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম—তখন তাঁহার 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছিল। এই প্রথম উপন্যাসখানির দ্বারাই তিনি যেন—leapt into fame—এক লম্ফে যশের শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন; আজও তাঁহার সেই যশ অক্ষুণ্ণ আছে। তাহার কারণ, তাঁহার দৃষ্টি যেমন, তাঁহার স্টাইলও তেমনই মৌলিক। এই মৌলিকতার কারণ দুইটি; প্রথমত, আমাদের রসপিপাসাকে তিনি একটা ভিন্নমুখে ফিরাইয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তীগণের (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) মত জীবনের অন্তঃস্রোত বা বহিঃস্রোতে অবগাহন করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিতে চাহেন নাই; তিনি তীরে বসিয়া তটশোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, জীবনের দুর্গম গহনে প্রবেশ না করিয়া, আপনার মানস-যন্ত্রে, তাহার প্রসারিত পট-দৃশ্যের ছবি তুলিয়াছেন। জীবন তাঁহার

নিকটে একটা স্থির শান্ত গতিহীন ও প্রায় সুসজ্জিত মনোহর চিত্রশালা। তাঁহার চোখদুইটির পিছনে একটি যে ভাবরসগ্রাহী মন আছে, তাহার রসায়নাগারে বাহিরের যত কিছু—মানুষ, পশু, পক্ষী, মাঠ, বন, নদী ও আকাশ—কেবল একটি রসরূপে পরিণত হয়; প্রাণ যেন বলে,—এই তো! ইহার অধিক কি চাই? তুচ্ছতম বনলতায় ও তৃণ-পুষ্পে, কুটীরবাসী মানুষের অতি-ক্ষুদ্র জঠরের, ক্ষুদ্র ক্ষুধার খুদ-কুঁড়াতেও কি অমৃত রহিয়াছে! চাই কেবল সেই স্বল্পে-তুষ্ট তুচ্ছ-লুব্ধ, যাহা-পাই-তাহাতেই ধন্য রসভিখারী মন, তাহা হইলেই জীবনের ধূলা-মাটিও পরম পদার্থ হইয়া উঠিবে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তি-মনোভাব এমনই বটে, কিন্তু কবিশিল্পীহিসাবে তাঁহার মৌলিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ—তিনি এই কাঙাল-সুলভ পিপাসাকে সাহিত্যে একটি অভিনব স্টাইলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। এই স্টাইল জীবনের দ্বন্দ্ব-গভীর, রহস্য-ঘোর, বিরাট-বিপুল অথবা সূক্ষ্ম-জটিল শক্তি-মহিমার স্টাইল নয়, তথাপি তাহা good art বা নিছক রসসৃষ্টির স্টাইল বটে। এই রসেরই সিদ্ধ সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁহারও কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র ছিল—সহজ ও সর্ব্বব্যাপ্ত যাহা ('joy in widest commonalty spread') তাহারই রসরূপ সৃষ্টি করা; এই রস-সম্ভোগের কথাই তিনি তাঁহার 'চিত্রা' কাব্যের "সুখ" নামক কবিতাটিতে বড় চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

মনে হইতেছে,

সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।

* * *

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে যাহাকে অতিশয় সরল ও সহজরূপে উপভোগ করিয়াছেন—জীবনের আলেখ্যরচনায়—গল্পে উপন্যাসে—তাহাকে এমন বাউল শিশুর বেশ ধারণ করান নাই। বিভূতিভূষণ কিন্তু সেই বাউলের একতারাটি মাত্র সম্বল করিয়া উপন্যাসেও সেই সুর বাজাইয়াছেন। তাঁহার কল্পনা লিরিক-কবির মতই আত্মকেন্দ্রিক; তাই তাহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ—তিনি কেবল তাঁহার নিজেরই

ভাবানুভূতির লিপিকার। ঔপন্যাসিককে জীবনের রূপকার হইতে হইবে, এরূপ একান্ত লিরিক-কল্পনা উপন্যাসের উপযোগী নয়। তিনি জীবনের আর্টিস্ট মাত্র—জীবনের কবি নহেন। তাঁহার যাহা কিছু সৃষ্টিনৈপুণ্য তাহা ওই স্টাইলেই সীমাবদ্ধ; ওই স্টাইলের বলে তিনি তাঁহার সেই প্রথম উপন্যাসের পরে বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জীবনের রহস্যপুরীর কোন নূতন দ্বার-উন্মোচন নাই; সেই একই সুরের আলাপ আছে। এইরূপ রচনা বিভূতিবাবুর পক্ষে এতই সহজ, এবং তাঁহার ওই স্টাইল এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, তিনি অনায়াসে সাহিত্য-বিপণির পণ্যভার বৃদ্ধি করিতেছেন, সামান্য ডায়েরী-জাতীয় রচনাও উপন্যাসরূপে বাঙালী পাঠকের উপাদেয় হইয়া উঠে।

তথাপি, বিভূতিভূষণ একজন বিশিষ্ট সাহিত্যশিল্পী, তাঁহার মৌলিকতার দাবিও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তিনি জীবন-কাব্যের কবি নহেন, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস মানুষের যে কাহিনী গাহিয়াছে, তাহাতে লিরিক-সুরের অবকাশ যথেষ্ট থাকিলেও, তাহার রস—মানুষের জীবনাবেগের প্রাবল্য, তাহার সুখ-দুঃখের গভীরতম অনুভূতি, এবং দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবর্ত্তফেনিল তরঙ্গকে—এক কথায় জীবনের সমগ্র রূপকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যে জীবনের যুগোচিত অনুভূতি ও তজ্জনিত ধ্যান-ধারণা যেমনই হউক, যাহা কেবলই আর্ট নয়—কাব্যও বটে, অর্থাৎ, যাহা মানুষেরই গভীরতম পরিচয়-কাহিনী, তাহাতে আমরা কেবল সুর পাই না, কথাও পাই; সে কেবল সুন্দরের কথাই নয়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্বঘটিত এক অপূর্ব্ব রহস্য-রসের কথা। অতএব বিভূতিভূষণের রচনাগুলি আকারে ভঙ্গিতে উপন্যাস হইলেও, আমি—মাত্রাভেদসত্ত্বেও যাহাকে খাঁটি সৃষ্টিশক্তি বা কবিশক্তি বলিয়াছি—তাহার দিক দিয়া, তিনি বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্যশিল্পী মাত্র। একরূপ মনোবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সহিত রসপিপাসা যুক্ত হইলে, মানুষকে ও প্রকৃতিকে একটি স্থির-চিত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া যে ধরণের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সম্ভব, তিনি সাহিত্যে সেই সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা। এই হিসাবে তাঁহার মৌলিকতাও যেমন সত্য, তেমনই তাঁহার প্রতিভা যে রবীন্দ্র-যুগের রস-সাধনারই একটি স্বাভাবিক পরিণাম—তাহাও সত্য।

কিন্তু শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বা 'বনফুলে'র প্রতিভা খাঁটি ঔপন্যাসিকের প্রতিভা—

আমি উপন্যাস বলিতে 'ছোট' কিংবা 'বড় গল্প'ও বুঝিতেছি। এই দুই লেখকের রচনাই বর্ত্তমানে বাংলা উপন্যাসের ধারাকে বেগবান করিয়াছে। দুইজনেই জীবনের রূপকার, দুইজনেই জীবনের কলশব্দমুখর তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল স্রোতকে কলাবিদ্, কবিশিল্পীর মত কাহিনীর আকারে ধরিবার নিরন্তর সাধনায় আপন আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি বা রসপ্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেই হয়—উভয়ের কবি-প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা বৈষম্য আছে যে, আমার সন্দেহ হয়, একজন আর একজনের রচনা বোধ হয় পূর্ণ উপভোগ করিতেও অক্ষম। একই কালে এই দুই বিরুদ্ধধর্ম্মী লেখকের অভ্যুদয়ে সাহিত্যের রসপ্রমাতার বড় সুবিধা হইয়াছে। 'বনফুল' জীবনের যে-রূপটি তাঁহার অজস্র রচনার অজস্র রূপ-ভঙ্গিমায় ধরিয়া দিতে পারিয়া উত্তরোত্তর নিজের দৃষ্টি সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দেহ হইতেছেন, সে রূপ এক হিসাবে আদিম ও অবিকৃত—চির-পুরাতন ও নিত্য-নূতন; তথাপি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সুস্পষ্ট প্রেরণা আছে; তাঁহার সেই paganism নিছক সৌন্দর্য্য-লালসার অতিশয় সুস্থ দেহ-প্রবৃত্তিই নয়, তাহাতে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট মনোভাব যুক্ত হইয়াছে। এই কারণে এক অর্থে তাঁহাকেই আমাদের সাহিত্যের একজন খাঁটি আধুনিক শিল্পী বলা যাইতে পারে। 'বনফুলে'র মনে কোন সংশয় বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মোহ নাই—তিনি অতিশয় সাহসী ও সংস্কারমুক্ত, জীবন-পান্থশালায় যথাপ্রাপ্ত রসের সমজদার অতিথি। পান্থশালার অধিকারীকে তিনি কোন বহুমূল্য বাদশাহী পানীয়ের ফরমায়েস যেমন করেন না, তেমনই অতিশয় অল্পমূল্যের ধূম্রজাত নেশাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন না; যাহা স্বাস্থ্যকর ও জীবনীয় তাহাই তাঁহার পুরামাত্রায় চাই—এতটুকু ভেজাল থাকিলে তিনি একটি পয়সাও দিবেন না। এই মনোভাব তাঁহার রসকল্পনার মূলে বিদ্যমান, তিনি মানুষকে তাহার সুস্থ প্রাণশক্তির লীলায় সহজেই চিনিয়া লইতে পারেন, এবং সে বিষয়ে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্য মান্য করিয়া থাকেন। মানুষ পশুও নয়, দেবতাও নয়, এমন কি মাঝামাঝি কিছুও নয়; সে কেবলমাত্র মানুষ; তাহাতে গৌরব বা অগৌরবের কথা নাই, আছে শক্তি ও স্বাস্থ্য-অনুভূতির আনন্দ মাত্র। সকল সাহিত্যিক প্রতিভাই সহজাত,—অনুকূল বা প্রতিকূল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সেই প্রতিভার বিকাশ হয়। 'বনফুলে'র শিক্ষা ও কর্ম্মজীবন

তাঁহার সেই সহজাত শিল্পী-মনোভাবকে বিশেষরূপে পুষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি যে-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহার এই মনোবৃত্তিকে পুষ্ট করিবার পক্ষে তেমন আর কিছুই নাই। তিনি জীবনের বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্বকে—বায়োলজি ও ফিজিওলজিকে—তাঁহার সাহিত্যিক জীবনবাদের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারিয়াছেন; যাহা সর্ব্ব-সেন্টিমেণ্ট-বর্জ্জিত তাহাই তাঁহার রসপিপাসু মনকে একটি বিশিষ্ট ভাবমার্গে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'বনফুলে'র রসসন্ধানী মনের সঙ্গে দুইটি সর্ব্বদর্শী চক্ষু এবং একখানি ক্ষুরধার ল্যান্সেট সর্ব্বদা কাজ করিতেছে। অন্ধকার তো নহেই—মন্দান্ধকারেও তিনি কাহারও পরিচয় করিবেন না,সেখানেও অতি তীব্র বর্ত্তিকালোক তাঁহার প্রয়োজন। মানুষের জীবন তাঁহার নিকটে অতিশয় সুস্পষ্ট ও সুগোচর বস্তু,—সে যে কত সুগোচর, অসংখ্য জীবন্ত চিত্রে তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সে সকল চিত্রে তিনি মানুষের প্রত্যক্ষ দেহমনের যে পরিচয়—ভাষা ও ভঙ্গির আশ্চর্য্য অবলীলা এবং চকিত-প্রখর আলোকপাতসহকারে—উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে যেমন বিস্মিত হইতে হয়, তেমনই মানুষের সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা নূতন সংস্কার জাগে, বিশ্বাস হয় যে, মানুষের চরিত্র দোষ-গুণে যেমনই হোক—মনুষ্য-জীবন মোটের উপরে, হেয় বা লজ্জা পাইবার মত কিছু নয়। যদি কোন কারণে ইহার স্বাস্থ্যহানি না হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির রাজ্যে সুমহৎ শক্তিকেন্দ্ররূপে সে জীবনের একটি বিশেষ মর্য্যাদা আছে। সেই শক্তি ও স্বাস্থ্যই ইহার সব-কিছু সৌন্দর্য্য।

'বনফুল' এই আশ্বাস ও বিশ্বাসের কবি, তিনিও এক ধরণের প্রকৃতিবাদী—Naturalist। তাঁহার আর্ট মানুষেরই স্নায়ু-শিরা-শোণিত-বিজ্ঞানের আর্ট। তিনি কেবল রূপের পূজারী নহেন, সেই রূপের চিরচঞ্চল প্রবাহে তিনি প্রাণশক্তির লীলা দেখিয়াছেন। এই শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি, তাহার মূলে কোন আধ্যাত্মিকতা নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'বনফুলে'র কাব্য-প্রকৃতিতে একপ্রকার paganism আছে, সে এই শক্তিপূজারই paganism; শক্তির যে সৌন্দর্য্য, তিনি সেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। প্রকৃতির এই মূর্ত্তি তিনি একবার পূর্ণরূপে অপরোক্ষ করিয়াছেন তাঁহার 'রাত্রি'-নামক উপন্যাস-কাব্যে—আমাদের দেশের শক্তিসাধকদিগের সেই উপাস্য দেবতাই যেন সেখানে শোণিত-মাংসে শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছে।

লেখক তাহার যে রূপ-কল্পনা করিয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির পরিচায়ক ; সে রূপ রাত্রির মত, তথাপি তাহা কালিদাসের 'স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী' নয়। রাত্রি হইলেও তাহার রূপ মধ্যাহ্নদিবার মত ভাস্বর, কালো মখমলের খাপের মধ্য হইতে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ছুরিকার মত তাহা ঝলসিয়া উঠে। এই মৃত্যুরূপিণী নারী মহাশক্তি-রূপিণীও বটে ; 'অপবিত্র পবিত্রো বা'—কোন সংস্কার তাহার নাই ; প্রেম, ধর্ম্ম বা নীতির কোন বন্ধন তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া কলুষিত করিতে পারে না। তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা ঘুরিতেছে, তাহারাই মোহগ্রস্ত, তাহারাই কৃপার পাত্র। 'বনফুল' এই একখানি উপন্যাসে তাঁহার অন্তর-গহনের কাব্য-প্রেরণাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন।

জীবনের রূপ-কল্পনার এই এক দিক—আর এক দিক আছে ; কোন্ দিক বড় তাহা আমি বলিব না, আর্ট-হিসাবে উভয়েই উভয়ের দিক দিয়া উপাদেয়। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের সেই আর এক রূপের রূপকার। 'বনফুলে'র জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ-বাস্তবের জগৎ, তারাশঙ্করেরও তাহাই ; তথাপি 'বনফুলে'র জগৎ দিবালোকের জগৎ, কিন্তু তারাশঙ্করের জগতে আলোকের পশ্চাতে নিশীথের রহস্যান্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'বনফুল' জীবনের যেটুকু সুস্পষ্ট প্রকাশ তাহার অধিক দেখিতে রাজি নহেন ; তারাশঙ্কর সেই প্রকাশের মধ্যেই যে অপ্রকাশের ইঙ্গিত আছে, তাহারই ধ্যানে জীবনকে আর এক মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। 'বনফুল' দ্বিধাসংশয়হীন দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ; তারাশঙ্কর অজ্ঞেয়-রসিক, মিষ্টিক, তান্ত্রিক। 'বনফুল' অন্ধকারকে আলোর দ্বারা অপসারিত করিবার—মৃত্যুকে জীবনের হস্তে নির্জ্জিত দেখিবার পক্ষপাতী ; তারাশঙ্কর জীবনকে আর এক রূপে উপভোগ করেন—তিনি,

> "Night, the shadow of light,
> And life the shadow of death."

—এই দুইয়ের রহস্য মিলাইয়া দেখিতে চান ; তাই তাঁহার কল্পনায় প্রকৃতির নিয়মই মানুষের নিয়তি নয়। সেই নিয়তিই প্রকৃতির নিয়ম-শাসনকে অসীম অর্থ-গৌরব ও পরম রমণীয়তা দান করিয়াছে। তাই প্রকৃতির তাড়নায় মানুষের জীবনে যত বহ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হয়, তাহার সেই বহুবর্ণের আতস-

শোভা তিনি যেমন অপলক নেত্রে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তেমনই, তাহার পশ্চাতে যে অন্ধকারের পটভূমি রহিয়াছে, তাহাকে সেই শোভার একটা বড় কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন; সেই অন্ধকারে জীবনের যে অংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাকেই তিনি বৃহত্তর বলিয়া জানেন এবং তাহারই সঙ্কেতে তিনি যে রূপ-সৃষ্টি করেন, তাহাতে সকল জ্ঞান-বিচার স্তম্ভিত হইয়া যায় বলিয়াই একটি মধুর উৎকণ্ঠায় আমাদের রসচেতনা অনুরণিত হইতে থাকে। তথাপি ইহা নিছক কাব্যরস নয়, আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকের সেই 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' ইহা নয়। ইহাও জীবনের বাস্তবরূপোদ্ভূত রস, এ রসের উপভোগকালে জীবন-চেতনা লুপ্ত হয় না, বরং জীবনেরই একটা বিশিষ্ট রূপের বিশিষ্ট ভঙ্গি সর্ব্বক্ষণ সেই রস-চেতনায় বিদ্যমান থাকে—তাহার সেই রূপই অপরূপ হইয়া উঠে। তারাশঙ্কর বাংলাসাহিত্যে জীবনের এই যে রস-রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন, বাস্তব জীবনেরই সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্য ও বিরূপতা—সর্ব্বস্তরের জীবন, এমন কি, মনুষ্য প্রকৃতির কুৎসিত ও বীভৎস প্রকাশকেও তিনি যে রসরূপে পরিণত করেন, তাহার মূলে আছে সেই রসচেতনা। জীবনের এই যে রূপস্রোত ইহাও একটা মহারূপকের নাট্যাভিনয়। রঙ্গভূমিতে মানুষের চরিত্র ও নিয়তির এই রহস্যরসবোধ যাঁহার কল্পনার উদ্দীপন-কারণ—তিনি বিশ্লেষণ করেন না, আবিষ্কার করেন; ব্যাখ্যা করেন না, সৃষ্টি করেন; প্রমাণ করেন না, প্রদর্শন করেন। তারাশঙ্করের সকল উৎকৃষ্ট রচনায় এই ইঙ্গিতমূলক প্রদর্শন আছে, রূপের সেই রূপক-রস-সঙ্কেত আছে; কোন যুক্তিতন্ত্র, কোন থিয়রি বা মতবাদ—কোন কিছুর ঘোষণা তাহাতে নাই। কল্পনার এই objectivity—বিশেষ করিয়া তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে জীবনের যে রূপ-চিত্রাবলী উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, তাহার বৈচিত্র্য সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মত। তাঁহার দৃষ্টি সেই এক রসকেই বহুর মধ্যে বিচিত্ররূপে আবিষ্কার করিয়া, কুৎসিত-সুন্দর, ভীষণ-মধুর, নিষ্ঠুর-কোমল প্রভৃতি সকল বস্তুকেই সমান উপভোগ করে; প্রত্যেককে তাহারই ভাবে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া সেই অপক্ষপাত রস-সম্ভোগ তাঁহার গল্পগুলিতে সম্ভব হইয়াছে। আমি তাঁহার আর্টের যে objectivity-র কথা বলিয়াছি, তাহার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহার গল্পের প্রতিবেশ ও ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে চরিত্রগুলি এমন অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে, সবগুলি একত্রে একমুখে গল্পটিকে রসের পরিণাম-মুহূর্ত্তে পৌঁছাইয়া দেয়; ইহার

আর একটা লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাঁহার রস-সৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ-ভঙ্গি নাই; গল্পের সকল উপাদানই নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মত কাজ করে; চরিত্রগুলিও কোথাও আপনাদিগের অন্তরদ্বার আপনারাই এতটুকু উন্মোচন করে না—সে বিষয়ে তাহাদের যেন কোন সজ্ঞানতাই নাই; তাহারা খাঁটি জীবনধর্ম্মী মানুষের মত ব্যবহার করে—কথায় ও কাজে তাহাদের গূঢ়তম প্রবৃত্তির ইঙ্গিতমাত্র প্রকাশ পায়; অর্থাৎ, লেখক নিজকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়াছেন—তাই ঘটনা বা চরিত্রের কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নাই। জীবন বলিতে যে একটি পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারকে আমরা কেবল ধ্যানেই উপলব্ধি করি, তাহাই এ সকলের মধ্যে যেন চকিতে চমকিয়া উঠে—বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুদর্শন হয়, ক্ষুদ্র নখের দর্পণে দেশ-কালের বিস্তৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাকেই আমি রূপের রূপক-মহিমা বলিয়াছি—অতি ক্ষুদ্র মানব-মানবীর ক্ষুদ্র কাহিনীতে সর্ব্বমানবের নিয়তি প্রতিবিম্বিত হয়; অতি ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ প্রেম-সঙ্কটে বিরাট ট্র্যাজেডির ছায়া পড়ে; যেন জীবনের সম্মুখভাগে, তাহাকে আড়াল করিয়া যে বিশাল যবনিকা দুলিতেছে—যাহাকে আমরা পরিদৃশ্যমান বাস্তব-দৃশ্যপট বলি—তাহার যে-কোন স্থানের ক্ষুদ্রতম ছিদ্রপথেও চক্ষু সংলগ্ন করিলে, সেই এক অসীম রহস্য-সাগরকেই উদ্বেলিত হইতে দেখিব। তারাশঙ্করের যে কোন উৎকৃষ্ট গল্প ইহার নিদর্শন—এখানে বিশেষ করিয়া তাঁহার 'ঘাসের ফুল' নামক গল্পটি আমার মনে পড়িতেছে।

তারাশঙ্করের কবিশক্তির পরিচয়-প্রসঙ্গে আমি জীবন-রস-রসিকতার যে আর এক ভঙ্গি, ও তাহার আর্ট সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি—তাঁহার রচনাগুলির অনেকাংশে তাহা প্রযোজ্য হইলেও, আমি এমন কথা বলি না যে, তাঁহার ছোট গল্পগুলিতেই সেই আর্টের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। এই দৃষ্টি তাঁহার আছে—তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে তাহা প্রায়ই সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে তিনি যে রসদৃষ্টিসুলভ অসাধারণ ভাব-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাসেও সাধারণত সেই শক্তির নিদর্শন থাকিলেও সমগ্রভাবে সেই সংযম এখনও তাহাতে দেখা দেয় নাই। তাহার কারণ, উপন্যাস রচনাকালে তিনি জীবনের যে সুপ্রশস্ত পটভূমিকার শরণাপন্ন হন, তাহাতে তাঁহার কল্পনা ভিন্নমুখী হইয়া পড়ে—বন্যার জলবিস্তারে নদীর তটরেখা স্থানে স্থানে লুপ্ত

হইয়া যায়; তিনি চিরন্তনকে গৌণ করিয়া যুগ-মহিমাকেই মুখ্য করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। যুগ-সমস্যা বা যুগ-প্রবৃত্তি জীবনের নিত্য-রূপের —অর্থাৎ রস-রূপের—অন্তরায় নয়; বরং তাহারই নিরন্তর তট-বন্ধনে যাহা কালাতীত, তাহাই নব নব রসরূপ পরিগ্রহ করে। কবিশিল্পীর পক্ষে, বিশেষত জীবনের দক্ষতম রূপকার—ঔপন্যাসিকের পক্ষে, সেই উপাদানগুলির প্রয়োজন অল্প নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার রসদৃষ্টি আরও মুক্ত ও স্বচ্ছ থাকা আবশ্যক—বন্যার ভাব-প্লাবনে শিল্পীও যেন স্বস্থানচ্যুত না হন, তাঁহার নির্লিপ্ত রসচেতনায় আত্ম-ভাবের (personal sentiment) ছায়ামাত্র না পড়ে। উপন্যাসের সুবৃহৎ আকারে জীবনের জটিল ও বহুবিচিত্র রূপকে সেই এক রূপক-রসে অভিষিক্ত করার যে আর্ট, তাহাই কবিশক্তির পরাকাষ্ঠা—তারাশঙ্কর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * *

এই আলোচনায় আমি কোন্ শ্রেণীর লেখককে কি কারণে বাদ দিয়াছি, প্রবন্ধের আরম্ভেই তাহা বলিয়াছি। দুই-একজন লেখককে অন্য কারণেও বাদ দিয়াছি—কেহ হয়তো এ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী; কেহ বা এখনও অতিশয় নবীন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু আমি জ্ঞাতসারে এমন একজন লেখককে বাদ দিয়াছি, যাঁহার সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্যে বামপন্থী হইলেও, একমাত্র তিনিই সে পন্থায় মৌলিকতার দাবি করিতে পারেন। তাঁহার সাধন-পন্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, আমি তাঁহার সাহিত্যিক বিবেক ও রচনা-শক্তিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, আমি তাঁহার গল্প-উপন্যাস খুব অল্পই পড়িয়াছি—এবং যাহাও পড়িয়াছি, তাহা এতকাল পূর্ব্বে যে, তাহার সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট ধারণা মনে নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি তাঁহার সঠিক পরিচয় দিতে পারি। অতএব এ ত্রুটি আমারই, ইহার জন্য তিনি দায়ী নহেন।

বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা উপস্থিত একরূপ শেষ হইল। এ প্রসঙ্গে আমি যাঁহাদের পরিচয় দিয়াছি তাঁহাদের তুলনায় আরও দুই চারিজন উল্লেখযোগ্যতা দাবি করিতে পারেন; এ বিষয়ে আমার

বক্তব্য এই যে, আমি কেবল সেই সকল লেখকের উল্লেখ করিয়াছি যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত—যে কারণে হোক, যাঁহারা ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; আমি ইহার অধিক দায়িত্ব লই নাই। দুই এক জন লেখকের প্রতি আমি হয় ত' সুবিচার করিতে পারি নাই,—তার কারণ, তাঁহাদের রচনার বৈচিত্র্য অতি অল্পদিন মাত্র দেখা দিয়াছে, এজন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা এখনও সুনিশ্চিত হইতে পারে নাই। আমি যাঁহাদিগকে একটু বিশেষ শক্তিমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি—শিল্পীহিসাবে তাঁহাদের সমকক্ষ আরও দুই একজন হয় ত' আছেন; কিন্তু যাঁহারা আমার এই আলোচনা ভাল করিয়া পড়িবেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—আমি শুধুই গল্পের আর্ট বা রসসৃষ্টির নৈপুণ্যকেই এ বিচারে মুখ্য করি নাই, দৃষ্টিভঙ্গি বা স্টাইলের মৌলিকতাকেই সকলের উপরে স্থান দিয়াছি। ঔপন্যাসিককে আমি জীবনের রূপকার বলিয়াছি, তাহার অর্থ তাঁহাকে কেবল রূপবিশেষের রেখাশিল্পী হইলেই চলিবে না—সেরূপ শিল্পকর্ম্মে অনেকেই দক্ষতা দেখাইয়াছেন—জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার দৃষ্টিও তাঁহাদের রচনায় বিদ্যমান থাকা চাই। এই দৃষ্টি সকলেরই সমান ব্যাপক বা গভীর না হইতে পারে; তথাপি, তেমন লেখকের রচনায় জীবনের সব-কিছুই একই অর্থে অর্থবান হইয়া উঠে; সে অর্থ একটা রসবোধমূলক অর্থ—কেবল একটা significanceএর অনুভূতি মাত্র। এই মাপকাঠিতে বিচার করিলেই সকল যুগের সকল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণকে—শক্তির মাত্রাভেদ সত্ত্বেও—এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। যাঁহাদের রচনায় আমি এই শক্তির নিদর্শন পাইয়াছি তাঁহাদিগকেই—শুধু কথাশিল্পী নয়,—জীবনের রূপকার হিসাবে—একটু পৃথক আসন দিয়াছি।

নির্দেশিকা

এই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন ঃ—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	শুদ্ধ
৯	২৩	জীবন জীবনের রূপ	জীবন ও জীবনের রূপ
১৬	৪	এই রূপ-পিপাসা	এই রূপ-পিপাসার
২২	২৩	রচনভঙ্গিমা	বচনভঙ্গিমা
২৭	১৬	সৃষ্টি যে	সৃষ্টি যে হয় (পংক্তির শেষে)
৪৯	৫	নিজ স্বরূপ	নিজস্ব রূপ
৫৯	১৩	আরও সাক্ষ্য	আরও একটি সাক্ষ্য
৬১	শেষ পংক্তি	যে ব্যক্তি স্নেহ দয়া	যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ দয়া
৬৯	২৭	বঙ্কিমচন্দ্রের	বঙ্কিম-চরিত্রের
৯৫	৭	বিদার-বিধুর	বিদায়-বিধুর
১০৯	১৩	অতল উৎসের	শীতল উৎসের
২২০	১৭	বিদ্রূপের	বিরূপের
২২০	২৬	'slying vapours'	'flying vapours'